ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৪ : ১৫

১৯৩৭ সালের নির্বাচন : কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী কৌশল
মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী
বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে চিত্রকলার ভূমিকা (১৯৪৮-১৯৭১)
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা
বাংলাদেশ-কুয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্ক : সমস্যা ও সম্ভাবনা
আখতার জাহান দুলারী
মুসলিম নারী সমাজে 'পর্দাপ্রথা' এবং বাংলাদশের সমাজবাস্তবতা
মুহাম্মদ আলা উদ্দিন
চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন
এম. নূরুল ইসলাম, শেখ আশিকুররহমান প্রিন্স
বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতাল নারীর মতায়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা
মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী
বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজের পরিবর্তমান পরিবার কাঠামো
শাহ্‌নাজ সুলতানা
বাংলাদেশে ই-কমার্স : প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা
মোঃ শাহ্ আজম, সালমা আক্তার
বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড
মো. রুহুল আমিন
মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা
খবির উদ্দীন আহম্মদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক

মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com
Web site : www.ru.ac.bd/ibs/ibshome.htm

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস.এম. গোলাম নবী
উপ-রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
মেসার্স শাহ্‌পীর চিশতি অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

ISSN 1561-798X
পঞ্চদশ সংখ্যা ১৪১৪

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আবুল বাসার মিঞা

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ আবুল বাসার মিঞা
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

মু. আবদুল কাদির ভূঁইয়া
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নুল আবেদীন
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু দাউদ হাসান
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সনজীব কুমার সাহা
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনওয়ারুল হাসান সুফি
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জগলুল হায়দার
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বেগম আসমা সিদ্দিকা
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি রি-রাইটেবল সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী	॥	১৯৩৭ সালের নির্বাচন : কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী কৌশল	০৯
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা	॥	বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে চিত্রকলার ভূমিকা (১৯৪৮-১৯৭১)	১৯
আখতার জাহান দুলারী	॥	বাংলাদেশ-কুয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্ক : সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩৫
মুহাম্মদ আলা উদ্দিন	॥	মুসলিম নারী সমাজে 'পর্দাপ্রথা' এবং বাংলাদশের সমাজ বাস্তবতা :একটি ভূ-রাজনীতিক পর্যালোচনা	৪৭
এম. নূরুল ইসলাম শেখ আশিকুররহমান প্রিন্স	॥	চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন : একটি এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা	৬৯
মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী	॥	বরেন্দ্র অঞ্চলে রসবাসরত সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা	৭৯
শাহ্‌নাজ সুলতানা	॥	বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজের পরিবর্তমান পরিবার কাঠামো : একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৯৩
মোঃ শাহ্ আজম সালমা আক্তার	॥	বাংলাদেশে ই-কমার্স : প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা	১০৯
মো. রুহুল আমিন	॥	বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড	১২৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ	॥	মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা	১৪৫

শোকবার্তা

আবদুল করিম (১৯২৮–২০০৭)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, প্রফেসর ইমেরিটাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো, এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ড. আবদুল করিম ২৪শে জুলাই ২০০৭ তারিখে বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমন করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

১৯২৮ সালের ১লা জুন চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার চাঁপছড়ি গ্রামে ড. আবদুল করিম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ ওয়াইজুদ্দীন এবং মাতার নাম সৈয়দা রশীদা খাতুন।

ড. করিম ১৯৪৪ সালে হাই মাদ্রাসা, ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম আই আই কলেজ থেকে আইএ, ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৫০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে এবং লনডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে আলাদা দুটি বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ছিলো ড. করিমের গবেষণার মূল ক্ষেত্র। বিশেষভাবে সুলতানি আমলের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিশেষজ্ঞতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত, প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় দুই শত, এবং বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা শতাধিক। ইনস্টিটিউট অব বাংলা স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ দুটির নাম : 'বাংলার ইতিহাস : মোগল আমল' (১৯৯২) এবং 'হিস্টরি অব বেঙ্গল : মুঘল পিরিয়ড', দুই খণ্ড (১৯৯১ ও ১৯৯৫)। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'করপাস অব দি মুসলিম কয়েনস অব বেঙ্গল' (১৯৬০), 'ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন' (১৯৬৯),'করপাস অব দি অ্যারাবিক অ্যান্ড পারসিয়ান ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল (১৯৯৫), 'বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল' (১৯৭৮), 'বাংলার ইতিহাস : ১২০০–১৮৫৭' (১৯৯৯) প্রভৃতি।

১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে তিনি এই বিভাগের প্রফেসর থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো (প্রফেসর পদমর্যাদায়) এবং ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার নিউমারারি প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রফেসর করিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

প্রফেসর করিম একুশে পদক (১৯৯৫), ড. মুহম্মদ এনামুল হক পদক (২০০২), আবদুল হক চৌধুরী স্বর্ণপদক (২০০২), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল (২০০৬) প্রভৃতিসহ অনেক মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আইবিএস জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী মর্মাহত। ড. করিমের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন।

শোকবার্তা

প্রীতি কুমার মিত্র (১৯৪২–২০০৭)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের ইতিহাসের প্রফেসর ড. প্রীতিকুমার মিত্র ৮ই অক্টোবর ২০০৭ তারিখ রাত ১২টা ২০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো প্রায় পঁয়ষট্টি বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলার কালীচরণপুর গ্রামে ড. মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রদ্যোতকুমার মিত্র এবং মাতার নাম অমিয় বালা মিত্র।

ড. মিত্র ঝিনাইদহ জেলাস্কুল থেকে এসএসসি (১৯৬০), খুলনা বিএল কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৬২), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক সম্মান (১৯৬৫) এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর (১৯৬৬) ডিগ্রি অর্জন করেন। আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি "Dissent in Modern India (1815–1930): Concentrating on Two Rebel Poets of Bengal—Michael Madhusudan Datta and Kazi Nazrul Islam" শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি (১৯৮৫) লাভ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯১ সালে লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগে এবং ১৯৯৫–৯৬ সালে ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটিতে নজরুল ইসলামের ভাবদ্রোহ বিষয়ে গবেষণা করেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক ড. মিত্রের একটি গ্রন্থ সম্প্রতি (২০০৭) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (নিউ দিল্লি) থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'The Dissent of Nazrul Islam : Poetry and History'। 'চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস' নামে তাঁর অনূদিত একটি গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রায় অর্ধশত গবেষণা-প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধীনে পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা করেছেন এমন গবেষকের সংখ্যা প্রায় এক ডজন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে (১৯৬৭–৬৮), পাকিস্তান সরকারের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে ট্যাক্সেশন অফিসার হিসেবে (১৯৬৮–১৯৭১), মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্টাফ অফিসার হিসেবে (১৯৭১), বাংলাদেশ সরকারের ট্যাক্সেশন অফিসার হিসেবে (১৯৭২–১৯৭৪), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে (১৯৭৪–১৯৭৭), এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের অধ্যাপক হিসেবে (১৯৮৫–২০০৭) তিনি কর্মরত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থলে তিনি মোট তিন বছর (২০০০–২০০২) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালক থাকাকালে তিনি আইবিএস জার্নালের তিনটি বাংলা সংখ্যা এবং তিনটি ইংরেজি সংখ্যার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আইবিএস জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী মর্মাহত। ড. মিত্রের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

১৯৩৭ সালের নির্বাচন : কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী কৌশল

মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী*

Abstract : The election of 1937 was an important issue in the history of British-India and also in Bengal. In this election the major Muslim political parties in Bengal, the Krishak Praja Party and the Bengal Muslim League's position were against each other. The Muslim League and the Krishak Praja Party's election history is the issue of this article. Moreover, this election is also important for creating a separate trend in politics. This separate trend made a clear division among the Muslims of India and Bengal.

ভূমিকা

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক পরিকল্পনা কার্যকর করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে ১৯৩৭ সালে বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলা হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এই লক্ষ্যে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো কংগ্রেস (প্রতিষ্ঠা ১৯৮৫), কৃষক-প্রজা পার্টি (কৃষক-প্রজা পার্টি ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে তা কৃষক-প্রজা পার্টি নাম ধারণ করে) ও বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড (১৯৩৬ সালে জিন্নাহর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় মুসলিম নের্তৃবৃন্দের সমন্বয়ে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয়, এই বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড পরবর্তী সময়ে বঙ্গীয় লীগ হিসেবে পরিচিতি পায়) স্ব-স্ব কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন বাংলার মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বাংলার আইন সভায় মুসলিম আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২১-এ উন্নীত হয়।[১] এ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলার মুসলমানদের জন্য আনন্দের সংবাদ হলেও বাংলার মুসলিম আসনগুলো কৃষক-প্রজা পার্টি ও বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালে বাংলার নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি ও বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও নির্বাচন যুদ্ধের প্রকৃতি, ধরন ও প্রচারাভিযান বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও নির্বাচনী প্রচারণার কৌশল

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার মুসলিম রাজনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। তাঁরা ১৯৩৬ সালে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি (UMP) গঠন

---

* ড. মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গীয় আইন সভায় মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ৩৯টি। ১৯৩৫ সালে তা ১২১-এ উন্নীত হয়। দেখুন, Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947*, (New Delhi: Impex India, 1976), p. 68.

করেন। পরবর্তীতে জিন্নাহর প্রচেষ্টায় তাঁরা বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এ যোগদান করেন। একই সময়ে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি ও বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির ভিন্নতা ছাড়াও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারির বিলুপ্তিতে আপোস না হওয়ায় ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।[২] উল্লেখ্য যে জিন্নাহ নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড ছাড়াও বাংলায় সাংগঠনিক কার্যক্রম বিহীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল। যার সাথে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সময়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মুজিবুর রহমান ও সম্পাদক ছিলেন ডা. আর. আহমেদ। তাঁরা একই সাথে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন।[৩] বাংলায় বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর সাথে কৃষক-প্রজা পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রার্থীর সঙ্গে কৃষক-প্রজা পার্টির চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। কৃষক-প্রজা পার্টির সভাপতি এ. কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) নিজ দলের কর্মসূচি ও উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে জমিদারি প্রথা বিলোপ, কৃষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, খাজনা কমানো প্রভৃতি গণদাবিকে সামনে রেখে নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে থাকেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের শুরুতে তিনি বলেন:

> আজ হতে আবার শুরু হবে বাংলার মাঠে, ঘাটে কাননে কান্তারে জলে স্থলে দিবানিশি, প্রজা এবং জমিদারের ভীষণতম বিরামহীন সংগ্রাম। আল্লাহর রহমতে আমি অচিরে ঘটাব জমিদারির অবসান। বুক ফুলিয়ে মেরুদণ্ড সোজা ও শির উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলার আট কোটি কৃষক প্রজা। ছিনিয়ে নিবে তারা তাদের যাবতীয় মানবীয় অধিকার। জমিদারি এবং সরকারের সাধ্য নেই কৃষক প্রজাকে আর পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখে। জাগ্রত জনতার বজ্র হুঙ্কারে জমিদারির জগদ্দল পাথর ফুৎকারে উড়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে কৃষক প্রজার জয় অবশ্যসম্ভাবী।[৪]

এই নির্বাচনে কৃষক-প্রজানেতা ডা. আর. আহমেদ বলেন, বাংলার যে কোনো স্থান থেকে খাজা নাজিমউদ্দিনের (১৮৯৪-১৯৬৪) সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ফজলুল হক প্রস্তুত আছেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে খাজাদের (ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্যরা পারিবারিকভাবে খাজা উপাধিধারী ছিলেন) জমিদারি পটুয়াখালীকে নির্বাচন যুদ্ধের জন্য নির্ধারণ করেন। পটুয়াখালী ফজলুল হকের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা না হলেও এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তিনি বলেন:

> আমি রিক্তহস্তে নির্বাচনী ইতিহাসের বিরাটতম সংগ্রামে ব্যাপৃত। আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ঢাকার দুর্ধর্ষ নবাব এবং নাইট উপাধিধারী খাজা নাজিম উদ্দিন। বাংলার গদিনসীন মন্ত্রী। তাদের ধনবল, জনবল অফুরন্ত ও বিপুল। খোদা না করুক আমি যদি এ দুরন্ত সংগ্রামে হেরে যাই তবে আমার সেই পরাজয় ওয়াটারলু যুদ্ধের নেপোলিয়নের পরাজয়ের চেয়ে কম লজ্জার হবে না।[৫]

ফজলুল হক-এর এই ধরনের বক্তৃতা সাধারণ জনগণ ও কৃষকদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করে। একই সাথে ফজলুল হক নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। নাজিম উদ্দিনের জমিদারি পটুয়াখালীর এক গ্রামে ফজলু মাতাব্বর নামের এক ব্যক্তি নির্বাচনের দুই বছর আগে মারা যায়। সে এলাকায় ভোট পাবেন না নিশ্চিত জেনেও

---

[২] অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক* (কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭২), পৃ. ২০-২৩।

[৩] আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫), পৃ.১১৬।

[৪] সিরাজউদ্দিন আহমেদ, *হাশেম আলী খান* (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৪), পৃ. ১০১।

[৫] তদেব, পৃ. ১০৩। উল্লেখ্য যে, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ, বাউফল ও গলাচিপা নিয়ে এই নির্বাচনী এলাকা গঠিত ছিল।

ফজলুল হক সব সংবাদ নিয়ে সেখানে যান। ফজলুর বাড়িতে গিয়ে তার (ফজলু) মৃত্যু হয়েছে এ কথা তিনি (এ.কে.ফজলুল হক) জানেন না বলে কান্নাকাটি করেন এবং কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে ফজলুর ছেলে বজলুর সাথে তাঁর (হক) দেখা হলে হক সাহেব বজলুকে বলেন' 'তোমার বাবা আমার বন্ধু, সে জীবিত নেই, থাকলে আমাকে এখানে আসতে হতো না।' বজলু তার করণীয় জানতে চাইলে হক সাহেব বলেন, 'আমার বন্ধু যখন নেই তখন আর বলবো না। তোমরা নাজিমউদ্দিনের প্রজা, আগে ভোট হয়ে যাক, আমার পক্ষে কাজ করলে তোমার সমস্যা হবে। আমার বন্ধুর ছেলে কষ্টে পড়ুক তা আমি চাই না।' বজলু তখন হককে বলেন' 'আপনার মতো গরিবের বাপ-মাকে আমরা যদি ভোট না দিই তবে কাকে দিব? নাজিম উদ্দিন এখানে কোনো ভোট পাবে না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।' হক তাকে 'বেঁচে থাকো বাবা' বলে দোয়া করলেন। প্রকৃতপক্ষে ফজলুল হক ফজলুকে চিনতেন না এবং ঐ এলাকায় কোনো দিন যাননি। এটা ছিল তাঁর (ফজলুল হক) নির্বাচনী প্রচারণার একটি কৌশল। এছাড়া ফজলুর এলাকায় জাহাজ থেকে নামার সময়ে তিনি স্থানীয় লোকদের প্রভাবিত করার জন্য পুরনো লুঙ্গি ও ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে আসেন। তাঁর এই কৌশলের সফলতায় তিনি হেসে বলেন 'কাণ্ডটা কি রকম হলো, রাজনীতিতে সততার স্থান নেই, আর সততা দেখাতে গেলে লোটা কম্বল নিয়ে বনে চলে যেতে হবে।' এছাড়া পটুয়াখালীর আর এক জনসভায় হক সাহেব জনগণকে একটি পোস্টকার্ড দেখিয়ে বলেন, 'পোস্টকার্ডে লেখে গরিবরা। এর মূল্য এক পয়সা থেকে দু-পয়সা করা হয়েছে। অথচ বড় লোকেরা টেলিগ্রাম করে। তা বার আনা থেকে কমিয়ে নয় আনা করা হয়েছে।' তামাক গরিবরা খায়, সিগারেট খায় ধনীরা। তামাকের ওপর ট্যাক্স বসানো অর্থাৎ গরিবের উপর ট্যাক্স চাপানো হয়েছে। এর জন্য কে দায়ী? 'সবাই বললো' নাজিমউদ্দিন। হক সাহেব তখন বলেন, 'বুঝুন আপনারা নাজিমউদ্দিনকে ভোট দিলে আপনাদের সর্বনাশ হবে।' তখন জনগণ বলে উঠে, 'আমরা নাজিমউদ্দিনকে ভোট দেব না'। উল্লেখ্য, এসব জনসভায় হক সাহেব তাঁর বহু এজেন্টকে বসিয়ে রাখতেন।[৬] বাস্তবে ফজলুল হকের এই ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা জনগণের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। একজন লীগ কর্মী নির্বাচনের পর নাজিমউদ্দিন কেন ভোট পায়নি প্রশ্ন করলে এলাকার গরিব-চাষিরা বলেন, 'নাজিমউদ্দিন তামাকের ওপর ট্যাক্স বসিয়েছেন এবং পোস্ট কার্ডের দাম বাড়িয়েছেন। যা গরিব লোকেরা ব্যবহার করে। এছাড়া তিনি ভাইসরয়ের লোক হয়েও এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেননি।[৭]

শুধু পটুয়াখালী নয়, বাংলার অন্যান্য স্থানে ফজলুল হক কৃষক-প্রজা পার্টির সভায়ও নিজ দলের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় তিনি ডাল-ভাতের অধিকার, জমিদার প্রথা বাতিল, স্বরাজের দাবি এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির কথা বলতেন। যা—কংগ্রেসেরও দাবি ছিল। এছাড়া তাঁর দলের হিন্দুরা কংগ্রেস ও তফসিলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এতে মনে হচ্ছে তাঁর দলের সাথে হয়তো কংগ্রেসের নির্বাচনী আঁতাত হয়েছে। আসলে নির্বাচনী সমঝোতা না হলেও নির্বাচনে কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানায় এবং নির্বাচনের পর হক সাহেব কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করেন।[৮] কিন্তু ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে সিরাজগঞ্জের এক জনসভায় বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত এই ধরনের অভিযোগের জবাবে বলেন যে,

---

[৬] মোহাম্মদ মোদাব্বের, *ইতিহাস কথা কয়* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১), পৃ- ১৮০-১৮৩।
[৭] জয়া চ্যাটার্জী, *বাংলা ভাগ হলো* (ঢাকা: ইউপি এল, ২০০৩), পৃ. ৯৪-৯৫।
[৮] তদেব, পৃ. ৯২।

কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে কংগ্রেসের কোনো যোগাযোগ নেই এবং কোনো নির্বাচনী আঁতাতও নেই। এমনকি কোনো আর্থিক সহযোগিতা কংগ্রেস থেকে নেওয়া হয়নি। এছাড়া কংগ্রেসের সাথে তাঁর সম্পর্ক নেই প্রমাণের লক্ষ্যে কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট গ্রুপের আহুত জনসভায় হক সাহেবের উপস্থিতির কথা থাকলেও তিনি তাতে উপস্থিত না হয়েও পৃথক সমাবেশের আয়োজন করেন।[৯] তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন, কৃষক-প্রজা পার্টির উদ্দেশ্য হলো নতুন সংস্কার আইনের মাধ্যমে নিরন্ন, ঋণগ্রস্ত ও উৎপীড়িত কৃষক প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা। তাঁর (ফজলুল হক) মতে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা হচ্ছে খাজা নাজিমউদ্দিন ও কে.জে.এম. ফারুকীসহ অন্যান্য জমিদার। তাঁরা নির্বাচনে সরকারি অর্থ ব্যয় এবং গরিবের স্বার্থ উপেক্ষা করছেন।[১০] কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যান্য নেতাও নিজ নিজ প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। আবুল মনসুর আহমেদ ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরার কৃষক সম্মেলনে বলেন, 'শুধু কৃষকদের ডাল-ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য নয়, কৃষকরা যাতে ভোট দিতে পারে, নির্বাচিত হতে পারে, শিক্ষার অধিকার পায় এটাই কৃষক-প্রজা পার্টির দাবি। কিন্তু বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতৃবৃন্দ কৃষকদের এই অধিকার প্রদান করতে সম্মত নয়। কৃষকদের এই গণ দাবির সাথে বাংলার মুসলিম জনগণকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় 'আল্লাহু আকবর-জমিদারি নিপাত যাক' শ্লোগান দিতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের ভোট লাভ করা। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা সৈয়দ নওশের আলী মুসলমানদের কাছে আবেদন রেখে বলেন যে, 'কাউন্সিলে যদি তাদের একজন ভালো লোক না থাকে তাহলে তাদের প্রার্থনা শূন্যে ভেসে যাবে এবং তা আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না।'[১১] লাঙ্গল ছিল কৃষক-প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতীক। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ফজলুল হক বলতেন, 'আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান লাঙ্গল আজ আমাদের হাতে। এই লাঙ্গলের ফলার মুখে উৎপাটিত মাটিতে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হবে। এই আশা নিয়ে আমরা লাঙ্গল চালিয়ে যাব শুধু শস্য ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরেও।' জনসভায় কৃষক প্রজা পার্টির কর্মীরা বলতেন, 'লাঙ্গল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার'। লাঙ্গল সম্পর্কিত নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান গায়ক আব্বাসউদ্দিন কৃষক-প্রজা পার্টির জনসভায় গেয়ে কৃষক ও জনগণের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করতেন। গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন হল:

গরুর কাঁধে চোঁয়াল দিয়া ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে,
বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে।
বউ দিয়েছে গলায় দড়ি তারি ব্যথা সইতে,
বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে।
মোরা সবার মুখের খাবার জোগাই আমরা না পাই খাইতে,
বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে ...।[১২]

কৃষক-প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রচারণার বিপরীতে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এম.এ. জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) লীগ প্রার্থীদের জয়ের জন্য বাংলার বিভিন্ন স্থান, বিশেষভাবে কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা সফর করেন। নির্বাচনে প্রতিযোগিতার জন্য বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর সম্পাদক হোসেন

---

[৯] তদেব।
[১০] তদেব, পৃ. ৮৭।
[১১] তদেব পৃ. ৯২।
[১২] এম. আজিজুল হক, *শতাব্দীর কণ্ঠস্বর আবুল কাশেম ফজলুল হক* (ঢাকা: প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ১৯৮০), পৃ. ২০১, ২০৮; সিরাজউদ্দিন আহমেদ, *শেরে বাংলা একে ফজলুল হক* (ঢাকা: শাহরিয়ার, ১৯৯৭), পৃ. ৮১।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ১৯৩৬ সালে বাকেরগঞ্জে লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন। নির্বাচনের প্রচারণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি দলকে পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে প্রেরণ করা হয়।[১৩] বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতৃবৃন্দ খাজা নাজিমউদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪), সোহরাওয়ার্দী, আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) নবাব হাবিবউল্লাহ বাংলার সর্বত্র নির্বাচনী প্রচারণা চালান এবং কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মসূচির কথা তুলে ধরে বলেন, 'আমরাও জমিদারি বিলোপের ব্যবস্থা করবো এবং আমাদের দল প্রকৃত কৃষকদেরই দল। ফজলুল হক ও তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত। বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতৃবৃন্দ একই সাথে প্রচার করেন যে, ফজলুল হক কংগ্রেসের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় নির্বাচন পরিচালনা করছেন। কাজেই কৃষক-প্রজা পার্টিকে ভোট দিলে কার্যতই কংগ্রেসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষক প্রজাকে ভোট দিলে তোমরা নিজের গলা নিজে কাটবে, মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং ভারত থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করার কাজে নিয়োজিত হবে।[১৪] ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকরকে দিয়ে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতৃবৃন্দ মুসলিম ঐক্য ও লীগ বোর্ড প্রার্থীদেরকে ভোট দেওয়ার জন্য ফতোয়া বাংলার সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ ফতোয়ায় তিনি বলেন:

> আপনাদের উচিত হবে না নিজ সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করে কৃষক-প্রজা পার্টি বা হিন্দু কংগ্রেসের অনুগত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদান করা ...। আমি আশা করি আপনারা আমার অনুরোধ রাখবেন এবং প্রকৃত মুসলিম দলের (লীগ বোর্ড) প্রার্থীদের ভোট দিবেন।[১৫]

দৈনিক আজাদ ও *Star of India* পত্রিকা বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালায়। বাংলা পত্রিকা *দৈনিক আজাদ* সরকারের আর্থিক সহায়তায় শহর ও গ্রামীণ মুসলিম জনগণকে লীগের পক্ষে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পত্রিকার প্রচারাভিযানের লক্ষ্য ছিল মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে একত্র করা এবং হিন্দুদের অত্যাচার বা অশুভ প্রভাব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা । *Star of India* উল্লেখ করে যে, কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থীরা জয়লাভ করলে যেসব মাদ্রাসা ও মক্তবে কোরান শিক্ষা দেওয়া হয় তা বন্ধ হয়ে যাবে। *Star of India* আরও উল্লেখ করে যে, মুসলিম ভোটাররা, বাংলায় কংগ্রেসের শাসন যদি না চান তবে কৃষক-প্রজা পার্টিকে ভোট দানে বিরত থাকুন। এছাড়া নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি, মুসলিম চেম্বার অব কমার্স, ঢাকা জেলা মুসলিম ফেডারেশন, কলিকাতা খিলাফত কমিটি বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-কে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করে এবং বাংলার সর্বত্র বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচারাভিযান চালিয়ে যায়। হারিকেন ছিল লীগের নির্বাচনী প্রতীক।[১৬]

---

[১৩] Harun-Or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh,* (Dhaka: Asiatic Society, ১৯৮৭), p.78; কামরুদ্দিন আহমেদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: জহিরউদ্দিন, ১৯৭৫), পৃ. ৯৮।

[১৪] *Star of India*, 14 November, 1936; 15 January, 1937; Harun-Or-Rashid, op.cit., pp. 76-77.

[১৫] *Star of India*, 14 November, 1936; *Azad*, 17 January, 1937; Shila Sen, *op. cit.*, p.88; Harun-Or-Rashid, *op. cit.*, p. 76. উল্লেখ্য যে কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থনে মৌলভী মাওলানারাসহ ছাত্ররা নির্বাচনে কাজ করেছেন।

[১৬] *Star of India*, 13 January, 1937; Harun-Or-Rashid, *op. cit.*, pp. 69-77.

নির্বাচনের ফলাফল, কোয়ালিশন সরকার গঠন ও তার প্রকৃতি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড ৩৯টি, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৬টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩৬টি আসন লাভ করে। কৃষক-প্রজাপার্টির আসন সংখ্যা কম হলেও তাদের মোট ভোটের সংখ্যা লীগের প্রাপ্ত সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। মুসলিম ভোটারদের মধ্যে লীগ পায় ২৭.১০% এবং কৃষক-প্রজা পার্টি পায় ৩১.৫১% ভোট। বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড শহর ও গ্রামের দুই অঞ্চলে আসন পায়। শহরাঞ্চলে বিশেষভাবে কলিকাতায় অবাঙালি মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থের কারণে লীগকে ভোট দেয়। লীগের উদ্দেশ্য হলো সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। যা প্রজা পার্টির মতো আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেনি। কিন্তু কৃষক-প্রজা পার্টি শুধু গ্রাম অঞ্চলে আসন লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে কৃষক-প্রজা পার্টি বাংলার গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রচারণা জোরদার করে। প্রজা পার্টি নেতারা পল্লি এলাকার হাট-বাজারগুলোতে সভা সমাবেশের আয়োজন করা, গ্রামের প্রতিটির লোকের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদেরকে কৃষক-প্রজাপার্টির পক্ষে ভোটদানে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি নানাবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করে। একই সাথে কৃষক-প্রজা পার্টির *চাষী* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এটা কৃষক-প্রজা পার্টি তার নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করে। *চাষী* ময়মনসিংহ শহর থেকে বের হতো এবং এর প্রচারণার পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পত্রিকার প্রচারণা লীগের *Star of India* ও *আজাদ* পত্রিকার সমতুল্য ছিল না। এছাড়া প্রজা দলের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা বাংলার গ্রাম অঞ্চলগুলোর জনগণের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করবে। কারণ গ্রাম বাংলার জনগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং তারা এতোই দরিদ্র যে এক আনার অর্ধেক খরচ করে পত্রিকা ক্রয় করতে অক্ষম। তাই সংবাদপত্রের চাইতে প্রজা দলের নেতারা ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন। তাদের প্রচারণায় বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর গ্রাম অঞ্চলে কৃষক-প্রজা পার্টি প্রাধান্য বিস্তার করে। এসব এলাকার কৃষক-প্রজা পার্টি নেতা-কর্মীরা জমিদারি উচ্ছেদ, খাজনা কমানো, কৃষকদের মাঝে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি দাবির পাশাপাশি বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড মুসলিম সংহতির দাবিকে গ্রহণ ও প্রচার করতে থাকে। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা বলেন, 'বাংলার কৃষকদের মধ্যে ৯৫ জন মুসলমান, তাই মুসলিম সংহতি কৃষকদের আঙ্গিনায় হওয়া উচিত।' বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতাদেরকে বিপাকে ফেলার জন্য একই সাথে এসব এলাকায় লীগ-প্রজা দলের যৌথ সভা আহ্বান করে উভয় দলের কর্মসূচি ও প্রার্থী যাচাই করার কৃষক-প্রজা পার্টি এর কৌশলগত প্রস্তাব জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের যৌথ সভা আহ্বানের কারণে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রার্থী প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ নিজে যোগ্য প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ইতিপূর্বে নিজ এলাকা উত্তর টাঙ্গাইল থেকে কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনয়ন না পাওয়ায় লীগ বোর্ডের প্রার্থী হওয়ায় পরাজিত হন।[১৭] নির্বাচনে কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন করে। কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনের কারণে হিন্দু পণ্ডিতরা মুসলিম ছাত্রদেরকে, হিন্দু উকিলরা মুসলিম মক্কেলদেরকে, হিন্দু ডাক্তাররা মুসলিম রোগীকে, হিন্দু মহাজনরা মুসলিম প্রজাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে কৃষক-প্রজা পার্টিকে ভোট দিলে তোমাদের কল্যাণ হবে।

---

[১৭] আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১৩৬, Humaira Momen, *A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937* (Dhaka: S.Rahman, 1972), pp. 59-66.

কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকাগুলোও কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানায়। কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষে কংগ্রেস সমর্থক বিভিন্ন পেশাজীবীর কর্মতৎপরতা কৃষক-প্রজা পার্টিকে জয়লাভে সাহায্য করে।[১৮]

অন্যদিকে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর নেতৃবৃন্দ নবাব ও জমিদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল। কেন্দ্রীয় লীগের শাখা বিধায় কেন্দ্র থেকেও আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এম,এ,এইচ ইস্পাহানী ও অন্যান্য মুসলিম ব্যবসায়ীরা লীগকে আর্থিক সহায়তা দান করেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য আকরম খাঁ, তমিজউদ্দিন ও আবদুল মোমিন কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডে যোগদান করায় বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোড-এর্র শক্তি বৃদ্ধি পায়। আকরম খাঁর বাংলা পত্রিকা *আজাদ* বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর নির্বাচনী প্রচারণায় যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে। *আজাদ*-এর সাথে *Star of India* প্রচারণা যদিও শহর কেন্দ্রিক ছিল তথাপি এই দুই পত্রিকার প্রচারণা বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড জয়লাভে সহায়তা দান করে। একই সময় মুসলিম আলেম সমাজের ভূমিকাও বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর পক্ষে ছিল। মুসলিম লীগ প্রধানত পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর ও মধ্য বাংলা, ঢাকার কয়েকটি এলাকায় এবং বিশেষভাবে বাংলার জেলা শহরগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে।[১৯] তবে ১৯৩৭ সালে পটুয়াখালী কেন্দ্রের নির্বাচন বাংলার সকল নির্বাচনী প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। এই নির্বাচনী কেন্দ্রে ঢাকার নবাব নাজিমউদ্দিনের পক্ষে প্রচারণায় পটুয়াখালী উপস্থিত হন। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ থেকে মুসলিম ছাত্রদেরকে সেখানে পাঠানো হয়। মৌলভী ও মাওলানারা নাজিমউদ্দিনের পক্ষে সেখানে উপস্থিত হন। নাজিমউদ্দিনকে ভোট দেওয়া হলে ইসলামের পক্ষে ভোট দেওয়া হবে প্রভৃতি প্রচারণা চালানো হয়। বাংলার গভর্নর জন এন্ডারসন নাজিমউদ্দিনের পক্ষে আবেদন জানান। যা নাজিমউদ্দিনের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল। বাংলার জনগণ বুঝলেন গভর্নর তাঁর (খাজা নাজিমউদ্দিন) কথায় চলে। মনে হচ্ছে ফজলুল হককে পরাজিত করলে পুরো কৃষক-প্রজা পার্টি পরাজিত হবে। বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর এই ধরনের প্রচারণার জবাবে ফজলুল হকও খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। যেহেতু পটুয়াখালী তাঁর নিজস্ব এলাকা ছিল না, পিরোজপুর হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এলাকা। পটুয়াখালী তাঁর নিজস্ব এলাকা না হলেও বাংলার তৎকালীন আবহাওয়া ও রাজনৈতিক পরিবেশ ফজলুল হক-এর জন্য অনুকূল ছিল। তিনি দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বিধায় তাঁর বিরূদ্ধে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর নেতৃবৃন্দের বলার এমন কিছু ছিল না। উল্লেখ্য, ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের চাপে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার কারণে তিনি বাংলার মুসলমানদের কাছে 'আমাদের হক সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তখন বহু লোককে বলতে শোনা যেতো, 'ফজলুল হকের কাছে বাংলার মুসলমানরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ'। পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত তিনি ওকালতি করেছেন কিন্তু গরিব মক্কেলদের নিকট থেকে কোনো টাকা নেননি। এ ছাড়া বিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি তিনি বহু কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেন। তখন কৃষকদের দাবির কথা বলেছেন। ১৯৩৭ সালে ছয় আনা ট্যাক্স দেওয়া কৃষকরা ভোটের অধিকার পেলে স্বাভাবিকভাবে তারা হক সাহেবের সমর্থক হয়ে পড়ে। বাংলার মধ্যবিত্তদের মধ্যে তিনিই প্রথম কৃষকদের দাবি দাওয়ার কথা বলে কৃষকদের মাঝে

---

[১৮] মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *যুগ বিচিত্রা* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স ১৯৬৭), পৃ. ৩৩৬-৩৯।
[১৯] আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৯।

নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।[২০] বাস্তবে বাংলার আর কোনো রাজনৈতিক নেতা এত জোরালোভাবে জমিদারি উচ্ছেদের কথা জনসম্মুখে উপস্থাপন করেননি। লীগ বোর্ডের নেতৃবৃন্দের চাইতে কৃষকদের দাবির প্রতি তাঁর বক্তব্যের কারণে কমিউনিস্ট সমর্থক কৃষক কর্মীরা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানায়। উল্লেখ্য যে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে কলকাতা শহরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কৃষক-প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসকে সমর্থন জানানোর কথা বলা হয়।[২১] গ্রামীণ অঞ্চলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সংহতির কথা বোঝানোর জন্য বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড নেতৃবৃন্দকে বেশ সময় নিতে হতো। অন্যদিকে হক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় ততক্ষণে কয়েকবার কৃষকদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা, জমিদারি উচ্ছেদ এবং খাজনা কমানোর কথা তুলে ধরতেন। হক ছাড়াও কৃষক-প্রজা পার্টি'র অন্যান্য নেতা গ্রামীণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং সহজেই তাদের সাথে মিশে যেতেন। তারা স্থানীয় ভাষায় যেভাবে কথা বলতেন তা লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এছাড়া মুসলিম সংহতির তাৎপর্য বোঝাতে মুসলিম লীগের মধ্যে লোকের অভাব ছিল। নাজিমউদ্দিন সুবক্তা ছিলেন না। বাংলা ভাষায় তাঁর কোনো দখল ছিল না। অথচ গ্রামে উর্দু ও ইংরেজি দুটো ভাষা বোঝার লোক কম ছিল। লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী তখনো বাংলায় বক্তৃতা করতে পারতেন না। নবাব হাবিবউল্লাহ উর্দু-বাংলা মিলিয়ে এমনভাবে বক্তৃতা করতেন যা লোকেরা বুঝতে সক্ষম হতো না, বরং জনগণ উল্টো বুঝতো। হক সাহেব এই সুযোগে বলে বেড়াতেন এবারের নির্বাচনে ঠিক হবে বাংলার আইন পরিষদে বাঙালি থাকবে না অবাঙালি থাকবে। আসলে অবাঙালিরা বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করুক ফজলুল হক তা চাইতেন না। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা জানতেন খাজারা যতদিন বাংলায় নেতৃত্ব দেবেন ততদিন তারা (মধ্যবিত্তরা) রাজনীতিতে কোনো স্থান পাবেন না। বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে খাজা পরিবারের দশজনকে বঙ্গীয় আইন পরিষদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে বাংলার শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তরা এককভাবে কোনো দলে ভোট দেননি।[২২] এ ছাড়া ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দলীয় গুরুত্বের চাইতে প্রার্থীর ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগ্যতা জয়লাভের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। দলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ব্যক্তির চাইতে দল বড়, দলীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থার নিরিখে কার্যক্রম পরিচালনা এবং তা জনগণকে বোঝানোর পদ্ধতিগত দিক তখনো পরিষ্কারভাবে রাজনীতিতে স্থান লাভ করেনি। এছাড়া প্রদেশের বহু অঞ্চলে উক্ত দলের কোনো শাখা গড়ে উঠেনি। যেখানে দলের কোনো কর্মসূচি বা তৎপরতা ছিল না ব্যক্তির জনপ্রিয়তা সেখানে মূল বিষয় ছিল। আর যেখানে দলের শাখা অফিস ছিল সেখানে দলের মতাদর্শ বোঝার বা মূল্যায়ন করার যোগ্যতা নিরক্ষর ভোটারদের ছিল না। যার কারণে যোগ্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড ও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থীদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ, কে ফজলুল হক ছাড়াও কৃষক-প্রজা পার্টির সৈয়দ নওশের আলী, সামশুদ্দিন আহমেদ, রাজিবউদ্দিন তরফদার, আবু হোসেন সরকার, আবদুল মজিদ, সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাসেমী, হাসেম আলী খান ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ নিজ নিজ যোগ্যতা বলে জয়লাভ করেন। একইভাবে বঙ্গীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের খান বাহাদুর আবদুল মোমিন, মাওলানা আকরম খাঁ,

---

[২০] Shila Sen, *op. cit.*, p. 88; Harun-Or-Rashid, *op. cit.*, pp. 78-79; মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-.২৫৬।

[২১] কামরুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯, এস. এম. আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩।

[২২] মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮, কামরুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯।

তমিজ উদ্দিন খান, নবাব হাবিবউল্লাহ এবং, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ যোগ্যতাবলে জয়লাভ করেন। তবে নির্বাচনে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি ও ধর্মীয় আবেগে প্রভাবিত হয়ে নিরক্ষর ও অজ্ঞ ভোটাররা দুর্বল প্রার্থীকে ভোট দেয়ায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। আশি বছরের একজন বৃদ্ধ ভোট কক্ষে প্রবেশ করে সাহায্যের আবেদন জানান, প্রিজাইডিং অফিসার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে বৃদ্ধ বলেন 'আল্লাহর নির্দেশিত ভোট বাক্স কোনটি'? এছাড়া জানা যায় যে, কিছু গ্রামবাসী প্রার্থীর বদলে গ্রামের মোড়লকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।[২৩] আর পটুয়াখালীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী নাজিম উদ্দিন ও ফজলুল হক দুজনই যোগ্য ছিলেন। তবে ফজলুল হক রাজনীতিতে জাদুকর হিসেবে পরিচিত ছিল। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে হকের বক্তৃতার ধরন, কৌশল ও প্রতিশ্রুতির কারণে নাজিমউদ্দিন ফজলুল হকের নিকট বিপুল ভোটে পরাজিত হন।[২৪] তিনি (নাজিম উদ্দিন) আর কখনো বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে নির্বাচন করতে সাহস করেননি। তাঁর (নাজিম উদ্দিন) পরাজয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায় ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু সমর্থকের কারণে নাজিমউদ্দিন পরাজিত হন। তবে গ্রাম বাংলার জনগণের কাছে ফজলুল হকের সম্মান, শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা বাংলার যে কোনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তুলনীয় ছিল না। পরাজয়ের পর নাজিমউদ্দিন স্বয়ং বলেন 'দৈত্যের সাথে লড়াইয়ে আমি হেরে গেছি সত্য, কিন্তু আত্মসম্মান খোয়াইনি।'[২৫]

নির্বাচনে কোনো দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সাথে মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনা ব্যর্থ হলে কৃষক-প্রজা পার্টি লীগের সাথে মিলিত ভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে।

উপসংহার

লীগ ও প্রজা পার্টির মিলনে বাংলায় মুসলিম ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। এই সময়ে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রমাগত জয়লাভ, নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড, আব্বাসউদ্দিনের গান, আকরম খানের লেখনি, হাসন সোহরাওয়ার্দী ও আহমদ ফজলুর রহমানের কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ মুসলিম ঐক্য সংহতিতে অধিক পরিমাণে উৎসাহ জোগায়। একই সাথে কৃষকদের দাবির প্রশ্নটি পূরণের ক্ষেত্রে ভাটা দেখা দেয়। ফজলুল হক কৃষক-প্রজাদলের কর্মসূচিতে জমিদারি উচ্ছেদের দাবি রাখলেও কৃষি ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি। তাঁর দলে জোতদার শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না। কোয়ালিশন সরকারের সময়ে বিশেষভাবে ১৯৩৭-৩৮ সালে কৃষকদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা

---

[২৩] এনায়েতুর রহিম, *বাংলায় স্ব-শাসন (১৯৩৭-১৯৪৩)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৯১।

[২৪] ফজলুল হকের কৌশলগত বক্তৃতার একটি বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি। নির্বাচনী প্রচারণায় ফজলুল হক পাতার হাট, দৌলতখাঁ, মনপুরা, সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম সফর করেন। পাতার হাটের জনসভায় তিনি শস্যহানির কথা শুনিয়া কাঁদতে থাকেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। দৌলতখায় একই দাবির কারণে বলেন আপনারা পাতার হাটের জনগণের চেয়ে ভাল আছেন। তিনি মনপুরার লোকদের বলেন আপনারা দৌলতখাঁর অবস্থা দেখলে সাহায্যের কথা কলতেন না। সন্দ্বীপে গিয়ে তিনি বলেন আপনারা মনপুরার লোকদের চেয়ে সুখে আছেন এবং চট্টগ্রামে এসে বলেন সন্দ্বীপের হাজার হাজার গৃহহীন লোকদের তুলনায় আপনারা বহু ভাল আছেন। তাঁর এ ধরনের কৌশলগত ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বক্তৃতায় কেউ সাহায্য না পেলেও সবাই খুশি হতো এবং তাঁকে ও তাঁর দলকে ভোট দিয়ে যেতো। তবে তাঁর মত ও পথের পরিবর্তনের জন্য নিন্দিত হলেও তিনি জনগণের উপর প্রভাব হারাননি। সমসাময়িক বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালের লীগের সর্বত্র নির্বাচনী জয়লাভের সময়ও তিনি লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করেন। দেখুন, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।

[২৫] তদেব, পৃ. ৩৩৯, Humaira Momen, *op. cit.*, pp. 65-66,

দেওয়া হলেও বাংলার কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা থেকেই যায়।[২৬] কোয়লিশনে বঙ্গীয় লীগের সদস্যরা কৃষকদের স্বার্থে মাঝে মধ্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা উচ্চারণ করলেও নিজেরা জমিদার ও জোতদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় হয় গঠনমূলক কোনো ভূমি সংস্কারে লীগের ভূমিকা ছিল না। আর কৃষকদের স্বার্থকে তাঁরা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য ´বারে বারে উচ্চারণ করতেন। লীগ ও প্রজা পার্টির এই মিলন কৃষক-প্রজা পার্টির জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম সংহতি, মুসলমানদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রশ্নে এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের সর্বভারতীয়ভিত্তিক দাবির কারণে ধীরে ধীরে বহু কৃষক-প্রজা নেতা প্রজা পার্টি ছেড়ে লীগে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের পর থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবি মুসলিম স্বার্থের একমাত্র রক্ষক হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় মুসলমানরা লীগে যোগদান করতে থাকে। যেহেতু চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেও অবনতি ও টানা-পড়েনের কারণে ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা মুসলিম লীগের লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়। পাশাপাশি কৃষক-প্রজা পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকায় এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সদস্যদের লীগে যোগদানের প্রেক্ষাপটে কৃষক-প্রজা পার্টির পতনের পর্ব শুরু হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়ে যায়। পরে ফজলুল হক নিজেই লীগে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলিম লীগেই একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। তবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলায় জমিদারি উচ্ছেদসহ সমাজ পরিবর্তনের যে দাবি উঠেছিল, তা পূরণ না হলেও পরবর্তী কালে সাধারণ জনগণসহ কৃষকদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছিল। এ অবস্থায় কৃষকসহ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে জমিদার ও নবাবদের আধিপত্য অনেকটা কমে গিয়ে সাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্তদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

[২৬] আসলে লীগ প্রজা কোয়ালিশন সরকারের সময়ে রায়তদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন: রায়তদের জমি বিক্রির জন্য জমিদারকে দেয় সালামি ফি তুলে দেওয়া হয়, ১৯৩৭ সাল থেকে দশ বছর পর্যন্ত আয়তন বৃদ্ধি ছাড়া খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না, বাকি খাজনার দায়ে রায়তকে গ্রেফতার বা তাদের সম্পত্তি নিলামে দেয়া যাবে না, বাকি খাজনার সুদ কমিয়ে দেয়া হয় এবং একইসাথে রায়তরা জমি দান, বিক্রি বা হস্তান্তরের সুযোগ পায়। এছাড়া জমিদাররা খুশিমত প্রজাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না এমন বিধান করা হয় এবং তাদের জারিকৃত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। দেখুন, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (১৯০০-১৯৪৭)* (কলকাতা: কে.পি বাগচি, ১৯৯১), পৃ. ৬৬-৬৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে চিত্রকলার ভূমিকা (১৯৪৮-১৯৭১)

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা*

Abstract: During the tenure of the Pakistani rulers, the painters of this region, with their individual school of thoughts, patterns of work and discourse, have noticeably been associated with the ways and expressions of life of the general people. The firm stand of the painters, as illustrated in their works of art, against the exploitive, suppressive, undemocratic, and anti-humanitarian activities of the society and the government is instantaneous and reciprocates to the historicity of the people before they emerged as an independent nation. It can essentially be concluded that these revolutionary features of paintings and art in general, can make the Bengalis of the twenty first century aware about their degenerating habit of remaining oblivious to their own historicity.

ভূমিকা

দেশ ভাগের পর ধর্মীয় আবহের মধ্যে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তার সরব অস্তিত্ব অন্তত পঞ্চাশ দশকের প্রথম দু-তিন বৎসরে দেখা যায় না। জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে সংস্কৃতিচর্চা, তা বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি সাহিত্যাঙ্গনের নানা সক্রিয় কর্মীকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি নির্দেশাশ্রয়ী পাকিস্তানি সংস্কৃতি নামে এক ধরনের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক চর্চায় নিয়োজিত থাকতে হয়। এ অবস্থায় পূর্ববঙ্গীয় ধর্মান্ধ সমাজে 'হারাম' কর্ম বলে বিবেচিত চিত্রকলা চর্চার প্রসার ঘটানো ছিল প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। যদিও পরবর্তীকালে অনেক শিল্পী কূট রাজনৈতিক চালে অথবা সামাজিক চাপে, কখনো বা আন্তর্জাতিকতার মোহে বা চল্লিশ দশকীয় রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সূত্র অন্বেষণ ইত্যাদি নানা কারণে বিভ্রান্ত হয়ে অস্পষ্ট আঙ্গিকে আধুনিক চিত্র রচনা করেছেন; কিন্তু উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনেকেই আবার তাঁদের কাজে যুগযন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করেছেন, প্রবহমান মানবতাবাদী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিল্পীও চিত্রধারার সাথে

* ড. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন আর্টস, শান্ত-মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

একাত্ম হয়েছেন। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, সময় এবং সুযোগে সৃষ্টি করেছেন প্রতিবাদী চিত্রকলা।

"কোন জাতির স্বাধীনতার চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পেছনে সেই জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংগ্রামী তৎপরতা যেমন বিরাট ভূমিকা পালন করে, তেমনি তাতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাতির মন-মানসের বিকাশ এবং অভিন্ন জীবন-চেতনাকেও সুসংবদ্ধ করে তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড"।[২] প্রায় সিকি শতাব্দী ব্যাপী পাকিস্তানি দুঃশাসনের সময়ে পূর্ব বাংলাবাসীকে নিরন্তর যে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হয়েছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একদিকে সংস্কৃতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা, অপরদিকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনাকে শানিতকরণ। প্রগতিশীল রাজনীতি এবং ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি এসময় ললিতকলার বিভিন্ন অঙ্গনে প্রগতিশীল সৃষ্টিশীলতার একটি বড় দিক ছিল : বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে লালন করার দৃঢ় প্রত্যয় ও সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী শক্তি ও তাদের অগণতান্ত্রিক মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়া, জনগণকে সচেতন করা এবং ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে উদ্বুদ্ধ করা। যেহেতু শাসকশ্রেণী পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে ধর্মের নামে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিককে পরিবর্তন করে অন্যরূপ দিতে চেয়েছিল, তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রয়োজন হয়েছিল বাঙালিত্বের পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা। আর শিল্পী ও চিত্রকলা তাতে সম্পৃক্ত হয়েছিল বিভিন্ন সম্মেলনে, অধিবেশন, অনুষ্ঠান, মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে।

প্রথম পর্যায়

১৯৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়, তাতে দেশের অন্যান্য ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শিল্পীরাও স্বাক্ষর করেন। ১৯৫১ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারির স্মারক পত্রেও শিল্পীরা স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯৫১ সালে ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামে 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক' কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শিল্পীরা সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ঐতিহ্য-অনুসারী চিত্রকর্ম দিয়ে একটি প্রদর্শনীও তাঁরা করেন। ১৯৫২-এর ২২, ২৩ ও ২৪ শে আগস্ট কুমিল্লায় যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও শিল্পীরা অংশ নেন। বিশেষ করে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' এখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের শেষের দিকে 'সওগাতে'র নাসিরুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষলতায় গড়ে ওঠা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতে সক্রিয় সদস্য হিসাবে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫২-'৫৩ বর্ষের সংসদে'র কমিটিতে বিভাগীয় সম্পাদক হিসাবে চিত্রকলার জন্য শিল্পী আমিনুল ইসলাম নিযুক্তি পেয়েছিলেন। আর এই জন্যই হাসান

---

[২] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-৭১)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী; ১৯৯৬), পৃ. ৩৭৪।

হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩)* সংকলন গ্রন্থের প্রচ্ছদ অলঙ্করণ আমিনুল ইসলামের হস্ত স্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পেরেছিল।[৩]

'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র কিছু সদস্য কঠোর আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সামাজিক প্রগতি, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মূলত তাঁদের নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ দিনে সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় নতুন সাহিত্য সংগঠন 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন পরিচালনা কমিটি'। এখানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে জয়নুল আবেদিন অন্যতম সহ-সভাপতি হিসাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। চলমান সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চারুকলার অন্তঃস্থিত শক্তিকে কাজে লাগানোর এ ছিল এক বিরাট সুযোগ। ১৯৫২ সালের মধ্যেই পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটও তীব্র আকার ধারণ করে এবং বাঙালি মুসলমানের একাংশের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মোহ কেটে যেতে থাকে। এ অবস্থায় ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বাংলা'র ন্যায্য অধিকারের দাবিতে পালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট ও মিছিলে শিল্পীরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এ দিন তাঁরা নাজিমুদ্দিনের ব্যঙ্গচিত্র সংবলিত পোস্টারসহ অনেকগুলো পোস্টার এঁকে শহরের বিভিন্ন দেয়ালে সেঁটে দেন। এগুলো অঙ্কনে বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছিল বাক্স্বাধীনতা হরণ, নিরাপত্তা আইন (কালা কানুন) প্রভৃতি। বাক্স্বাধীনতা হরণ বোঝাতে শিল্পী এঁকেছেন একটি মানুষের মুখ বাঁধা, যেন তাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না (চিত্র ১)। কালা-কানুন বা নিরাপত্তা আইনের জন্য আঁকা হয়েছিল স্টিম-রোলার। সরকার বিরোধী সরাসরি বক্তব্যপ্রধান এসব চিত্র জনগণকে সচকিত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।[৪]

একই সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে কি হবে না, এ রকম দ্বন্দ্বময় পরিবেশে চারুকলার ছাত্র শিল্পীগণ বিশেষ করে যারা কিছুটা বাম মনোভাবাপন্ন ছিল মূলত তারাই সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক পোস্টার, দেয়াল লিখন দ্বারা পরিবেশটিকে সংগ্রামী চেহারায় সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল। রাতভর বিভিন্ন জোরালো বক্তব্য সংবলিত পোস্টার লিখে ও দেয়ালে সেঁটে দিতে শিক্ষক শিল্পী কামরুল হাসান ছাড়াও চারুকলার যে সকল ছাত্র শিল্পী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বর্তমানের প্রোথিতযশা শিল্পী এমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এমদাদ হোসেন কেন্দ্রীয় ভাষা কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, আমিনুল ইসলাম ও মুর্তজা বশীর ছাত্রাবস্থাতেই বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। মুর্তজা বশীর ময়মনসিংহের টংক বিরোধী আন্দোলনের সপক্ষে স্ব-অঙ্কিত পোস্টার দেয়ালে লাগাতে গিয়ে বন্দী হন (১৯৫০)। পোস্টারটির মাঝখানে ছিল ময়মনসিংহের ম্যাপ,

---

[৩] বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, "বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য" পি-এইচ.ডি থিসিস (আই.বি.এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩), পৃ. ২১৭।

[৪] তদেব, পৃ. ২১৮।

তাকে ঘিরে রয়েছে হাতুড়ি আর কাস্তে। ১৯৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারির পর ছাত্র শিল্পী মোস্তফা মনোয়ারও সরকার-বিরোধী পোস্টার আঁকার অপরাধে গ্রেফতার হয়ে কারান্তরালে গিয়েছিলেন। যা হোক, ২১শে ফেব্রুয়ারির ৪৪ ধারা ভাঙ্গার মিছিলে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিছিলে গুলি চালানোর প্রতিবাদে শিল্পীরা 'ঢাকা আর্ট গ্রুপে'র দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর ২২শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।[৫]

১৯৫৩ সালে ভাষা আন্দোলন বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে ব্যবহৃত ব্যানার ফেস্টুনগুলো ছিল অনন্যসাধারণ (চিত্র ২)। প্রায় সকল অগ্রজ শিক্ষক, শিল্পী ও আর্ট কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে এসব পোস্টার ফেস্টুনগুলো এঁকেছিলেন। একই দিনে প্রকাশিত *সৈনিক* পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ সংখ্যায়' তৎসময়ের শাসকদের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও সামাজিক রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়ে বেশ কিছু ছবি ও কার্টুন ছাপা হয় (চিত্র ৩)। সৈনিক পত্রিকার নিজস্ব শিল্পী ছিলেন কাজী আবুল কাসেম।

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ শিল্পীদের সমর্থন ছিল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে। এজন্য শিল্পীরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শত শত দেয়াল চিত্র, ব্যানার এবং ছবি এঁকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনগণের সহানুভূতি আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী যে সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়েছিল তাতেও শিল্পীরা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে নিরলস পরিশ্রমই শুধু করেননি, একটি চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও পোস্টার, পুস্তিকা, মঞ্চসজ্জা থেকে শুরু করে ছায়ানাট্যের পটভূমিতেও সক্রিয় ছিলেন।[৬] উল্লেখ্য, '৫৪ সালের এই সাহিত্য সম্মেলনে শিল্পীদের বিপ্লবী ভূমিকা লক্ষ করে তাঁদের চাকুরিসহ নানা প্রলোভনের মোহজালে আবদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় ইস্কান্দার মীর্জার ইন্ধনে গোড়াপত্তন করা হয় 'আর্ট কাউন্সিলে'র। '৫৪ সালেই সমগ্র পাকিস্তানের শিল্পীদের ছবি দিয়ে ঢাকায় এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হয়।[৭] এ প্রসঙ্গে পঞ্চাশ দশকের শিল্পী মোহাম্মদ ইদ্রিস বলেন,

> ...যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালির আর এক বিজয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোলকাতা থেকে আমন্ত্রিত সুধিজন এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমী আইন পাশ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ৯২(ক) ধারা জারী করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে ইসকান্দার মীর্জাকে ক্ষমতায় বসায়। ... সম্ভবত এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার

---

[৫] শিল্পী মুর্তজা বশীর কর্তৃক লেখককে দেওয়া (রেকর্ডকৃত) সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম : ২রা মে, ২০০০।

[৬] বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১২৮-২৯, ১৩৪-৩৭, ২৬৩-৬৪, ২৮৩, ৫৪৫; আবদুল লতিফ, "ভাষা আন্দোলনে শিল্পকলার ভূমিকা", এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (চারুকলা ইনস্টিটিউট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২-৮৩), পৃ. ১১-২৭।

[৭] কামরুল হাসান, "আমার কথা: বাংলাদেশের শিল্পী আন্দোলন", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কামরুল হাসান* (ঢাকা: থিয়েটার, ১৯৯০), পৃ. ১৫৬-৫৭।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অস্ত্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে 'আর্ট কাউন্সিলে'র শাখা গঠন করে। এ উপলক্ষে শাহবাগ হোটেলের সভাকক্ষে জৌলুসপূর্ণ অনুষ্ঠানে মিঃ খায়রুল কবীর আর্ট কাউন্সিল কর্ম-কাণ্ডের ঘোষণা দেন।[৮]

১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও ছিল শিল্পীদের ব্যাপক ভূমিকা। আন্তর্জাতিক রূপদানে প্রয়াসী এ সম্মেলনের মূল মঞ্চ থেকে আরাম্ভ করে প্রায় ৫০টি তোরণকে শিল্পীরা পৃথিবীর মহান নেতাদের নামে নামাঙ্কিত করে লোকজ নকশা ও প্রতীকের দ্বারা সুসজ্জিত করে তুলেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পোস্টার এঁকে প্রদর্শনী ও প্রচার কাজ সম্পন্ন করা হয়। শিল্পী কামরুল হাসান এই কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে ঢাকার প্রেস ক্লাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটিতে শিল্পীদের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল। সিম্পোজিয়াম ও নাটকের মঞ্চসজ্জাসহ শিল্পীরা একটি চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ঢাকা আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের একাংশের অবদান উল্লেখযোগ্য। ঢাকার সর্বত্র এবং ক্রমান্বয়ে দেশের অন্যান্য স্থানেও পোস্টার ও দেয়াল চিত্র এঁকে ও লিখে তাঁরা আন্দোলনের চেতনাকে ছড়িয়ে দেন। শিল্পী গোপেশ মালাকার, শামসুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন, কেরামত মওলা, প্রফুল্ল রায় ও রফিকুন নবী এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। আইউব বিরোধী আন্দোলনের সমান্তরালে পরিচালিত ঢাকা আর্ট স্কুলকে কলেজে রূপান্তরকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে এই শিল্পীরা আইউব বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী কেরামত মওলাকে সভাপতি করে এই সময় ছাত্র শিল্পীদের যে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, সেখানে উপরোক্ত শিল্পীদের সঙ্গে রণজিৎ নিয়োগী, আনোয়ার জাহান, মুনশী মহিউদ্দিন, লুৎফর রহমান, আর এস, এম, সালাম, বেলাল আহমদ প্রমুখ ছাত্র শিল্পী সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এদের সক্রিয়তায় সে সময় কার্টুনে পোস্টারে ঢাকা শহর ভরে উঠত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্টুনের মাস্টার কপি এঁকে দিতেন শিক্ষক শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার। ডাকসু'র তৎকালীন নেতৃবর্গ ছাড়াও বাইরে থেকে আরও যারা এ আন্দোলনে সর্বপ্রাণ সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে কমরেড রবি নিয়োগী এবং মোহাম্মদ ফরহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সম্পৃক্ততা থেকে ষাট দশকে শিল্পীদের বাম ঘেঁষা নীতির প্রতি বিশেষ দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক 'রাসটিকেট' প্রাপ্ত শিল্পী আনোয়ার হোসেন, কেরামত মওলা এবং শামসুল ইসলামের 'জনতার জন্য চিত্রকলা' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের (ঢাকা প্রেস ক্লাব) মধ্য দিয়ে তরুণ শিল্পীদের প্রতিবাদী চেতনায় সামাজিক দায় পালনের সরব প্রকাশ ঘটে।[৯]

---

[৮] মোহাম্মদ ইদ্রিস, "আলোর পথের যাত্রী", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ* (ঢাকা: মানব প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ. ১৬০।

[৯] বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ১৪৭; সাঈদ-উর-রহমান, *রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ৬৬-৭০। আনোয়ার হোসেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন", মতলুব আলী (সম্পা.) *রূপবন্ধ*, পৃ. ২০৯-১৩।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সম্বল করে গণসচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার প্রত্যয়ে ১৯৬০ সালের দিকে গঠিত 'সৃজনী সাহিত্যিক গোষ্ঠী'তে ১৯৬৩ সাল থেকে শিল্পীদের অন্তর্ভুক্তি ঘটতে থাকে। তখন থেকে এর নাম হয় 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী'। শিল্পী ইয়াকুব, এমদাদ হোসেন, কামরুল হাসান ছিলেন এ সংগঠনের প্রায় সার্বক্ষণিক শিল্পী। 'সৃজনী' ১৯৬৩ সালে শহীদ মিনারে আনিসুজ্জামানের *'দৃষ্টি'*, মঞ্চস্থ করে ১৯৬৮ তে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ম্যাক্সিম গোর্কীর *মা*, এবং জন রিডে'র *দুনিয়া-কাপানো দশদিন* এর নাট্যরূপ। যাবতীয় শৈল্পিক কাজে শিল্পীরা এ সময় যথাসাধ্য করেছেন। বিশেষ করে 'দুনিয়া কাপানো দশদিন' এর ছায়ানাট্যরূপ দেয়ায় কামরুল হাসানের ভূমিকা ছিল ব্যাপক।[১০] শিল্পীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে '৬৭ সাল থেকেই শহীদ মিনার ও মিনার চত্বরে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলনের চিত্রমালা প্রদর্শনী গণ আন্দোলনের এক বিশেষ বিষয় ও মাত্রা হিসাবে সংযোজিত হয়। এ সবের মধ্য দিয়ে অবাঙালি শাসকের রূদ্ররূপ আর সংগ্রামী বাণী শুনে বাঙালিরা উজ্জীবিত হয়েছিল।[১১] '৬৯ সালে শহীদ মিনারে এমন কিছু ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়, যেগুলো বাংলা ভাষার প্রতিটি অক্ষরকে ভিত্তি করে গণজাগরণমূলক বক্তব্য সংযুক্ত করে চিত্রিত করা হয়েছিল (চিত্র ৬)। ছবিমালা দিয়ে ক্ষণস্থায়ী ম্যুরাল রচনা প্রয়াসে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর সম্পৃক্ততাও এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়।

তৃতীয় পর্যায়

শিল্পী কামরুল হাসান পোস্টার এবং আল্পনাকে শিল্পে পরিণত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে শিল্পীরা বাংলার ঐতিহ্যিক আল্পনা ও বর্ণমালা দ্বারা সজ্জিত পোস্টার দিয়ে বাংলা একাডেমীর বট-বৃক্ষটিকে আবৃত করে অক্ষর-বৃক্ষে রূপান্তরিত করেন (চিত্র ৪)। '৬৯ সাল থেকেই কামরুল তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও বাস্তব উপলব্ধি থেকে গোপনে স্বৈরশাসক ইয়াহিয়ার দানবীয় প্রতিকৃতি আঁকতে থাকেন। '৭১ সালের ২৩ শে মার্চ শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এইরূপ প্রায় দশটি প্রতিকৃতি সংবলিত পোস্টারের প্রদর্শনী হয়। শিরোনাম ছিল *'এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে'* (চিত্র ৫)।

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পর সারা দেশের মানুষের সাথে শিল্পীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'স্বাধীনতা' এই চারটি অক্ষর ও অসংখ্য কার্টুন, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে তাঁদের এক সংগ্রামী মিছিল শহীদ মিনার থেকে বাহাদুর শাহ্ পার্ক পর্যন্ত যায়। জয়নুল আবেদিন তাতে নেতৃত্ব দেন। তাঁদের সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ও যুগ্ম সভাপতি

---

[১০]সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, *ষাট ও সত্তরের দশক : সৃজনী* (ঢাকা: সুবর্ণ, ১৯৮৭), পৃ. ভূমিকা।

[১১]শিল্পী ও শিল্প সমালোচক আবুল মনসুর কর্তৃক লেখককে দেওয়া (লিখিত) সাক্ষাৎকার (চট্টগ্রাম: ২৮ শে মার্চ, ১৯৯৬)।

ছিলেন মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরী। বস্তুত, শেখ মুজিবের ভাষণের পর শিল্পীরাই 'স্বাধীনতা' আদ্যক্ষরকে বুকে ধারণ করে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য রাজপথে নেমে আসেন। একাত্তরের ৫ই মার্চ শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জমায়েত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণাকালে লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শিল্পীরাও সমস্বর ছিলেন। 'তুলি-কলম-কাস্তে-হাতুড়ি এক কর এক কর', 'লেখক শিল্পী ছাত্র জনতা এক হও এক হও' শ্লোগান দুটি এদিন থেকেই প্রকাশ্যরূপে তীব্রতর হয়। ৬ই মার্চ বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত শিল্পকলার বিভিন্ন অঙ্গনের শিল্পীদের যৌথ সভায় চারু শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বকারী কামরুল হাসান প্রতিবাদী, সংগ্রামী চিত্রকরদের চিত্র কলা রচনার ধারা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেন। শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার, এমদাদ হোসেন, কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজে'র ব্যানারে ৮ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নেতৃত্ব, আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে আসেন। ১০ই মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম কমিটি'র সভা থেকে কবি শিল্পীদের আপোসকামিতা পরিহার করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে অধ্যাপক আবুল ফজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাতে লেখক সাহিত্যিকদের সঙ্গে চারুশিল্পীদেরও উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। ১৬ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত সভা থেকে জয়নুল আবেদিন 'শিল্পীর তুলি বন্দুকের চেয়েও বেশি শক্তিশালী' বলে মন্তব্য করেন। শিল্পী মুর্তজা বশীরও এই সভায় বক্তৃতা করেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান বিমান ও নৌবাহিনীকে সহায়তার প্রতিবাদে ২৩ মার্চের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে লেখক সংগ্রাম শিবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ, এবং ঢাকার সাহিত্যকর্মী ও শিক্ষকগণের সঙ্গে চারুশিল্পীদের সামিল হতে দেখা যায়।[১২] এভাবে দেখতে গেলে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্পীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাদা ইতিহাস রচিত হতে পারে।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উজ্জীবনে শিল্পীরা প্রচ্ছদ শিল্পের মাধ্যমে সাহিত্যিকদের সঙ্গে একযোগে চলাতে চেয়েছেন সবসময়ই। একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সংকলনটি বাঙালির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সে সময় এই বোধটি যেন শিল্প-সাহিত্যে ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ক্রিয়াশীল ছিল যে, সকল সৃষ্টির উৎস 'একুশ'; আবার যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে তা 'একুশে'র জন্যই। সংকলনটির প্রচ্ছদপট (চিত্র ৭) এঁকেছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। বন্দিত্বের প্রতীক কাঁটা তার এবং চারটি লাল ব্যানারকে আন্দোলন-বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে কম্পোজ করে

---

[১২] হাশেম খান ও আইনুল হক (সম্পা.), *রজত জয়ন্তী উৎসব ক্যাটালগ-৭৩* (ঢাকা: বাংলাদেশ চারুকলা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭), পৃ. অস্পষ্ট; অনুপম হায়াৎ, "একাত্তরের গণ আন্দোলন ও শিল্পী সমাজ", *মুক্তকণ্ঠ* (ঢাকা), ২৮ শে মার্চ, ১৯৯৮।

প্রচ্ছদটি রচিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে শিল্পী মুর্তজা বশীরের লিনোকাট ছাপচিত্র এবং শিল্পী বিজন চৌধুরীর রেখা চিত্র (চিত্র ৮) সংকলনটির মান বৃদ্ধি করেছে। 'সৃজনী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী'র ১৯৬৩ সালের' একুশের এরকম একটি সংকলন *পলাশ ফোটার দিন'র* প্রচ্ছদটিতে (চিত্র ৯) প্রথম শহীদ মিনারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লোকজনের মন থেকে ১৯৫২ সালের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করে সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করাই ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্য। প্রচ্ছদ শিল্পী নিয়ামত হোসেন নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী না হওয়াতে সম্ভবত মুর্তজা বশীরের একটি চিত্র অবলম্বনে প্রচ্ছদটি অঙ্কন করেছেন। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'সৃজনী'র বার্ষিকী 'সৃজনী' নানাদিকে থেকে একটি বিশেষ স্মরণীয় সংকলন। 'সৃজনী'র আদর্শের প্রতি অনুরাগী শিল্পী হারাধন বর্মণ এটির প্রচ্ছদ (চিত্র ১০) এঁকেছেন। প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে, শূন্য প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীলতা ও সভ্যতার প্রতীক একটি চাকা সৃজন প্রয়াসে চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যিকতার প্রতীক একটি আল্পনাকে কেন্দ্র করে আবর্তনরত-ঋদ্ধকরণরত। কূপমণ্ডূকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি যাবতীয় রক্ষণশীলতা পরিহার করে মানবতাবদী চেতনায় প্রগতিশীলতার পথে দেশ এবং দৈশিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে প্রত্যয় ১৯৬৩ সালে 'সৃজনী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী' ঘোষণা করেছিল, প্রচ্ছদটিতে তাই যেন ফুটে উঠেছে। আর প্রায় এই রকম চেতনাকে আশ্রয় করেই বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। আসলে ষাট দশকের শুরু থেকেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উপলক্ষে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক নানা সংকলন গ্রন্থ ও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। সে আমলে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক প্রকাশিত একুশের সংকলন পুস্তিকার প্রচ্ছদ চিত্র, রেখা চিত্র, অঙ্গসৌষ্ঠবে তৎকালীন অস্থির সময়কে তুলে ধরার প্রয়াস যেমন পেয়েছেন শিল্পীরা, তেমনি আবহমান বাংলার রূপকে, একুশের চেতনা ও আন্দোলনকে ফুটিয়ে তুলেছেন (চিত্র ১১)। সংস্কৃতি সংসদ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কর্তৃক প্রকাশিত এমন দুটি পুস্তিকা বা স্মরণিকার খবর পাওয়া যায়, যেখানে কবি ও শিল্পীদের একযোগে কাজ করতে দেখা যায় এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা মা-মাতৃভূমি ও মানবতাবাদের চেতনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

একুশের চেতনায় স্বাধীনতার সপক্ষে স্বনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে উৎসাহিতকরণে 'সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা স্বীকার্য। সংসদের পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত '৭০ সালের একুশের স্বরণিকাটি'তে প্রতিটি কবিতার পার্শ্বে একটি করে চিত্রকর্ম ছাপা হয়েছে। একই রকম দেখা যায় '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটিতেও। এই সংখ্যাটি আবার 'সোনার হরিণ চাই' শিরোনাম যুক্ত। তাতে বোঝাই যাচ্ছে স্বাধীনতার সোনার হরিণকে কব্জায় আনার অদম্য স্পৃহাই পুস্তিকাটির শিল্প-সাহিত্যের মূল ভাব-দর্শন। দুটি পুস্তিকারই প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনায় ছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। কবিতার পার্শ্বে ছাপা হলেও ছবিগুলো কবিতার ইলাস্ট্রেশন নয়

বলেই মনে হয়। ইমেজ অথবা ভাব-দ্যোতনা এবং রূপকল্পে কবি-শিল্পীর আদর্শিক মিলটুকু দেখেই কখানো কখানো তা পাশাপাশি ছাপানো হয়েছে। ধারণাটি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায়, কবিতার খণ্ডাংশের সঙ্গে চিত্রের অ-বিস্তার খণ্ডিত আলাটপুকুই শুধু চলে। সাদা কালোতে ছাপানো শিরোনামহীন চিত্রগুলো কোন মাধ্যমে করা হয়েছে তা জানা যায় না; শুধু চিত্রের ইমেজ এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে বলতে হয়। অর্থাৎ চিত্র ও কবিতাগুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূ এবং ভাবগত দিক থেকে সর্বক্ষেত্রে পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি '৭০ সালের স্মরণিকাটিতে কবি জসীমউদ্‌দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকানদার আবু জাফর, শামসুর রাহমান, মমতা হেনা, মাসুদ আহমেদ মাসুদ, কাজী হাসান হাবিব, আসেম আনসারী'র কবিতা স্থান পেয়েছে। যে সমস্ত চিত্রকরের কাজ কবিতাগুলোর পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাঁরা হলেন, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, রফিকুন্নবী, মুস্তফা মনোয়ার, ইমদাদ হোসেন, মহিউদ্দীন ফারুক ও প্রাণেশ মণ্ডল (চিত্র ১২)। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'সংস্কৃতি সংসদে'র একুশের স্মরণিকাটির কোথাও কোথাও কবিতা এবং চিত্রকলা পাশাপাশি ছাপানো হয়েছে। স্মরণিকাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে *সোনার হরিণ চাই*। সময় বিচারে যথার্থ শিরোনাম। তখন '৭০-এর নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। ছয় দফা নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের দরকষাকষিতে প্রকাশ পাচ্ছে মুজিবের অনড়তা। নির্বাচনী ফলাফল বিচারে স্বাধীনতার সোনার হরিণটিকে ধরার সাহস বাঙালিরা ইতিমধ্যেই ধারণ করে ফেলেছে। ৭ই মার্চ তখনো কিছুটা দূরে। স্মরণিকাটিতে শামসুর রাহমানের 'শ্লোগান', সিকানদার আবু জাফরের 'একুশের আসরে', আল মাহমুদের 'যার স্মরণে', সন্তোষ গুপ্তের 'সম্প্রতি স্বদেশ', মাসুদ আহমেদ মাসুদের 'মেনিফেস্টো' মাহমুদ আল জামানের 'প্রত্যহ যাই' কবিতা ছাপানো আছে। চিত্র আছে কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, নিতুন কুণ্ডু ও রফিকুন্নবী'র (চিত্র ১৩)। এই যৌথ প্রয়াসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি-শিল্পীরা একুশের সূত্র ধরে মা-মাতৃভূমির চেতনাকে লালন করে পরোক্ষে জড় জঙ্গমের নিয়ত ক্রিয়াশীলতায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা ইহজাগতিক বোধে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। উপরন্তু কোনো কোনো সময়ে দেখা যাচ্ছে, মুক্তির কামনায় স্বাপ্নিক দৌড়ে কবিতার চেয়ে চিত্রকলা হয়েছে অগ্রগামী। এরকম চিত্রকলার আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি অ্যালবাম হতে।

চতুর্থ পর্যায়

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জনগণকে মুক্তির সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করতে "শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতি-সেবী সংঘ, চট্টগ্রাম" কর্তৃক 'বাংলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক এলবামটি প্রকাশিত হয়, যার বিনিময় মূল্য

প্রায় ছিল না বলা চলে। এই অ্যালবামে দেশের ছয়জন বিশিষ্ট চিত্র শিল্পীর ১৫"×২০" সাইজের চকলেট রঙে মুদ্রিত ৬টি লিথোগ্রাফ ছিল। শিল্পীরা হলেন, রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ্-উল-আলম, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, এবং আনসার আলী। ছবিগুলোর বিষয়বস্তু হলো প্রতিবাদী ও প্রতিরোধ সংগ্রামে উন্মুখ জনতা এবং তার পরিবেশ। বিশেষ করে এ ব্যাপারটি রশীদ চৌধুরী অঙ্কিত চিত্রটিতে (চিত্র ১৪) প্রতিফলিত হয়েছে : স্বাধীনতার পতাকা, মশাল, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র হাতে অগ্রগামী নারী-পুরুষ শিশুদের সাথে বাংলার জীবজন্তুও যেন একাত্ম হয়েছে একটি সাধারণ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। এ ভাবের বিপরীত লক্ষণ দেখা যায় সবিহ্-উল-আলমের চিত্রটিতে (চিত্র ১৫)। এখানে শকুনরূপী ভয়ঙ্কর পাকিস্তানিদের আক্রমণ আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত বাংলার আম-জনতা ও পশুপাখি, প্রেক্ষাপটে বিধ্বস্ত প্রকৃতির আভাস। শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণে উজ্জীবিত মিজানুর রহিমের চিত্রটি (চিত্র ১৬) তৎকালীন স্বাধীন বাংলার পতাকার নকশাটিকে কাঠামো হিসেবে ধরে রচিত হয়েছে। স্বাধীনতার সূর্য প্রতীকের বৃত্তাকার প্রেক্ষাপটটিতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত দৃঢ়চেতা জনতা ছবিটির বিষয়বস্তু। এখানে প্রতিরোধী জনতাকে বাংলার মানচিত্রের কাঠামোতে সন্নিবদ্ধ করে স্বাধীনতার প্রয়োজনে-মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধতার প্রতিই যেন শিল্পী ইঙ্গিত করেছেন। স্বাধীনতার লাল সূর্যটি ছিনিয়ে আনতে গেলে লড়াই অবশ্যম্ভাবী এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত থাকতে হবে; আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগণ ঐ ক্ষণে প্রস্তুতও বটে, এই হলো দেবদাস চক্রবর্তী অঙ্কিত চিত্রটির (চিত্র ১৭) মূল ভাব। আব্দুল্লাহ খালিদের চিত্রটিতে (চিত্র ১৮) নেতৃত্বদানকারী বর্ষীয়ান ব্যক্তিটির অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে দৃঢ় অঙ্গীকার, ক্রোধ, ও যুদ্ধক্ষেত্রের সতর্কতা। মার্চের ১৪ তারিখেই শিল্পী আনসার আলীর মানস পটে ফুঠে ওঠে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং বিজয়। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যময় তাঁর চিত্রটি (চিত্র ১৯) যেন এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার আগাম ঘোষণা। এভাবে শিল্পীদের শিল্পকর্মে আন্দোলন সংগ্রামের ভাবরূপ বিভিন্ন সহজলভ্য মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। কখনো কখনো তা সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই সৃষ্টি করেছেন শিল্পীরা।

মুক্তিযোদ্ধাদের ঐতিহ্যিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দখলদার সাম্প্রদায়িক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা দানে চিত্রী ও চিত্রকলার ছিল অন্য আরেক ভূমিকা। এ ক্ষেত্রেও আমরা কোনো কোনো সময় একই শিল্পীদের পূর্বের ন্যায় পোস্টার কার্টুন ইত্যাদি মাধ্যমকে অবলম্বন করে যুদ্ধকালীন দায়িত্ব পালন করতে দেখি। মূলত মুক্তাঞ্চলের মাঝে প্রচারের উদ্দেশ্যে চারু শিল্পীদের কৃত এসব পোস্টার-চিত্রে বিধৃত হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী। ১৯৭১ সালে ১৭ই এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের অধীনে গড়ে ওঠে 'ডিজাইন ও আর্ট ডিভিশন'। শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, প্রাণেশ মণ্ডল, নিতুন কুণ্ডু প্রমুখ শিল্পীরা এই বিভাগে কর্মরত থেকে পোস্টার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পরে তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

কামরুল হাসান অঙ্কিত হিংস্র ইয়াহিয়ার দানবসদৃশ বিকৃত মুখ সংবলিত 'এই জানোয়াদের হত্যা করতে হবে' (চিত্র ২০) পোস্টারটি পাকিস্তানিদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। পোস্টারে ব্যবহৃত প্রতিকৃতি চিত্রটি শুধু বাংলার বুকে তাণ্ডবলীলা পরিচালনাকারী অশুভ শক্তি ইয়াহিয়া খানেরই প্রতিরূপ মাত্র নয়, মূলত এটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ তৃতীয় বিশ্বের সকল সামরিক শাসকদের দানবীয় চরিত্রের প্রতীকায়িত চিত্রও বটে।

দেবদাস চক্রবর্তী অঙ্কিত পোস্টারটিতে (চিত্র ২১) বাংলার হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রতিটি সম্প্রদায়ের উপাসনা গৃহ পাশাপাশি অঙ্কন করে সকল ধর্মের সহাবস্থানের বাঙালি ঐতিহ্যিকতার চিত্রটিই যেন তুলে ধরা হয়েছে। পোস্টারের লেখাগুলোও এই বোধকে দৃঢ় করে। ধর্মভীরু বাঙালির ধর্মীয় চেতনাকে অস্বীকার করে নয়; সম্প্রদায়গত বিভাজনেও নয়, ব্যক্তি মননের উন্নয়নে ধর্মের মঙ্গলময় চর্চার স্বীকৃতিই এই পোস্টার। প্রচলিত রক্ষণশীল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নাস্তিকতার নামান্তরই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ইহজাগতিকতা বোধ। বাংলার ধর্মভীরু সমাজাচরণের প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতার সরলীকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অবশেষে ভাবগত অর্থে যা দাঁড়ায়, তা হলো 'যার যার ধর্ম- তার তার, মেহনতী মানুষ এক কাতার' অথবা 'যার যার ধর্ম-তার তার, রাষ্ট্রের আছে কী করার'। মোটামুটি ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মের অপব্যবহারকারী হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশমুক্তির লড়াইকালে মুজিবনগর সরকার ঐতিহ্যিক সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক স্রোতোধারায় উত্থিত ভাষাভিত্তিক বাঙালিত্বের চেতনার এই পোস্টারটি প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন সরকার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শের কথাই প্রচারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পোস্টারটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অমূল্য দলিল, যুদ্ধকালীন বাঙালিদের মুক্তিকামী মানসের মৌল চেতনা ধারণকারী ঐতিহাসিক চিত্রিত কীর্তি।

অপর একটি প্রচারিত পোস্টার যা, বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের দুটি করে মোট চারটি আদ্যবর্ণ নিয়ে রচিত হয়েছে (চিত্র ২২)। এখানে শ্লোগান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে *এক একটি বাংলা অক্ষর এক একটি বাঙালির জীবন*। পোস্টারটির মূল বিষয় এবং শ্লোগান প্রকৃতপক্ষে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাসের উৎস মূলে গেঁথে দিয়েছে। পোস্টারটির শিল্পীর নাম জানা যায় না।

নিতুন কুণ্ডু অঙ্কিত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংকল্পদৃঢ় মুখাবয়ব ও হাতে ধরা অস্ত্র সংবলিত *সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী* শীর্ষক পোস্টার চিত্রটিও (চিত্র ২৩) যুদ্ধকালীন চিত্রকলার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাদা কালো ও কমলা রঙের রেখায় অঙ্কিত পোস্টারটি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাহস, মানসিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের ভাবাবেগের অপূর্ব সমন্বয়ের ছবি। শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডলের আঁকা ঠিক এ ধরনের একটি পোস্টার চিত্র *বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা* (চিত্র ২৪)-এতে দেখানো হয়েছে সজল নেত্রের এক বঙ্গললনা সবশেষে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাঁর রাইফেলটি ধরে আছে। পোস্টারটির মাঝে লুক্কায়িত আছে বঙ্গীয় ললনাদের ওপর পাক-বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের ইতিহাস। প্রচার দফতর বাংলার নারীদের শত্রু হননে উদ্দীপ্ত করার কাজে এই পোস্টারটির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন।

উপসংহার

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কার্যত একটি ধর্মবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৮-'৭১ কালপর্বে বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো লক্ষ্য করে সংস্কৃতির রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হওয়া যায়, তেমনি সমাজ জাগরণে ও উদ্দীপনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভূতপূর্ব ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কেও ধারণা

পাওয়া যায়। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গবাসীদের উপর তাদের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য পরিত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং নতুন ধরনের ইসলামী সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছিল। তারা ধারাবাহিকভাবে প্রবহমান প্রগতিশীল মানবতাবাদী শিল্পধারাকে প্রথমবস্থায় রুদ্ধ করতে, পরবর্তীতে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, বস্তুত যা ছিল জনবিচ্ছিন্ন। নিরাবয়ব/নির্বস্তুক তথা বিমূর্ত আঙ্গিকের সেই সব অস্পষ্ট চিত্রসম্ভারের ভেতর পাকিস্তানি শাসন ঐতিহ্যের ভারযুক্ত পূর্বপাকিস্তানি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আর সংস্কৃতির গভীর অতীতের জড়বাদী মানস প্রবণতায় জীবন ও সংসার বিষয়ক সচেতনতার ক্রমধারাতে শ্রদ্ধাবনত চিত্র ও চিত্রীমানস বাস্তবানুগই হয়, সেই ধারণাও আলোচনাতে পাওয়া গেল। বোঝা গেল, জাতীয় জীবনে ধারাবাহিকভাবে অবদান রাখতে সক্ষম এই ধারার শিল্প, শিল্পীর মানস চৈতন্যের সচেতনতায় প্রতিবাদী এবং আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতার বিস্ফোরিত রূপ। স্বৈরশাসনিক অত্যাচার এবং নিজস্ব জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই বাঙালি শিল্পীরা সমকাল স্বদেশ ও মানবতাবাদী চেতনার পথে তাদের বাস্তব সঙ্গত তুলি সঞ্চালিত করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ মুক্তির কাঙ্ক্ষিত ফললাভের আশায়।

মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বাঙালিত্বের নির্যাস, তাকে স্বরাজ্যে স্বভিত্তিতে প্রখরতর করার যে উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল, তার প্রতি শিল্পীদের একাত্মতা তাদের স্বদেশপ্রেম ও উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশসূচক। রাজনীতি, সমাগ্রিকভাবে বলতে গেলে সামাজিক প্রয়োজনে একাত্তর পর্যন্ত এই শৈল্পিক প্রবণতার যথার্থ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, বাংলা সমাজের আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশোন্মুখ জাতি হিসেবে প্রকাশ প্রয়াসে শিল্পীরা অংশী হয়েছিলেন সেই সমাজের দায়িত্বশীল অংশ হয়েই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আদর্শিক মতৈক্যের ভিত্তিতে অথবা সমর্থনে বা সমান্তরালে শিল্পীদের ব্যক্তিগত সক্রিয়তা, তাঁদের দেশ জননীর জন্য অন্তর ক্রন্দন এবং শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নকর্মীর দায়সূচক। শিল্পী মানসে প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতার সচেতন উপস্থিতির ফলে মানবতার অবমাননাকারীদের চিহ্নিত করণে, এদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের শৈল্পিক দায়ে শিল্পীরা আবদ্ধ হয়েছিলেন। জাতীয় বিপর্যয়ে স্বদেশপ্রেম তথা মা-মাতৃভূমির চেতনায় স্বাদেশিক সবকিছুর জন্যই শুভ কিছু করতে পারার শৈল্পিক আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল, যা চিরদিন পথের দিশারী হয়ে থাকবে।

চিত্র পরিচিতি

চিত্র ১ : বাক্ স্বাধীনতা হরণ

চিত্র ২ : ব্যানার চিত্র

১

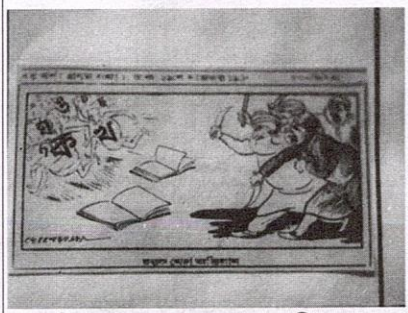

চিত্র ৩ : হরফ খেদা অভিযান

৩

চিত্র ৪ : অক্ষর বৃক্ষ

২

৪

চিত্র ৫ : ইয়াহিয়ার প্রতিকৃতি

চিত্র ৬ : অক্ষর চিত্র

চিত্র পরিচিতি

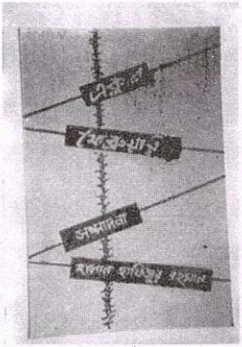

চিত্র ৭ : একুশের সংকলন প্রচ্ছদ

চিত্র ৮ : একুশের ড্রইং

চিত্র ৯ : একুশের সংকলন প্রচ্ছদ

চিত্র ১০ : বার্ষিক সৃজনীর প্রচ্ছদ

চিত্র ১১ : একুশের সংকলন প্রচ্ছদ

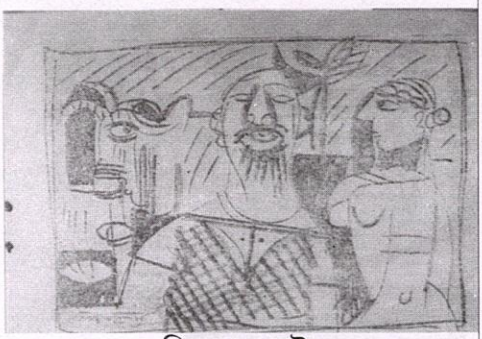

চিত্র ১২ : ড্রইং

চিত্র পরিচিতি

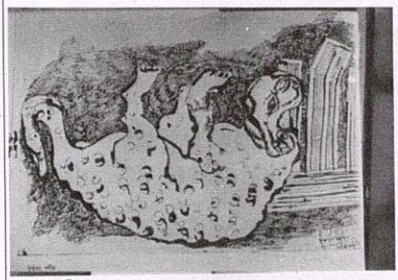

চিত্র ১৩ : পরাভূত দানব

চিত্র ১৪ : বাংলায় বিদ্রোহ

চিত্র ১৫ : বাংলায় বিদ্রোহ

চিত্র ১৬ : বাংলায় বিদ্রোহ

চিত্র ১৭ : বাংলায় বিদ্রোহ

চিত্র ১৮ : বাংলায় বিদ্রোহ

চিত্র পরিচিতি

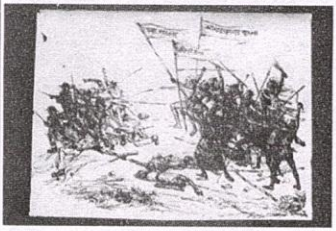

চিত্র ১৯ : বাংলায় বিদ্রোহ

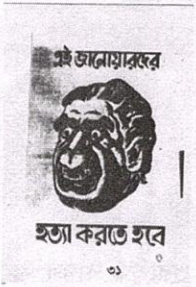

চিত্র ২০ : এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

চিত্র ২১ : আমরা সবাই বাঙালি

চিত্র ২২ : অ, আ, ক, খ

চিত্র ২৩ :
সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তি বাহিনী

চিত্র ২৪ : বাংলার মায়েরা
মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বাংলাদেশ-কুয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্ক : সমস্যা ও সম্ভাবনা

আখতার জাহান দুলারী*

Abstract: Presently Kuwit is one of the richest countries of the Gulf area. Befor the Socond World War, it was known as barren and poor land. After discovering the natural wealth oil, Kuwit turned into rich country. The trade relation between Bengal and the Arabian States was build up in the ancient period. During the liberation war of Bangladesh in 1971 Kuwit did not support Bangladesh. But they recognised Bangladesh as a soveign state in 1974.

ভূমিকা

পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র উপসাগরীয় রাষ্ট্র হিসেবে সমধিক পরিচিত। এর মধ্যে কুয়েত, কাতার, বাহ্‌রাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত উপসাগরীয় এলাকাসমূহ সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বঞ্চিত, শুষ্ক, অনুর্বর, বালুকাময় এবং পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র ও অনুন্নত এলাকা হিসেবে বিবেচিত হতো। পরবর্তী কালে তেল এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির ফলে রাতারাতি উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিবর্তন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৭১০ সালের দিকে মধ্য আরব থেকে আনাজা গোত্রমণ্ডল অত্যাধিক খরার কারণে পানি এবং চারণভূমির সন্ধানে উপকূলের দিকে আগমন করে। আনাজা গোত্রমণ্ডলের মধ্য থেকে আস-সৌদ গোত্র সৌদি আরবে, আল-খলিফা গোত্র বাহরাইনে এবং আস-সাবাহ্ গোত্র কুয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] আস-সাবাহ গোত্র অধ্যুষিত কুয়েত ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য গুরুত্ব অর্জন করে। এমনকি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে বার্লিন-বাগদাদ রেল পথের প্রস্তাবিত শেষ স্টেশন হিসেবে কুয়েত[২] অন্যান্য বিশ্ব শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩]

---

* আখতার জাহান দুলারী, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, পচামাড়িয়া ডিগ্রী কলেজ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

[১] C.H. Mohammad Koya, *Camel To Cadillac* (New Delhi: Sterling Publishers Ltd., 1979), p. 18; বিস্তারিত জানতে Derek Hopwood (ed.), *The Arabian Penisula Society and politics* (London, 1972, p. 32.

[২] ধারণা করা হয় যে আস-সাবাহ গোত্র কুয়েতে বসতি স্থাপনের পর আত্মরক্ষার জন্য 'কুত' বা দুর্গ গড়ে তুলেছিল, সেই থেকে কুয়েত নামের উৎপত্তি। দ্র.: *Encyclopaedia Britannica,* Vol. 13, pp. 519-

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কুয়েতের অর্থনৈতিক অবস্থায় তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। উপসাগরীয় অন্যান্য অঞ্চলের গতানুগতিক জীবন ধারার মতোই বছরের কয়েক মাস মুক্তা আহরণ, মাছ ধরা, নৌকা প্রস্তুত এবং ছোট-খাটো কিছু বাণিজ্যই ছিল কুয়েতের অর্থনৈতিক জীবন। মাত্র ১৮,৮৬৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এ দেশটি তেল সম্পদের কারণে অনেকটা রাতারাতিই দরিদ্র অবস্থা থেকে অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কুয়েতিরা লেবানন থেকে উর্বর মাটি এনে অনুর্বর, শুষ্ক, বালুকাময় মরুভূমিকে উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। সু-উচ্চ ভবন, ঝকঝকে রাস্তাঘাটসহ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে তাদের ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের ছোঁয়া।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্ব এবং ইরাক ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা ছাড়া গোটা আরব বিশ্বই পাকিস্তানকে সমর্থন করে, শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানকে আর্থিকভাবে সহায়তা দান করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই আরব বিশ্বেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কুয়েত সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে (১৯৭৪ সালের ৫ মার্চ) স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীতে কুয়েতের পথ অবলম্বন করে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কুয়েত সম্পর্কের সূচনা হয়।

প্রাচীন বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

উপসাগরীয় অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মতো কুয়েতের সাথে বাংলার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহু পুরাতন। আরবদের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয়েছে বহুকাল আগে থেকেই। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে সিন্ধু সভ্যতার (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ৫০০০) যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে সীলমোহর অন্যতম। সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরগুলোতে মেসোপটেমীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে একই ধরনের সীলমোহর কুয়েতের ফাইলকা এবং বাহরাইনেও পাওয়া যায়।[৪] সিন্ধু অববাহিকায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলো আরবদের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের স্বাক্ষর বহন করে। আরব সওদাগর এবং ধর্মপ্রচারকদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে। পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মুসলিম আমলের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। এই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলো আরবদের সাথে বাংলাদেশের প্রাক-মুসলিম যুগের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ দেয়।[৫]

520; Ahmad Mustafa Abu Hakima, *History of Eastern Arabia 1750-1800 The Rise and Development of Bahrain and Kuwait(* Bereit, 1956), p. 50.

[৩] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৬১।

[৪] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত)* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ৬০।

[৫] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলার ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ১৫১।

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেসব আরব বণিকদের উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে বণিক সুলায়মান উল্লেখযোগ্য। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত তার 'সিলসিলাত-উত তাওয়ারীখে' বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। খুরদাদবিহ দশম শতাব্দীতে রচিত তার 'কিতাব উল-মাসালিক ওয়া মামালিক'-এ আরবদের সাথে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। আল-মাসুদী (দশম শতাব্দী) এবং আল-ইদ্রিসী (একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) বাংলাদেশের সাথে সমুদ্র বাণিজ্যের উল্লেখ করেন। এছাড়া ইবনে বতুতার বিবরণেও পাওয়া যায় এদেশের লোকেরা সূক্ষ্ম ও মিহি পোশাক (মসলিন) তৈরি করতে পারত। তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের রাজদরবারে মসলিন কাপড়ের বিশেষ কদর ছিল। আরব বণিকগণ এদেশ থেকে মসলিন কাপড়, চাল, গমসহ বিভিন্ন খাদ্য শষ্য এবং মসলা ক্রয় করতো বলে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালীন বাংলায় হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, জিরা ও লবঙ্গের উৎপাদন হত প্রচুর। মার্কোপোলোরবর্ণনাতেও আরবদেশে এসব পণ্যসহ চিনি রফতানির উল্লেখ রয়েছে।[৬] অতএব ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদি থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবদের বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ হয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক তথা অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই ধারাবহিকতায় আধুনিককালেও আরব বিশ্বের বা এর অংশ বিশেষ যেমন কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি রাষ্ট্রের সাথে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

বাংলাদেশে-কুয়েত সম্পর্কের উন্নয়ন

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অর্থনীতির ভৌত কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও দুর্বল নবজাতক রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ। নিদারুণ দারিদ্র্য ছাড়া সেই মুহূর্তে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার মতো বাংলাদেশের আর কোনো পরিচয় ছিল না। সে কারণেই প্রথম থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল দ্রুত আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ ও কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিত করা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ব্রিটেনের মতো কিছু পুঁজিবাদী দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্ব, আরব বিশ্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মত উন্নত ও বড় শক্তি বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। কাজেই যুদ্ধের পর এসব দেশ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্বাসনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ছিল একান্ত প্রয়োজন। ফলে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশকে আরব বিশ্ব বিশেষ করে উপসাগরীয় ধনী রাষ্ট্রসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্যোগী হতে হয়।

বাস্তবিকপক্ষে উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয় ১৯৭৪ সালের ১২ই জুন, তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের ইরান, সৌদি

---

[৬] *তদেব*; দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ (কলকাতা: ১৯৯২), পৃ. ২৫৮-২৬০ ও ২৯৯।

আরব এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ সফরের মধ্য দিয়ে। সফরকালে তিনি আবুধাবী, কাতার ও বাহরাইনের আমীরদের সাথে সাক্ষাৎ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য আমদানি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৭] ঐ বছরই ১৪ই জুলাই বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহম্মদ রাষ্ট্রীয় সফরে মধ্যপ্রাচ্যে যান।

১৯৭৪ সালের মধ্য আগস্টে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে বন্যা কবলিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত অবস্থায় বন্যার আঘাতজনিত পরিস্থিতি ছিল অনেকটা গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো। পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দল এ সময়ে কুয়েত সফর করে। এ সময় কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে ৩০০ টন খাদ্য সাহায্য দেবার ঘোষণা দেয় এবং অন্যান্য সহযোগিতারও আশ্বাস দেয়।[৮]

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় কুয়েত দূতাবাস খোলা হয়। কুয়েতে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত হিসেবে লে.জে ওয়াসি উদ্দিন এবং বাংলাদেশে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে সাউদ আল-হুয়াইদী নিয়োগ লাভ করেন।[৯] দূতাবাস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও কুয়েত এ দুটি দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

বাংলাদেশ-কুয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্কে

বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও বন্যাদুর্গত দেশের তৎকালীন সংকট দূর করার জন্য প্যারিস কনসোর্টিয়ামে ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে গঠিত এই কনসোর্টিয়ামের মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত, আবুধাবী, ইরান এছাড়া বিশ্বব্যাংক, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদেশ অংশগ্রহণ করে।[১০] ১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশে কর্মরত রাষ্ট্রদূত সাউদ আব্দুল আজিজ আল-হামাদী বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ করে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কুয়েতের আগ্রহের কথা জানান। তিনি বলেন কুয়েত শীঘ্রই বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে। তিনি বলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কুয়েত সব ধরনের সাহায্য দিতে প্রস্তুত।[১১] এ সময়ে কুয়েত সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকে ৬০ লক্ষ কুয়েতি দিনার জমা দেয়। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কুয়েত এই ব্যাংকে টাকা জমা দেয়। ফলে তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুয়েতি অর্থ সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

---

[৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা জুন ১৩, ১৯৭৪।
[৮] *দৈনিক পূর্বদেশ*,ঢাকা, আগষ্ট ১৯, ১৯৭৪।
[৯] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৭৪।
[১০] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, অক্টোবর ৫, ১৯৭৪।
[১১] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, অক্টোবর ১০, ১৯৭৪।

১৯৭৪ সালের ১২ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এক রাষ্ট্রীয় সফরে কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আস সাবাহর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। কুয়েত ইতিপূর্বে বাংলাদেশে সার ও সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রকল্পে সাহায্য করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। কুয়েত, জাহাজ নির্মাণ, শিল্প স্থাপন, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি হয়েছে। তাছাড়া চালু শিল্পগুলোর কাঁচামাল যোগানের উদ্দেশ্যে কুয়েত বাংলাদেশকে ঋণ দিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করে। উক্ত বৈঠকে কুয়েত বাংলাদেশকে বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল আমদানির জন্য ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য দেবার ঘোষণা দেয়।[১২]

১৯৭৫ সালের প্রথম দিকেই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ কুয়েত বাংলাদেশকে একটি ৭০৭ বোয়িং বিমান উপহার দেয়।[১৩] কুয়েতের দেওয়া বিমানটি এসে পৌঁছালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। বন্ধুপ্রতিম কুয়েতের এ সাহায্য তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি সূত্রে জানা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কুয়েত বাংলাদেশের কয়েকটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৪] কুয়েত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, চাঁদপুর থেকে বাখরাবাদ এবং বাখরাবাদ থেকে চট্টগ্রামের মধ্যে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন এবং চট্টগ্রামে একটি সার কারখানা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুয়েত সর্বক্ষেত্রে উদার সাহায্য দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ২৮ জানুয়ারি তিন সদস্যের একটি কুয়েতি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। এ দলটি পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে ব্যাপক আলোচনা করে। কুয়েত যেসব প্রকল্পে সাহায্য দিতে রাজি, বিশেষজ্ঞ দল ঐ সব প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। এই বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ খেওজা। এই দলে আরো একজন অর্থনীতিবিদ এবং প্রকৌশলী ছিলেন। সফররত কুয়েতি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে ২৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চিহ্নিত করে, যেখানে কুয়েত বিনিয়োগ করতে রাজি।[১৫] প্রকল্পগুলোর মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, সেচ প্রকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ প্রকল্প, গ্যাস উত্তোলন, গ্যাস লাইন নির্মাণ প্রকল্প, সার কারখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কুয়েতের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন এবং বিচার বিশ্লেষণ শেষে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলাদেশকে সহজশর্তে প্রথমেই ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার ঋণ দানের কথা বলা হয়। এই ঋণ ২৫ বছরের মধ্যে শোধ করার শর্ত থাকে। এই অর্থ বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং

---

[১২] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, নভেম্বর ১৩, ১৯৭৪।
[১৩] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, জানুয়ারি ৪, ১৯৭৫।
[১৪] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, জানুয়ারি ২৯, ১৯৭৫।
[১৫] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৭৫।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মধ্যে ছিল সিলেটের মনু নদীতে বহুমুখী বণ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।[১৬]

১৯৭৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিন সদস্যের কুয়েতি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসেন। দলের নেতা ফদ আব্দুর রহমান আল-মোজেল জানান প্রস্তাবিত জয়পুরহাট সিমেন্ট কারখানা ও চুনাপাথর প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাঁরা ঢাকায় আসেন। প্রতিনিধিদল জানান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুয়েত সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত।[১৭]

১৯৭৫ এর মার্চ মাসে কুয়েত উন্নয়ন তহবিলের জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল লতিফ আল-হামাদের নেতৃত্বে তিন সদস্যের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কুয়েতি অর্থনৈতিক মিশন ঢাকায় এসে পৌছায়। এই মিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরোর চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।[১৮] পূর্ব ঘোষিত দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, পল্লী বিদ্যুৎ এবং চট্টগ্রামের সার কারখানা নির্মাণে কুয়েত সরকারের সহযোগিতার বিষয়টি এ মাসেই চূড়ান্তরূপ লাভ করে। এই তিনটি প্রকল্পের ব্যয়ভার ধরা হয় প্রাথমিকভাবে ৩ কোটি ডলার যা কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে দিতে সম্মত হয়েছে।[১৯] চট্টগ্রাম সার কারখানার বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৫ লক্ষ টন ইউরিয়া সার। এই কারখানাটির নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ২৮৫ কোটি টাকা। মনু নদী প্রকল্প অনুযায়ী সিলেটের ৫৬ হাজার একর জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে ধারণা করা হয়। পক্ষান্তরে পল্লী বিদ্যুৎ সুবাদে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্প মোতাবেক ৩৯৬টি গভীর নলকূপ ও ২১৪৪টি লো-লিফট পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। আল হামাদ জানান এই দুইটি প্রকল্প ছাড়াও সবজি প্রসেসিং শিল্প, গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দানের বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ১৯৭৫ সালের মে মাসের দিকে বেসরকারি উদ্যোগে কুয়েতের একটি কোম্পানির সাথে চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশ থেকে দিয়াশলাই রফতানি শুরু হয়। এছাড়াও পাট, পাটজাত পণ্য, চা, হিমায়িত মাছ, সুতি বস্ত্র, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি রফতানির বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় থেকে কুয়েতে প্রচুর জনশক্তি রফতানিও শুরু হয়।

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রী ইউসুফ জসীম আল-হাজী বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি বাংলাদেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ইসলামি কেন্দ্র স্থাপনে কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেন। এছাড়া ঢাকা বায়তুল মোকাররম মসজিদের সংস্করণে কুয়েত সরকারের সাহায্য দানের কাথাও উল্লেখ করেন।[২০] এরপর ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচ বছর মেয়াদি একটি

---

[১৬] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৭৫।
[১৭] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, মার্চ ১, ১৯৭৫।
[১৮] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, মার্চ ১৮, ১৯৭৫।
[১৯] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, মার্চ ১৯, ১৯৭৫।
[২০] *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা মার্চ ২৩, ১৯৭৮।

চুক্তি স্বাক্ষর হয়। কুয়েতের আস-সালাম প্রাসাদে শিল্পমন্ত্রী জামাল উদ্দীন আহম্মদ এবং কুয়েতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল ওয়াহাব ইউসুফ আল-নাফিসি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে কুয়েতি সাহায্যের কথা এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।[২১]

১৯৮০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল-সাবাহ বাংলাদেশে এক রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন। এ সময় বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে বিমান চলাচল বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক ও পর্যটন মন্ত্রী কে.এম. ওবায়দুর রহমান এবং কুয়েতের অর্থমন্ত্রী আব্দুর রহমান আল-আতিবী নিজ নিজ সরকারের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে ১৭ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার ঘোষণাও দেয়।[২২]

১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে কুয়েত ইসলামি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট শেখ আহম্মদ আল-ইয়াসিন এবং কুয়েত গণকমিটির সাহায্য ও মঞ্জুরি শাখার কোষাধ্যক্ষ শেখ ইউসুফ আল-ফুল ঢাকা সফরে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর শামসুল হকের সাথে দেখা করেন। এই দলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ৬০০ ছাত্র থাকতে পারে এমনি একটি হল নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখে।[২৩] পরবর্তী দুই বছরের মধ্যেই কুয়েতের আর্থিক সহযোগিতায় "কুয়েত মৈত্রী হল" এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কুয়েত সফর করেন। এ সময়ে কুয়েতের সাথে বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে ৯০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দানের ঘোষণা দেয়। এই অর্থ যমুনা সেতু নির্মাণ, ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, রূপসা সেতু নির্মাণ, ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করার কথা থাকে।[২৪]

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে কুয়েতের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ সাদ আল-আব্দুল্লাহ আল-সালেম আল-সাবাহ এক রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় এসে পৌঁছেন। সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন কেবিনেট বিষয়ক মন্ত্রী, তেল, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।[২৫] এ সময়ে কুয়েতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রাধান্য পায় কুয়েতে আরো বেশি করে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি। এছাড়াও উক্ত সফরে বাংলাদেশ ও কুয়েত অর্থনীতি, বাণিজ্য ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের একটি যৌথ কমিশন ও দুটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়।

---

[২১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, জুন ৪, ১৯৭৯।
[২২] *দৈনিক দেশ*, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১১-১৩, ১৯৮০।
[২৩] *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, অক্টোবর ৩১, ১৯৮৫।
[২৪] *দৈনিক বাংলার বাণী*, ঢাকা, জুলাই ২৪, ১৯৯৩।
[২৫] *দৈনিক খবর*, ঢাকা, এপ্রিল ১২, ১৯৯৫।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপসাগরীয় দেশগুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলো বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী দেশ কুয়েত বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কতখানি সহযোগিতা দিয়েছিল তা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে কুয়েত যতখানি তৎপর ছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুসলিম অধ্যুষিত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো জায়গা করে নিতে পারেনি কুয়েতের কাছে। তাছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ যা কি না তখন সারা বিশ্বের কাছে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামেই অধিক পরিচিত ছিল। সে দেশে বেশি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি নিতে চায়নি কুয়েত। অর্থাৎ বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাবিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সুবিধা বাংলাদেশ কুয়েতের কাছ থেকে পায়নি। যা পেয়েছিল অন্যান্য অমুসলিম দেশের কাছ থেকে। এ তথ্যের প্রমাণ মেলে সারণিসমূহে।

সারণি ১

বাংলাদেশ থেকে চা রফতানি

ম্যাট্রিক টন

দেশ	১৯৯৫ -১৯৯৬		১৯৯৬ -১৯৯৭		১৯৯৭ -১৯৯৮		১৯৯৮ -১৯৯৯		১৯৯৯ -২০০০	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
কুয়েত	---	---	১৮	১৯৪৯	৯	১২১৯	৪৩.	৩৭৩১	---	---
কাতার	৪১	২২৭৮	---	---	---	---	---	---	---	---
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৬০	১৪২০৭	১৫৯	১০৭২৯	৬২৭	৫৭৬০০	১০১৩	৩৭২৮৩	৫৩৮	৪৪৪১৭
বাহরাইন	৬	৮৬১	---	---	---	---	---	---	---	---
যুক্তরাষ্ট্র	৮৬	৭০১৪	২৩৯	১৬০৮৬	২৬৪	২৩৩৭৬	৫৮	৫৬৩০৯	৭১	৪৬৫৬
যুক্তরাজ্য	২২	১১৫৬	২৬১	১৬৭৮৬	৬৬৪	৫০৫২১	৭২৬	৬৩৭৯৬	৫১০	৩৩৩০৮
পোল্যাণ্ড	৫১০৯২৫	৫৯৭৯৯১	৬১৩২	৩৮৮৫৭৭	৮২৭৪	৬৪০১৩৭	৫৩৭৭	৪৭১৯২৯	১৬২৬	৯১৩৪৭

সূত্র: *Monthly Statistical Bulletin*, Bangladesh, January 2002, p. 347.

সারণি ১ থেকে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত কুয়েতের তুলনায় অনেক বেশি চা রফতানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং পোল্যান্ডে। সারণি ২ থেকে লক্ষ করা যায় ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছরে উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানি করা হয় কুয়েতে মাত্র ১৯ মেট্রিক টন। পক্ষান্তরে হংকং-এ রফতানি হয়েছে ১৭১ মেট্রিক টন। জাপানে ১০৩৮৮ মেট্রিক টন, শ্রীলংকায় ৮৮৫১ মেট্রিক টন এবং নিউজিল্যান্ডে ১৮৮৬ মেট্রিক টন। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে কুয়েতে কোন বুনন সামগ্রী রফতানি হয়নি। তবে অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতারে কিছু রফতানি হয়। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মান, যুক্তরাজ্য ও জাপানে উল্লেখ্যযোগ্য টাকার বুনন সামগ্রী রফতানি করা হয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশকে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছে Ministry of Finance-GI Flow of External Resources থেকে জানা যায় সেখানে একাদশতম স্থানে আছে সৌদি আরব। কুয়েত বা উপসাগরীয় অন্য কোনো রাষ্ট্রের এই তালিকায় উল্লেখমাত্র নেই।[২৬] অথচ অমুসলিম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে ৩১৬৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাপান দিয়েছে ৪৯৩৬.০ মিলিয়ন ডলার এবং কানাডা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ

---

[২৬] আবুল কাশেম হায়দার, *এশিয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা: প্যানোরমা পাবলিকেশন, ২০০১) পৃ. ২১৩।

১৭৭৭২.৭ মিলিয়ন ডলার। পক্ষান্তরে Statistical Year Book 2000 GI Commitment and Disbursement of Foreign Economic Assistance To Bangladesh-এ দেখা যায় ২০০০ সাল পর্যন্ত কুয়েত বাংলাদেশকে মাত্র ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেয় যেখানে ঐ সময়ের মধ্যে এডিবি দিয়েছে ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জাপান দিয়েছে ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৭] Monthly Bangladesh Bank Bulletin February 2002 থেকে লক্ষ করা যায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে কুয়েত থেকে রফতানি আয় হয়েছে মাত্র ১৬৯৭৭ টাকা। অপরপক্ষে কুয়েত থেকে আমদানি ব্যয় হয়েছে ৩২,৩৪,৪৮৬ টাকা।[২৮] Monthly Bangladesh Bank Bulletin February 2002 থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বছরে কুয়েতে চা রফতানি করা হয় ১৯৪৯ টাকার। পক্ষান্তরে উল্লিখিত অর্থ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা রফতানি করা হয় ৪৬৫৬ টাকার, যুক্তরাজ্যে ৩৩,৩০৮ টাকার এবং পোল্যান্ডে ৯১৩৪৭ টাকার। ৩ নং সারণিতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের আমদানি ও রফতানির বৈষম্য দেখানো হয়েছে। একটি বছরের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় কুয়েত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক বৈষম্য কতটা প্রকট।

সারণি ২

বাংলাদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্য রফতানি (১৯৯৭-৯৮)

ম্যাট্রিক টন

দেশ	হোশিয়ারি	চট	কার্পেটজাত দ্রব্য	কার্পেট	অন্যান্য	মোট
বাহরাইন	---	১৬	---	---	---	১৬
কাতার	৫৮	---	---	---	---	৫৮
কুয়েত	---	১৯	---	---	---	১৯
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৩৮৫১	২৪৭	---	---	২৬	১৪১২৪
হংকং	১২০	৫১	---	---	---	১৭১
জাপান	১৭৭৪	৪২৫১	৩১৩০	---	১২৩৩	১০৩৮৮
শ্রীলঙ্কা	১৫১	৮৬০৭	---	২	৯১	৮৮৫১
নিউজিল্যান্ড	২২৬	১৭৪	১১৯৫	২৫৮	৩৩	১৮৮৬

উৎস: *Statistical Year 2000 of Bangladesh*, Bangladesh Bureau of Statistics, p. 330.

সারণি ৩

আমদানি-রফতানির বৈষম্য (১৯৯৯-২০০০)

টাকা

বছর	দেশ	রফতানি	আমদানি	বৈষম্য
১৯৯৯-২০০০	কুয়েত	১৬৯৭৭	৩২৩৪৪৮৬	৩২১৭৫০৯
	কাতার	১৬৯৮০	২৬১৮৬৭	২৪৪৮৮৭
	বাহরাইন	১৫৭৪৪	৩৪৯০০	১৯১৫৬
	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৭০৫৪৩৭	৩০৬৮৮০৭৫	২৩৬২৬৩৮

উৎস: *Monthly Bangladesh Bank Bulletin*, February 2002, pp. 104, 108. অনুযায়ী গাণিতিক সমাধান করে বের করা হয়েছে।

---

[২৭] *Statistical Year Book 2000,* 21st Edition, Bangladesh Bureau of Statistics, p. 380.

[২৮] Monthly Bangladesh Bank Bulletin February, 2002. pp. 104, 108.

অতএব সারণিসমূহ পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে কুয়েত বাংলাদেশকে যতখানি সহযোগিতা দিতে পারতো কিংবা কুয়েতের কাছে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ছিল যতখানি, প্রাপ্তি ঘটেছে তার অনেক কম। এর কারণ হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, কূটনৈতিক তৎপরতা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে শিথিলতা ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কুয়েতের সাথে বাংলাদেশের আমদানি রফতানির ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। তাই বাণিজ্য ঘাটতি কমাবার জন্য পূর্বের তালিকাভুক্ত পণ্যের সাথে নতুন নতুন পণ্য রফতানির উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন: পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু সেটা ইউরোপ এবং আমেরিকা কেন্দ্রিক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যেমন সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাতে পোশাক রফতানির বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও রয়েছে মৌসুমি তাজা ফল-মূল, মাশরুম, ফুল, বনসাই, ঔষধ প্রভৃতি পণ্য রফতানির সম্ভাবনা।

জনশক্তি রফতানির সমস্যা

একমাত্র জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-কুয়েত সম্পর্ক কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছেছে বলা যায়। কিন্তু সেখানেও রয়েছে কিছু সমস্যা। বিপুল সংখ্যক পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি চাহিদার ভিত্তিতে ১৯৮০ সালের পর থেকে কিছু সংখ্যক 'খাদ্দামা' অর্থাৎ গৃহপরিচারিকা পাঠানো শুরু হয় কুয়েত সহ অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে। হঠাৎ পাওয়া সম্পদের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উপসাগরীয় ধনী মানুষেরা তাদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার-আচারণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ত্যাগ করেছে। তৈল সম্পদের কারণে তারা অবিশ্বাস্য রকম প্রাচুর্য পেয়েছে। কিন্তু প্রাচুর্য তাদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং ওহাবী আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে।[২৯] আমির, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যুবরাজ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য এবং শেখদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে অসংখ্য পত্নী, উপপত্নী, রক্ষিতা এবং দাসী।[৩০] প্রত্যেকটি পরিবারে আছে একাধিক গৃহপরিচারিকা। অধিকাংশ গৃহপরিচারিকা আমদানি করা হয় ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব গৃহপরিচারিকা পরিবারের সদস্যদের অমানবিক অত্যাচার ভোগ করে এবং গৃহকর্তা বা গৃহের পুরুষ সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।[৩১] নব্বইয়ের দশকে কুয়েতি মনিবদের গৃহপরিচারিকাদের উপর অত্যাচার এতটাই চরমে উঠেছিল যে, পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় বইতে

---

[২৯] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ২য় খণ্ড, পৃ.২২৮।

[৩০] Akhter Jahan Dulary, "Political Development and Pattern of Socio-economic Changes in the Gulf States" (Unpublished M.A Thesis, Dept. of Islamaic History & Culture, Rajshahi University, 2000), p. 97.

[৩১] *দৈনিক বাংলার বাণী*, ঢাকা, জুলাই ৫, ১৯৯২।

থাকে। ১৯৯২ সালে কুয়েত সরকার বাধ্য হয় ১১৮ জন নির্যাতিত ফিলিপিনো গৃহ পরিচারিকাকে দেশে ফেরত পাঠাতে।[৩২]

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে কিছু সংখ্যক ভারতীয় পরিচারিকাকে বিমান ভাড়া দিয়ে দেশে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল কুয়েত সরকার। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে কুয়েতে কর্মরত শত শত এশীয় গৃহপরিচারিকা নিজ নিজ দূতাবাসের কাছে অভিযোগ করে এবং আশ্রয় নেয়। উপসাগরীয় প্রতিটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমনি অভিযোগ থাকলেও গৃহপরিচারিকাদের প্রতি অমানবিক আচরণের ক্ষেত্রে কুয়েতের স্থান শীর্ষে।[৩৩]

বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে এমনি অনেক ঘটনা। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণে সেসব ঘটনা খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় এবং উদ্ভূত নানা জটিলতার কারণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সাল নাগাদ মহিলা কর্মীদের মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরিতে নিয়োগ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।[৩৪] দীর্ঘ পাঁচ বছর নারী শ্রমিক রফতানি বন্ধ থাকার পর ক্রমাগত চাহিদার ভিত্তিতে ২০০৩-এর ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার কিছু শর্ত সাপেক্ষে স্বল্প সংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সিকে পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যে নারী কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেয় এবং ২০০৪ এর জানুয়ারি মাস থেকে আরব দেশগুলোতে মহিলা শ্রমিক পাঠানো শুরু হয়।[৩৫] সম্প্রতি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় সৌদি আরব, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে লক্ষাধিক এবং কাতার ও বাহরাইনে প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশী মহিলা কর্মীর চাহিদা রয়েছে। তাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নারী শ্রমিক রফতানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান না হলে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ থেকে।

বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্ভাবনা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে রফতানি আয় ছিল মাত্র ৩৩৭ মার্কিন ডলার। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৭৮৫ মার্কিন ডলারে পৌছায়।[৩৬] তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত রফতানি পণ্য হিসেবে শীর্ষ তালিকায় রয়েছে চা, পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং কাঁচা চামড়া ইত্যাদি। পরবর্তীতে হিমায়িত খাদ্য, ফল-মূল, পোশাক ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান মুক্ত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ঘাটতি কমাবার জন্য রফতানি তালিকায় নতুন পণ্য সংযোজন করে আমদানি ব্যয় মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

---

[৩২] *দৈনিক বাংলার বাণী*, ঢাকা, জুলাই ৫, ১৯৯২।
[৩৩] *দৈনিক খবর*, ঢাকা, মার্চ ২৮, ১৯৯৬।
[৩৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, জুলাই ৯, ২০০৪।
[৩৫] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, জুলাই ৯, ২০০৪।
[৩৬] আবুল কাশেম হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প পোশাক শিল্প। রফতানি আয়ের প্রায় আশি শতাংশ আসে এই শিল্প থেকে। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারিভাবে আরবদেশগুলোতে পোশাক রফতানির কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করা হয়নি। কুয়েতসহ অন্যান্য আরবদেশগুলো পোশাক বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতিক সময়ে কুয়েতে ফল-মূল ও শাক-সবজি রফতানির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেখানে মাশরুম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ সম্প্রতি ফুল রফতানি শুরু করেছে। কুয়েতসহ উপসাগরীয় অঞ্চলে ফুল রফতানির মাধ্যমে প্রচুর পেট্র ডলার আয়ের সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বনসাই বর্তমানে একটি বিশেষ শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। ফুলের সাথে বনসাইও রফতানি হতে পারে। উপসাগরীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রে বোতলজাত পানির ব্যবহার বেশি। ফলে বোতলজাত পানি রফতানির বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। বাংলাদেশী ঔষধের চাহিদা রয়েছে বিভিন্ন দেশে। কুয়েতের সাথে ঔষধ রফতানির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবার আগে এগিয়ে এসেছে কুয়েত। আরব দেশসমূহের মধ্যে সবার আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ইরাক এবং তার পরই উপসাগরীয় রাষ্ট্র কুয়েত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। 'আরব দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতির কুয়েতি তহবিল' (Kuwait Fund for Arab Economic Development) হতে কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। বাংলাদেশ একমাত্র অনারব দেশ, যে উক্ত তহবিল হতে উপকৃত হয়। এতৎসত্ত্বেও কুয়েতের সহযোগিতা—বাংলাদেশের চাহিদা এবং প্রত্যাশার কাছে পৌছাতে পারেনি। কুয়েত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের তিন দশক পার হলেও রয়েছে প্রকট বাণিজ্যিক ঘাটতি। আমদানি, রফতানির ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। তথাপি পোশাক, ঔষধ, ফুল, মৌসুমি ফল, তাজা শাক-সবজি, মিনারেল ওয়াটার, শ্রমশক্তি ইত্যাদি রফতানির ক্ষেত্রে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই বাংলাদেশকেও বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য, সহযোগিতা ও ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। কুয়েতি দিনার বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রাগুলোর অন্যতম। এক কুয়েতি দিনার সমান বাংলাদেশের প্রায় ১৮০ টাকা। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুয়েতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা এবং 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাই পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মুক্ত আলোচনা এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কুয়েত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক পৌছাতে পারে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

মুসলিম নারী সমাজে 'পর্দাপ্রথা' এবং বাংলাদশের সমাজবাস্তবতা : একটি ভূ-রাজনীতিক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আলা উদ্দিন*

Abstract: The central premise of this paper is that, although purdah is practiced to greater and lesser degrees in many of the Islamic countries, Islam did not invent it. It is also obvious that purdah does not automatically imply women's oppression or lack of agency. The role of purdah in any culture has become more controversial since the rise of the women's movement. Either way the practice of purdah is looked at, whether in a negative or positive light, it stills remains an integral part of everyday life for some peoples and marks a part of their culture. The present paper is an endeavor aiming to unveil the geo-political history of purdah that veiled it inevitably with Islam.

ভূমিকা

পর্দা, নারী ও ইসলাম ঐতিহাসিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত প্রপঞ্চ, যার অনেকটা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত। আলোচ্য পর্দা ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক বিধি ইত্যাদি দ্বারা নারীর ওপর আরোপিত একটি বিষয়। পর্দাকে একভাবে পশ্চাৎপদতা, রক্ষণশীলতা ও দমনমূলক বিধি হিসেবে ধারণা করা হয় এবং সেই হিসেবে একে নারীর অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়; অন্যদিকে আবার ভাবা হয় যে, পর্দা নারীকে কিছু নির্যাতন (যেমন, বখাটেদের উৎপীড়ন) থেকে মুক্ত করে। অর্থাৎ, একে ঘিরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকা সমাজে ক্রিয়াশীল। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম নারী সমাজের পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার নানাবিধ দিক, নানা রকমের ধারণা, যেমন ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, এবং একে ঘিরে সৃষ্ট ঐতিহাসিক 'আবরণ' তথা এর ভূ-রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করবার প্রয়াস থাকবে; যা কার্যত বিশ্বায়নের প্রভাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও বিশেষ করে ইসলামের অবমাননাকর পরিবেশনার ওপর নির্মিত। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যদিও সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন বর্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত বেশি তথাপি

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

এটি নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, ইসলাম পর্দাপ্রথার সূচনা করেনি। প্রবন্ধটি পর্দার ভূ-রাজনীতিক ইতিহাস উন্মোচনের একটি প্রচেষ্টা যা পর্দাকে ইসলামের সাথে অনিবার্যরূপে বিজড়িত করেছে।

সাধারণভাবে পর্দা বলতে কোনো অপরিচিতের নিকট হতে নারীকে বিশেষ আবরণের মাধ্যমে পৃথক করার ব্যবস্থাকে বুঝায়। আর একটু বাড়িয়ে বললে, পর্দা নারীকে শারীরিকভাবে পুরুষ বা বাইরের বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[১] এটি মূলত লিঙ্গীয়ভাবে বিচ্ছিন্নতাকরণ প্রক্রিয়া। চাদর, মাথাবরণী, হিজাব, বোরখা ইত্যাদি বস্তুত পর্দা হিসেবে পরিগণিত ও ব্যবহৃত। এগুলোর সবগুলোরই ব্যবহারবিধির ওপর ভিত্তি করে সময় ও স্থানের পরিসরে স্থানীয় বিশেষ অর্থ রয়েছে। এবং এগুলোর ব্যবহারের কারণ ও ফলাফলের দৃশ্যমানতার আড়ালে এর ভিন্ন ইতিহাস ও কার্যকারণ লুকায়িত থাকে। সমকালীন বৈশ্বিক বাস্তবতায় এর প্রতীকী অর্থ ও অন্তর্নিহিত মর্মার্থ নিহিত রয়েছে স্থানিকতায়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিমালায় পর্দা নারীর দমিত ও পরাজিত বাস্তবতাকে নির্দেশ প্রদান করে। এটি একই সাথে পুরুষের মর্যাদা ও সম্মানের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও সম্মানকে পুরুষাধীনরূপে প্রতিভাত করে। তবে ঐতিহাসিকভাবে পর্দাকে সর্বদা নারী জাতির অবদমনের পরিচয় বহনকারীরূপে বিবেচনা করতে দেখা যায় না। কালক্রমে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডে এর প্রতীকীকরণে ক্রিয়াশীল থাকে বৈশ্বিক রাজনীতি, এবং প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্যের মনোগত চিন্তাভাবনা।

মাথা থেকে পা অবধি বিশেষ পোশাকে আচ্ছাদিত থেকে পুরুষ-বলয় থেকে নারীর দূরত্ব রক্ষা করা পর্দাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এটি এমন-কী নিজ ঘরের মধ্যেও অনুশীলিত হয়। পর্দা ও মুসলিম নারীকে সাধারণত এক করে দেখা হলেও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিম নারীসহ অপরাপর কিছু ধর্মাবলম্বী নারীর মাঝে এই অনুশীলন লক্ষণীয়। পর্দা দেশ ও কালের বিভিন্নতায় নারীর ওপর আরোপিত। এই প্রথা বিশেষ শ্রেণীর নারীর জন্যে যেমনি করে দমনমূলক; তেমনি আবার এটি বিশেষ বিবেচনায় সম্মানের প্রতীকও বটে।[২] প্রাচীন ব্যাবিলন সভ্যতায়ও এর প্রচলন লক্ষ করা গেছে। তখন কোনো নারীর পক্ষে পর্দায় আচ্ছাদিত না হয়ে এবং একজন ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়ের সঙ্গ-বিহীন বাহিরপানে পদচারণ করাও বারণ ছিল।[৩] এমন কি ঘরবাড়ির বিভিন্ন অংশকে নারী-পুরুষের পৃথক্করণের আদলে আলাদা করে তৈরি করা হতো। সমাজ ও সংস্কৃতির ভিন্নতায় ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক ভূমিকায় এটি আজ অবধি সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে; শুধু তাই নয় একে ঘিরে ক্রিয়াশীল রয়েছে সদা পরিবর্তনশীল

---

[১] Shanti Rozario, *Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village* (Asian Studies Association of Australia, Women in Asia Publication Series, Zed, London, 1992), pp. 88-94.

[২] U. K. Rowzatur Romman, "Purdah and Women's Emancipation," Paper presented in the Residential Training Workshop on 'Women, Purdah and Diversity' (Organized by FOWSIA, Dhaka, 2003), p. 3.

[৩] Caitlin Killian, "The Other Side of the Veil North African Women in France Respond to the Headscraf Affair," *Gender & Society* (17: 4, 2003), pp. 567-590.

রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ।[৪] এই প্রবন্ধটির প্রথম দিকে পর্দাপ্রথার আবৃত ইতিহাসের উন্মোচন ঘটানো হয়েছে, এরপর পর্দাকে কেন্দ্র করে পূর্বসমাজ সম্পর্কে পশ্চিমের যে মনগড়া প্রকল্প তার ভূ-রাজনীতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারপর মুসলিম নারীর পরিচিতির ক্ষেত্রে পর্দার যে ভূমিকা এবং এ সম্পর্কে নারীবাদীদের মনোভাব কী তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নারীর জীবনে পর্দার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকাও এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। পর্দাপ্রথার সাথে নারীমুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় পর্দার অনুশীলন, এর প্রভাব ও ভূমিকা পর্যালোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

পর্দাপ্রথা ও ধর্ম : আচ্ছাদিত ইতিহাসের অনাবৃতকরণ

নারীর পর্দা পরিধান স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ঘটনা নয়। এর পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিমালা, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি। পছন্দ এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত এবং এগুলো ধর্মীয় যৌক্তিকতা থেকে বহুযোজন দূরে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে পর্দা পরিচিতির ক্ষেত্রে উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করে, যেখানে একে ঘিরে রয়েছে নানা বিশ্বাস, সংস্কার, ও বিদ্যমান মতাদর্শ। এবং এটি বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতাবাদমুখী এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। সেজন্যে বলা হয়ে থাকে যে, "পর্দা প্রতিক্রিয়া" ("Purdah reaction") এখন ভয়ানকভাবে "মুসলিম প্রতিক্রিয়া"("Muslim reaction")-র সমার্থক।[৫] ঐতিহাসিকভাবে পর্দাপ্রথার উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইসলামকে ঘিরে বিশ্ববাজারে একটি "ভুলধারণা" ('misconception') বিদ্যমান। এটি একই সাথে ইসলামকে একটি বৈষম্যমূলক ও দমনমূলক ধর্ম বলে ধারণার সূত্রপাতও ঘটায়, যা আদতে ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। কারণ, ইসলাম বা কোরআনে নারীকে পর্দাবরণে আবৃতকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো বিধান আছে কিনা এই প্রসঙ্গে সঠিক কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া কঠিন। অবশ্য কোনো কোনো মুসলিম চিন্তকের বক্তব্য হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসে হজরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের জন্যে[৬] এবং মুসলিম নারীর জন্যে পর্দা করার উল্লেখ রয়েছে।[৭] যেমন

---

[৪] Lila Abu-Lughod, "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others" (American Anthropologist 104, No. 3, September, 2002), pp. 783-790.

[৫] For details, Faustina Pereira, "Purdah and Diversity: In Quest of the Rainbow of Multi-Religious Dialogue," Paper presented in the Residential Training Workshop on "Women, Purdah and Diversity" organized by FOWSIA, Dhaka, 2003), pp. 1-5.

[৬] N. Keddie, "Introduction," *Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender,* edited by N. Keddie and B. Baron (Yale University Press, 1991).("In the Quran, seclusion is suggested for Muhammad's wives and these stricter rules later spread from the elite, encouraged by the example of conquered peoples, to the urban upper and middle classes. Centralization and class differentiation in Muslim societies enhanced the role of seclusion and veiling as markers of status. 'Full veiling has been both a class phenomenon and an urban one'". "...Whereas upper class women wore facial veils, working, rural and tribal women did not").

কোরআনে উল্লেখ রয়েছে (সুরা ২৪:৩১): No (to) display their beauty and adornments", but rather to "draw their head cover over their bosoms and not display their ornaments.[৮]

কোরআন ও হাদিসের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মুসলিম চিন্তকগণ বাহির পরিসরে নারীকে আবৃত থাকার পক্ষে মত দেন। নারীকে পর্দা করতে বলা হলেও এর ব্যবহার বিধিতে নানা নিয়ম-কানুন ও মাত্রা রয়েছে। যেমন, নারীকে কতটুকু পর্দা করতে হবে, অর্থাৎ শরীরের কতকটা অংশ ঢাকতে হবে (পুরো শরীর, নাকি কেবলমাত্র হাত ও মুখ ব্যতীত বাকি অংশ), এটি নির্ভর করছে কার সামনে নারী উপস্থিত হবে তার ওপর।[৯] অবশ্য এখানে যে বিষয়টিকে একদম উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তা হলো সমাজের সকল নারীর জন্যে পর্দার মাত্রা একই নিয়ম অনুসৃত হয় না। কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে পর্দা নারীর জন্যে এ-জন্যে জরুরি যে, এটি কেবলমাত্র নারীকে পুরুষের নিকট থেকে শারীরিকভাবে/দৃশ্যত পৃথকই করে না, অধিকন্তু, এটি নারীর প্রতি পুরুষের যৌনপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের জন্যে সহায়কও বটে।[১০] অবশ্য পুরুষের জন্যেও নারী থেকে বেশ কিছুটা শিথিলজনকভাবে বুক, হাঁটু ইত্যাদি ঢেকে রাখবার বিধানও সামাজিকভাবে প্রচলিত। অনাবৃত নারী, পুরুষের মনে যৌনাবেগ সৃষ্টি করে গোটা মুসলিম সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে পারে। তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিভাবে নারীর জন্যে পর্দা করার বিষয়টির ওপর মুসলিম সমাজে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।[১১]

পর্দার উদ্ভবের সাথে ইসলামকে এক করা ঐতিহাসিকভাবে ভুল।[১২] নারী পুরুষকে পোশাকের মাধ্যমে পৃথক রাখার ও নারীর ওপর পোশাকী নিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্য ইসলামের উন্মেষের চেয়েও পুরনো। পর্দা Judaeo-Christian সময়ের ঐতিহ্য। এই প্রসঙ্গে পল (Saint Paul) এর বক্তব্য হচ্ছে: "In a similar spirit the women should dress themselves modestly and prudently in attire that is becoming and adorned with braided hair and gold or pearls or expensive cloths".[১৩]

---

[৭] Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam* (London, Yale University Press, 1992).

[৮] Ibid, p. 24.

[৯] Nadine B. Weibel, *Par-dela le voile: Femmes D'Iislam en Europe* (Brussels, Belgium: Editions Compleve, 2000), p. 42.

[১০] Ibid, p. 48.

[১১] Ibid, p. 46.

[১২] Shanti Rozario, 1992, pp. 88. ("Although the institution of parda has been essentially associated with Islam, there is evidence that other religious groups, such as high caste Hindus in North India, also practised parda. [Nawal] El-Saadawi ... argues that the veil was also a product of Judaism long before Islam came into being").

[১৩] *The Holy Bible*, 1 Timothy chapter 2 verse 9 (Revised Berkeley version, The Gideons International: 1974 Edition).

নারীর অধস্তনতার কথা পল-এর বক্তেব্যে উপস্থিত। পুরুষের বরাবরে নারীর বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্নে পর্দাসহ নানাবিধ প্রতীকী পার্থক্য সে সময়েও সচরাচর পরিলক্ষিত হতো। তিনি বলেন, "Christ is the head of every man, and that the man is the women's head …but any woman who has her hair be cut; but if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then let her wear a veil".[১৪]

পর্দাপ্রথা ইহুদি যুগেও প্রচলিত ছিল। সে সময় পর্দা নারীর আত্মমর্যাদা ও সামাজিক সুদৃঢ় অবস্থানকে নির্দেশ করতো। প্রাচীন ইহুদি যুগে কোনো পতিতার পক্ষে পর্দা দ্বারা তাদের চুল ঢেকে রাখার নিয়ম বিধিসম্মত ছিলো না। কারণ, পর্দা ছিল সম্মান ও মহত্বের প্রতীক এবং কেবলমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নারীর জন্যেই এর বিধান ছিল। বহু খ্রিস্টান নারী এখনো চার্চে ধর্মক্রিয়া পালন করার সময় তাদের মাথা আবৃত রাখে। ক্যাথোলিক নান'রা তাদের ধর্মীয় আচার ও অনুশাসন অনুযায়ী তাদের মাথা কিংবা পুরো শরীর আবৃত করে রাখতো। প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীরাও পোষাকের ক্ষেত্রে (dress codes) ধর্মাচার মেনে চলে। তারা তাদের পোষাক, জীবনধারা ও আরাধনা সম্পর্কে সদা অবগত ও সচেতন থাকে। এই সম্প্রদায়ে নারী পর্দা পরিধান করে, যেখানে পুরুষগণের থাকে দাড়ি, এবং তারা টুপিবন্ধনী পরিধান করে।[১৫]

পর্দা এবং এর মাধ্যমে নারীদের বিচ্ছিন্নতাকরণ গ্রীক-রোমান বিশ্ব, ইসলাম-পূর্ব ইরান এবং ব্যাজাইন্টান সাম্রাজ্যেও প্রচলিত ছিল।[১৬] মুসলমানগণ প্রাথমিকভাবে পর্দাপ্রথাটি পায় বিভিন্ন সময়ে রাজ্য বিজয়ীদের দ্বারা। মুসলিমদেশে অ-মুসলিম নারী এবং খ্রিস্টান সমাজগুলোতে ভূমধ্যসাগরীয় নারীদের একই ভাবে পুরুষদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মুসলিম সমাজ এবং খৃষ্টান সমাজে সম্মান ও মর্যাদার কেন্দ্রে ছিল পুরুষদের অবস্থান, নারীগণের পবিত্রতা নিহিত ছিল পারিবারিক পরিসরের অন্তরালে।[১৭]

যদিও পর্দা কিছু সংখ্যক মুসলিমের নিকট সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, বিশুদ্ধতা, ও প্রমাণীকৃত পরিচয় বহনকারী প্রতীক রূপে পরিগণিত, তথাপি এটি একই সাথে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতারও প্রতীক (Kelly-Gadol 1979)।[১৮] পর্দা সাংস্কৃতিক পরিচিতির কোনো একক বা অনড় প্রতীক নয় কিংবা এটি কোনো বিশেষ সাংস্কৃতির স্থির অনুশীলন বা বিধান বা অনুশাসন হতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে পর্দা প্রাচীন গ্রিক-রোমানীয়, প্রাক-ইসলামিক ইরানীয়, এবং ব্যাজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের নিকট অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ মর্যাদার প্রতীক ছিল। বস্তুত, এ্যাসিরীয় (Assyrian) আইনি দলিল অনুযায়ী পর্দা খ্রিস্টপূর্ব তের শতক থেকে প্রচলিত, যা কেবলমাত্র মর্যাদাসীন

---

[১৪] Sanit Chrysostom, *Homilies on the Epistles of Paul to the Corinthians: Nicene and Post-Nicene of the Christian Church* (Philip Schaff, ed., T & T Clark, Edinburgh, 1989).

[15] Faustina Pereira, 2003, pp. 1-5.

[১৬] N. Keddie, 1991.

[১৭] Keddie, 1991: 3.

[১৮] Bloul A. Rachel, "Victims of Offenders? 'Other' Women in French Sexual Politics," Kathy Davis (eds.) *Embodied Practices: Feminist Perspectives on the Body* (London: Sage, 1997), pp. 93-109.

('respectable') নারীর জন্যে ব্যবহার্য ছিল, এবং নিষিদ্ধ ছিল পতিতাদের জন্যে।[১৯] সাফাবিড (Saffavid : 1501-1772), অটোমান (Ottoman : 1357-1924), এবং মোগল সাম্রাজ্য (1556-1857) পর্যন্ত শুধু নয়; উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে উনিশ শতক পর্যন্ত ধর্মীয় ভাবাবেগ বা অনুশাসন অপেক্ষা পর্দা পরিধান ছিল বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর পরিচায়ক। অর্থাৎ কিনা, পর্দা প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে উদ্ভূত নয়; বরং এটি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের বিষয় ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে পর্দা ইউরোপীয়দের বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। ইউরোপীয়দের মনযোগের এরূপ পরিবর্তন পর্দাপ্রথার অর্থকে ভিন্নমাত্রায় ধাবিত করে মারাত্মকভাবে।

উনিশ শতকের পূর্বে পশ্চিমসহ অপরাপর সমাজগুলোতে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত পর্দা (গ্রিক-রোমান বিশ্ব, ইসলাম-পূর্ব ইরান এবং ব্যাজানন্টাইন সাম্রাজ্যে, সাফাবিড, অটোমান, এবং মোঘল সাম্রাজ্য...) আর উপনিবেশিত মুসলিম দেশগুলোতে বা প্রাচ্যের দেশগুলোতে অনুশীলিত পর্দার তাৎপর্য রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন অর্থে বিবেচনা করা হয়। প্রাচ্যের দেশগুলোতে পর্দাকে দেখা হয় ধর্মান্ধতার প্রতীক হিসেবে অথচ পশ্চিমে এর অর্থ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, পর্দা ছিল বিশুদ্ধতার নিদর্শন। এটি ঔপনিবেশিক শাসনকে দৃঢ় করার নিমিত্তে রাজনৈতিকভাবে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রাচ্যের সমাজগুলোতে পশ্চাৎপদতার প্রমাণ বহনকারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এবং ঐ সকল পশ্চাৎপদ সমাজগুলোর উন্নয়নকল্পে তারা বিভিন্ন নীতিমালা ও বিধিবিধানের সংযোজন ঘটায় যা বাস্তবে ভিন্নতা তৈরি করে এবং তাদের শোষণ মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের নানারূপ লুণ্ঠন, অভিহরণ (plunder) এবং দখল ইত্যাদি প্রচার-প্রচারণায় প্রকাশ করা হয় যে, তারা অভিযানে নামে 'সভ্যকরণ কর্মসূচি'-কে উদ্দেশ্য করে; যেখানে নারীর সকল প্রকার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়[২০] এবং এর সাথে অনিবার্য করে তোলা হয় ধর্মীয় মতাদর্শকে।

ভূ-রাজনীতি ও পর্দা

নারী যখন থেকে তার অধিকার, তার ওপর পুরুষের অনধিকার চর্চার বিষয়ে সচেতন হতে শুরু করে, এবং স্থানে স্থানে নানাভাবে এর প্রতিবাদ করে তখন পর্দা বিষয়টি নিয়ে নানা মতামতের সূত্রপাত ঘটে[২১]। সাধারণভাবে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পর্দার চর্চা মুসলমানেদের থেকে কম দেখা যায়। বাংলাদেশসহ মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে এর হার তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে এটি আজ সর্বজনবিদিত যে, ঐতিহাসিকভাবে পর্দা কোনোভাবে

---

[১৯] Homa Hoodfar, "The Veil in their Minds and on Our Heads: The Persistence of Colonial Images of Muslim Women", *Resources for Feminist Research* (Vol. 22, 1989), pp. 5-17.

[২০] Dina Siddiqi, "Pardah, Stereotyping and Globalization," Paper presented in the Residential Training workshop on *Women, Purdah and Diversity* (Organized by FOWSIA, Dhaka, 2003).

[২১] For details see, Niloufer Gole "Islam in Public: New Visibilities and New Imaginaries," *Public Culture* (14: 1, 2002), p. 173-190.

আর ভূ-রাজনীতি (geopolitics) থেকে দূরের কোনো বিষয় নয়। একটু বিশেষ নজর দিলেই অনুধাবন করা যাবে যে, পর্দা বিষয়টিকে বৈশ্বিক ভাবনায় কেমন করে এককভাবে ইসলামের সাথে এক করে দেখা হচ্ছে; বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে; যেগুলোতে ইউরোপীয়দের শাসন একদা কার্যকর ছিল, যেমন বাংলাদেশ। এবং যেখানে স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে 'মুসলিম প্রশ্ন' ('Muslim question') আধিপত্যশীল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় নতুন মাত্রায় অভিনির্মিত (incursion) হয়েছে। বর্তমানে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর পশ্চিমা বিশ্বের নিকট একমাত্র ইসলাম অবশিষ্ট শত্রু হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় একে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করবার প্রয়াসে প্রাচ্যবাদী নানা কল্পকথার সৃষ্টি করা হয় এবং এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের কাছে একে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে।[২২] মৌলবাদী গোষ্ঠীর পরিচয়ে পর্দানশীল নারী একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পর্দা পোশাক অপেক্ষা গুরুত্ব পায় মৌলবাদী নারীর পরিচয় হিসেবে। পর্দা পরিণত হয় পশ্চিমাদের রাজনৈতিক মুখোশে। এবং তাদের ঐ চিন্তাভাবনার প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটে এমনকি প্রাচ্যের সমাজগুলোতেও। ফলে পর্দা আজ কেবলমাত্র আন্তর্জাতিকভাবেই নয় স্থানীয়ভাবেও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির প্রভাবে আলোচনা-সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে; পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক ইসুতে।[২৩] উপনিবেশিক থেকে নয়া-উপনিবেশিক (neo-colonial) বা উত্তর-উপনিবেশিক (post-colonial) যুগে একই কায়দায় পর্দা ভিন্নতায় পরিগণিত হয়েছে; ভিন্নতা প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের মধ্যকার।[২৪]

প্রাচ্য যেহেতু অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পশ্চাৎপদ তাই এখানে পর্দার প্রচলন রয়েছে, অন্যদিকে পশ্চিমে এর অস্তিত্ব নেই। কারণ পশ্চিম কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতির ধারক। এরূপ প্রাচ্যবাদী মনঃকল্পিত (subjective) চিন্তাশীল মতবাদ সময়ান্তরে, নারীর নিভৃতচারণ ও পর্দাকে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যগতভাবে ধীরে-ধীরে ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস সমাজে শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখে, কিন্তু মানবনির্মিত (পুরুষ) প্রথা কখনো কখনো নারীর প্রতি বিমাতাসুলভ বা বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে।[২৫] আধিপত্যশীল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে পর্দা মুসলিম নারীর অবদমনের প্রতীক, সেখানে রয়েছে এর দীর্ঘপ্রতিষ্ঠিত বংশসূত্র। এটি প্রতিনিয়ত পশ্চিমা জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যমগুলোতে প্রাচ্য ও ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা মতাদর্শের প্রচারণা করে থাকে। তাদের এরূপ প্রচার-প্রচারণা ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশনা, এবং রাজনৈতিক শক্তি ক্রমেই স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, একইভাবে পর্দা বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমসাময়িক মুসলিম গোষ্ঠী দ্বারা পুনরায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

---

[২২] Himani Bannerji, Shahrzad Mojab, and Judith Whitehead, *Of Property and Propriety: The Role of Gender and Class in Imperialism and Nationalism* (Toronto: University of Toronto Press, 2001).

[২৩] Lila Abu-Lughod, "Orientalism and Middle East Feminist Studioes," *Feminist Studies* (Spring 2001), pp. 243-69.

[২৪] Abu Lama Odeh, "Post-colonial feminism and the veil: Thinking the difference," *Feminist Review* (43, 1993), pp. 26-37.

[২৫] Ms. Radhika Coomeraswamy, "Violence Against Women, its Causes and Consequences," *Commission on Human Rights* (Fifty-Third Session, E/CN. 4/1997/47, February 12, 1997), p. 34.

করা হচ্ছে[২৬]। Hoodfar-এর মতে প্রতীক হিসেবে পর্দা মুসলিমদের জন্যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু নারী-পুরুষ পর্দাকে সাংস্কৃতিক পরিচয়, ধর্মীয় পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আবার কিছু সংখ্যক মুসলিম পর্দাকে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে মুসলিম সমাজে এর সংস্কারের পক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেন।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পর্দা এবং এঁকে ঘিরে বিদ্যমান স্থিরীকরণ (stereotyped) প্রসঙ্গে সামাজিকভাবে নির্মিত "নিজ" এবং "অন্য" (*'Self'* and *'Other'*) এর বিপরীত সম্পর্ক এবং প্রাধান্যপরম্পরা অবস্থান জানা জরুরি।[২৭]নারী এবং তার শরীর বিষয়ক বেশ কিছু দ্বৈত-বিপরীত (binary opposition) সম্পর্ক সমাজে বিদ্যমান আছে; যেমন, পূর্ব : পশ্চিম, ঐতিহ্য : আধুনিকতা, বর্বর : সভ্য (কু)সংস্কার : বিজ্ঞান, ধর্ম : সেকুলার, পশ্চাৎপদ : প্রগতি।

পর্দার আধিপত্যশীল (Hegemonic) ব্যাখ্যা ঊনিশ শতকে বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়। Hoodfar-এর মতে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচ্যের মুসলমান সম্পর্কে পশ্চিমের উপস্থাপনে একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।[২৮] তিনি বলেন, 'by the 19th century the focus of representation had changed from the male barbarian to the uncivilized ignorant male whose masculinity relies on the misintreatment of women'।[২৯]

প্রাচ্যবাদ (Orientalism) গ্রন্থে সাঈদ এবং অন্যান্যরা পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডে কিভাবে প্রাচ্যের মুসলিম নারীকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের পরিসরে বিবেচনা করা হয় তার সবিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৩০] পশ্চিম সেই সময়ে পর্দা এবং অন্তঃপুরবাসিনী নারীকুল (হারেমবাসী) সম্পর্কে মনঃকল্পিত/আত্মনিষ্ঠ (subjective) যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয় তা সমসাময়িক সকলেরই ভাবনাচিন্তার খোরাক হয়। এবং পর্দা, স্বাধীনতার বিপরীতে অবস্থান নেয়।[৩১] নারী হয়ে দাঁড়ায় পর্দা এবং হারেমের অন্তরালের নিষ্ক্রিয় শিকার, ও ধর্মীয় বেড়াজালে নিমজ্জিতরূপী। পর্দা এবং পরাধীনতা ক্রমে কিছু স্বাভাবিক দ্বি-বিভাজিত এবং বিপরীত সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে; যেমন, *মুসলিম : পশ্চিম, পরাধীন : স্বাধীন, আবৃত : অনাবৃত...*। এই প্রবল প্যারাডাইম/মডেল যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে তরুণ-নারীর পরিচয়কে এবং সামাজিক জীবন কিছু দ্বৈত-বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, *বাড়ি/স্কুল, ঐতিহ্য/পশ্চিম, ধার্মিক/সেকুলার,...*।[৩২] এই সকল বিপরীতসম্পর্ক তৈরি হয় প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্যের 'প্রাচ্যবাদী' (Orientalist), ও 'নেতিবাচক বাঁধাধরা' (negative stereotypes) চিন্তাপ্রসূত বিচার-বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে। প্রাচ্যবাদী

---

[২৬] Homa Hoodfar, 1989, p. 12.

[২৭] Dina Siddiqi, 2003.

[২৮] Homa Hoodfar, 1989.

[২৯] Ibid, p. 13.

[৩০] Edward Said, *Orientalism* (London: Routledge, 1978).

[৩১] Dina Siddiqi, 2003, p. 5.

[৩২] Homa Hoodfar, "Return to the Veil: Personal Strategy and Public Participation in Egypt," in Redclift, N. and Thea Sinclair, M. (eds), *Working Women: International Perspectives on Labour and Gender Ideology* (Routledge, London, 1991).

ডিসকোর্স পশ্চিমা সংস্কৃতির বিপরীতে দমনমূলক ও মৌলবাদী ধর্মের আদলে ইসলাম এবং তৎসম্পর্কিত মুসলিম নারীকে নির্মাণ করেছে।[৩৩]

নারীর পরিধানের বস্ত্র কী হবে সেটিও উপরিউক্ত দ্বি-বিভাজিত ও বিপরীত সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্কুল ইউনিফর্ম/স্যালোয়ার-কামিজ; নারীর জন্যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পোশাক দমিত ও প্রশমিত আচরণের নির্দেশক।[৩৪] পোশাক এখানে চিহ্নকারীর (signifier) ভূমিকায় অবতীর্ণ, এবং এটি দৃশ্যমান পরিচিতি থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়।[৩৫] বিভিন্ন রকমের বিপরীত সম্পর্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় নারীগণ আমূলবাদ এবং লিঙ্গীয় ডিসকোর্সের মাধ্যমে পর্দা এবং একে ঘিরে বিদ্যমান সম্পর্ককে পুনরায় অধ্যয়ন করছেন। এবং তারা পর্দাকে ইসলামের জন্যে একটি প্রবল শক্তিধর চিহ্নকারী হিসেবে বিবেচনা করেন। ঐতিহাসিকভাবে বিরোধমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রতীক পর্দার গতিময়তা অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, পর্দা সচরাচর নারীজ যৌনতার (faminine sexuality) ওপর পুরুষাধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে বা বৈধতা দেয়। এই প্রসঙ্গে Ahmed জোর দেন আরব বিশ্বে পর্দার আনুষ্ঠানিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এর বিকাশের ওপর।[৩৬] তিনি আরও বলেন যে, উপনিবেশিক আধিপত্যে পর্দা চিহ্নকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যা শুধুমাত্র লিঙ্গের সামাজিক অর্থই প্রকাশ করে না, অধিকন্তু জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কৃতির নানা ইস্যুর নির্দেশনাও দেয়। এবং এভাবে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ড পর্দাকে ইসলামিক পশ্চাৎপদতা এবং আদিমত্বকে ধারণ করে। পশ্চিমা উপনিবেশিক শক্তি ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে নারী ও পর্দার সম্পর্ককে সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পর্কিত করে এর বিপরীতে দাঁড় করায় পশ্চিম এবং লোকজ/প্রমাণীকৃত মূল্যবোধকে।

উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক ইতিহাসে এই ডিসকোর্সসমূহ সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোতে নারী এবং পর্দা জাতির পরিচিতির ক্ষেত্রে বিরোধমূলক চিহ্নকারী হিসেবে প্রতিভাত হয়।[৩৭] এবং যা একইভাবে সৃষ্টি করে এশীয়/ ইংলিশ বৈপরীত্য।[৩৮] Ahmed-এর বক্তব্য হচ্ছে পর্দাকে দেখানো হচ্ছে একটি নারী যৌনতার প্রতি পুরুষত্বের নিয়ন্ত্রণকারী একটি ব্যবস্থা হিসেবে, আবার এর ভিন্ন ঐতিহাসিকতাও রয়েছে; সেখানে এর ঐতিহাসিক সক্রিয়তা বা গতিশীলতা

---

[৩৩] N. Kabeer, "The Quest for National Identity: Women, Islam and the State of Bangladesh," *Women, Islam and the State,* edited by D. Kandiyoti (Macmillan, London, 1991).

[৩৪] Deniz Kandiyoti, *Bargaining with patriarchy* (Gender & Society 2, 1988), pp. 274-90.

[৩৫] Deniz Kandiyoti, (Ed.), *Women, Islam & the State* (Philadelphia: Temple University Press, 1991).

[৩৬] Leila Ahmed, 1992.

[৩৭] Ibid, p. 12

[৩৮] Mervat Hatem, "Through Each Other's eyes: The Impact on the Colonial Encounter of the Images of Egyptian, Levantine-Egyptian, and European Women, 1862-1920," *Western Women and Imperialism: Complicity and Resistance* (In Nupur Chaudhuri, and Margaret Strobel, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1992), p. 35 – 60.

বিদ্যমান।[৩৯] তার অভিমত হচ্ছে এটি আরব বিশ্বে যে ঘটনাপ্রবাহে প্রতিষ্ঠা পায় তা হলো উপনিবেশিক কর্তৃত্ব। এর ফলে এটি লিঙ্গীয় সম্পর্ক অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র হিসেবে। এভাবে ইসলামী পশ্চাৎপদতা ও প্রাচীনতা বা আদিমতার প্রতীকরূপে বিবেচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছে এবং পশ্চিম বনাম স্থানিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে।[৪০]

পর্দা ও মুসলিম নারীর পরিচিতি

পর্দা প্রবলভাবে উপনিবেশিক ও প্রাচ্যবাদী পরিবেশনায় মুসলিম সমাজের প্রতিমার রূপ লাভ করেছে।[৪১] প্রাচ্যবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিসরে যখন পর্দাকে নিয়ে এরূপ ভাবনাচিন্তা করা হয়, একই সময়ে প্রাচ্যবাদী ভাবনার আড়ালে পর্দা জাগ্রত হয় উপনিবেশবিরোধী বিপ্লব এবং রাষ্ট্র/জাতির গঠনমূলক প্রকল্প হিসেবে।[৪২] তুরস্ক, যেখানে আধুনিকতা, সেক্যুলার/যুক্তিবাদ, এবং পশ্চিমীকরণ নতুন অটোমানোত্তর (post-Ottoman) রাষ্ট্রে জাতীয় ভাবধারার সাথে অঙ্গীভূত, সেখানে নারী নাগরিকগণ পর্দাকে পশ্চাৎপদতা এবং অসভ্যতার চর্চা বলে অভিযুক্ত করেন। তুর্কি বিপ্লবীদের দ্বারা ধর্মীয় গুরুরা পরাস্ত ও উৎখাত হয়েছেন।[৪৩] অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামি চিন্তক ও ধর্মীয় নেতা মনে করেন যে, উত্তম মুসলিম নারীদের পর্দা করা উচিত।[৪৪] মুসলিম সমাজগুলোতে পর্দাকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪৫] যা কিনা শালীন মুসলিম নারীর উচিত কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয়।[৪৬] পর্দা শালীন মুসলিম নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করে তা মোটামুটি: ১. ইসলামী বিশ্বাস ও মতবাদের ওপর অবনত মুসলিম নারীর প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন। ২. নারী ও পুরুষের মধ্যকার একটি সুস্পষ্ট বিভাজন। ৩. এটি একটি বিশেষ তাগিদ সৃষ্টি করে যে, মুসলিম নারীর জন্যে যথোপযুক্ত স্থান হচ্ছে ঘর, বাইরের কর্মক্ষেত্র নয়। এবং ৪. পশ্চিমের পার্থিব, ভোগবাদী ও অশোভন সাংস্কৃতিক প্রবাহ'র প্রতি ঘৃণাপোষণকারী ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারীর

---

[৩৯] Johnson, Steven, "Political activity of Muslims in America," *The Muslims of America,* edited by Y. Y. Haddad (Oxford. UK: Oxford University Press, 1991).

[৪০] Leila Ahmed, 1992.

[৪১] RobertYoung, *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race* (London, Routledge, 1994).

[৪২] Ahmed 1992, p. 130

[৪৩] Alvin J. Schmidt, *Veiled and silenced: How Culture Shaped Sexist Theology* (Macon, GA: Mercer University Press, 1989).

[৪৪] Al-Swailem Sheikh Abdullah Ahmed, "Introduction," *A Comparison Between Veiling and Unveiling,* (Halah bint Abdullah. Riyadh, Saudi Arabia: Dar-us-Salam, 1995).

[৪৫] Jen'nan Ghazal Read and John P. Bartkowski, "To veil or not to veil? A Case Study of Identity Negociation among Muslim Women in Austin. Texas," *Gender & Society* (14:3, 2000), pp. 1336-71.

[৪৬] Muhammad Iqbal Siddiqi, *Islam Forbids Free Mixing of Men and Women* (Lahore, Pakistan: Kazi, 1983).

প্রতিবাদী পরিচয়-চিহ্ন।[৪৭] চতুর্থ পরিচয়টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এশীয় ও মুসলিম নারীসমাজের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বিশিষ্ট করে তোলে।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পর্দাপ্রথার পক্ষ অবস্থান করে ধর্মীয় গুরুরা যুক্তি দেন যে, নারীর ওপর অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারকে এর মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।[৪৮] পর্দাপ্রথার পক্ষে অবস্থানকারী ডিসকোর্সগুলোতে নারী-পুরুষের জৈব আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে যে বৈষম্য অবস্থান রয়েছে এবং এর ফলে নারী যেখানে তার পুরুষ প্রতিপক্ষ দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেখানে পর্দাকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। পর্দা নারীকে পুরুষের কুদৃষ্টি, খারাপ মনোবৃত্তি, ও কামাবেগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ এভাবে নারীকে পুরুষের যৌন ব্যবস্থাপনার জন্যে দায়ী এমন কি পর্দার পক্ষাবলম্বী মুসলিম মনীষীগণ অ যৌনাচারের একটি ভিত্তি হিসেবেও বিবেচনা করেন।[৪৯] এভাবে, পর্দাকে মুসলমান নারীর জন্যে আবশ্যক হিসেবে আরোপণ করা হয়, যেখানে পুরুষের যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও চাপিয়ে দেওয়া হয় নারীর ওপর, এবং তা থেকে কেবল মুক্তিই নয়, অধিকন্তু, এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও স্বয়ং নারীর ওপর বর্তায়। আর এর সমাধানস্বরূপ নারীর ওপর আরোপিত হয় পর্দা। অর্থাৎ পর্দার মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে অনিবার্যরূপে বিভাজন করা হয়, নারীকে পুরুষদের নিকট থেকে পৃথক করা হয়; ঘরকে নারীর জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সেখানে অন্তরীণ করা হয়; বঞ্চিত করা হয় তাকে বাইরে কাজ করার অধিকার থেকে। শুধু তাই নয়, ভোগ্যপণ্যবাদী পশ্চিমা ভাবধারায় মুসলিম নারীকে তার জন্যে অপরিহার্য (!) পবিত্রতা রক্ষার্থে এই সকল বিধিমালা অনুসরণে বাধ্য করা হয়; অন্যথায় তাদের দূষিত, অশালীন, এবং ভোগের পণ্য ইত্যাদিরূপে বিবেচনা করা হয়। এভাবে পর্দা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সৃষ্ট অথচ প্রাচ্যবাদী চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতিক ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা লাভ করেছে ঐতিহাসিকভাবে।

ইতিহাসে পর্দার বহুবিধ ও পরিবর্তিত অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে একটি মিথ হলো এই যে, এটি অধিকাংশ 'মুসলিম' নারী দ্বারা পরিধান করা হয়। কিন্তু, বহু ইসলামিক দেশে নারীদেরকে শতাব্দী ধরে পর্দা পোশাকে আবৃত ও অনাবৃত দুই অবস্থাতেই কাজ করে যেতে লক্ষ করা যায়।[৫০] ধর্মীয় পরিচয় নারীর একমাত্র পরিচিতি নয়। একজন ইরানী নারীর পরিচয়ে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের মিশ্রণ থাকতে পারে (যেমন, ব্যালিচ, কুর্দ, পার্সিয়ান), জাতিত্বের ক্ষেত্রে মিশ্রণ রয়েছে (আমেরিকান, ইহুদি, আর্য); ধর্ম (বাহা'ই, খ্রিস্টান, ইসলাম); ভাষা (আরবি, ব্যালুচি, কুর্দি, পার্সিয়ান); সামাজিক শ্রেণী, নগর/গ্রাম পটভূমি, শিক্ষা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক ধারা, সংস্কৃতি ইত্যাদি। বিশ্বজনীনভাবে নারীকে পর্দার সাথে সম্পৃক্ত করতে যেয়ে ধর্মীয় পরিচয়কে (ইসলাম) প্রধান করে দেখার মাঝে নিহিত রয়েছে পশ্চিমাদের দ্বারা সৃষ্ট 'প্রাচ্যবাদী'

---

[৪৭] Al-Swailem Sheikh Abdullah Ahmed, 1995, pp. 27-29.

[৪৮] Muhammad Iqbal Siddiqi, 1983, pp. 140, 156.

[৪৯] Hanna Papanek, "Purdah: Separate Worlds and Symbolic Shelter," *Comparative Studies in Society and History* (15, 1973), pp. 289-325.

[৫০] Norma Moruzzi, "Veiled agents: feminine agency and masquerade in the Battle of Algiers," *Negotiating at the Margins: the Gendered Discourses of Power and Resistancey* (Sue Fisher & Kay Davis, 1993).

দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচ্যের রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি দিক তাদের মতো করে বিশ্লেষণ করে প্রতীচ্যে জ্ঞানীমহল প্রাচ্যের সমাজ জীবনকে প্রায়ই এক করে দেখেন এবং তাদের মতো করে কিছু গৎবাঁধা সমীকরণে এদের নিয়তিকে উপস্থাপন করেন। কিন্তু, আদতে এই স্থিরীকৃতকরণ প্রক্রিয়াটি মোটেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। খোদ পশ্চিমেও প্রাচ্য, প্রাচ্যের মানুষজন, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ-সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা বিদ্যমান। প্রতীচ্যে ধারণা যেন, প্রাচ্যের মুসলমান মানেই হলো ধর্মপ্রাণ, যারা বিনাপ্রশ্নে সকল ধর্মাচার মেনে চলে, অনেকটা ধর্মান্ধের মতো।[৫১]

বর্তমানে ইসলাম ও এ-সম্পর্কে নানাবিধ মতামতকে স্থানীয় ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক উপায়ে অধ্যয়নের প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। উদাহরণত, ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলিম নারীর পোশাকে রয়েছে বিশাল বৈচিত্র্য। এমনও অনেক রয়েছে যারা মুসলমান পরিচয়বাহী এমন কোনো পোশাক/আবরণ পরিধান করে না, যা তাদেরকে আলাদা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি দান করবে।[৫২] এমনও অনেকে রয়েছে যারা কিনা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান না করেও অন্য সাধারণ পোশাকে (লম্বা আস্তিনওয়ালা শার্ট, স্কার্ট যা পায়ের গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত পৌঁছে যায়) অত্যন্ত শালীনভাবে জীবনকর্ম সম্পন্ন করে (উত্তর আমেরিকার 'জেলাবা')। যারা পর্দা পরিধান করে তাদের অনেকে উজ্জ্বল রঙের ছোট/কিংবা লম্বা পোশাক পরিধান করে। তারা ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদীতে মাঝে মধ্যে চোখ ছাড়া পুরো মুখ ঢাকা পোশাক পরিধান করে থাকে। কোনো কোনো নারী পর্দাবৃত করে পশ্চিমা পোশাক পরিধান করে। এমনকি কখনো কখনো চুল পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়। ফরাসি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী মুসলিম নারীদের ইউরোপীয় নারীদের অনুকরণ করতে এবং পর্দা ত্যাগ করতে প্রেরণা দেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সে মুসলিম নারীদের স্কুলে মাথাবরণী নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়নি ইহুদিদের মাথার টুপি (skull cap), খ্রিস্টনদের ক্রস, এবং শিখদের পাগড়ি। কিছু এশিয়ান এমনকি মুসলিম দেশেও স্কার্ফ নিষিদ্ধ করা হয়। যেমন, সিঙ্গাপুরে ২০০২ সালে শিখদের পাগড়ির ব্যবহার যথারীতি চললেও নিষিদ্ধ হয়েছে মুসলমান মেয়েদের মাথার স্কার্ফ, তিউনিশিয়ায় ১৯৮১ সালে, তুরস্কে ১৯৯৭ সালে সরকারি চাকরি ও পাবলিক পরিসরে স্কার্ফ নিষিদ্ধ হয়। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বিভিন্ন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে হিজাব পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সে ২০০৪ সালে স্কার্ফের বিরুদ্ধে যে আইনটি হলো এটি সেক্যুলারের নামে ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে। ফলে বেশ কিছু নারী ইসলামী নীতিতে অটুট থেকে নিজেদের মাথার চুল যেন প্রদর্শিত হতে না পারে, সেজন্যে চুল কাটিয়ে ফেলে। কেউ কেউ আবার আসল চুল কেটে কৃত্রিম চুলের সংযোজনও করেছে। দুজন মেয়ে শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি (অক্টোবর, ২০০৪) স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যেহেতু তারা নতুন আইন অমান্য করে স্কুলে স্কার্ফ পরিধান

---

[৫১] Lama Abu Odeh, "Post-colonial Feminism and the Veil: Thinking the Difference, *Feminist Review* (43,1993), P. 26-37; Winifred Woodhull, "Unveiling Algeria," *Genders*, 10, 1991), pp. 110–131.

[৫২] Caitlin Killian, 2003, p. 577.

করেছে।[৫৩] এভাবে ফ্রান্সে সেক্যুলার নামে মেয়েদের মানসিক চাপ ও ভাবাবেগের সংকটের মধ্যে রাখা হচ্ছে। ফ্রান্স ও ব্রিটিশ উপনিবেশ মুসলিম নারীকে পর্দা পরিত্যাগ করতে এবং অন্যান্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করে ইউরোপীয় নারীদের সমকক্ষ হওয়ার জন্যে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।[৫৪] অর্থাৎ এভাবে করে পর্দাকে প্রতীচ্যের ভাবধারার আলোকে কী মুসলিম, কী অ-মুসলিম দেশে মুসলিমদের সাথে এক-করে তাদের পশ্চাৎপদ ও ধর্মান্ধ প্রতিপন্ন করছে; যা প্রকারান্তরে মুসলিমদের মাঝে ইসলামি জাতীয়তাবাদী চেতনার সূত্রপাত ঘটায়।[৫৫]

আলজেরিয়া ও অন্যান্য উত্তর-আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে পর্দা জাতীয় পরিচয়ের একটি প্রতীক এবং জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিমাবিরোধী চেতনা হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়। Helie- Lucas নির্দিষ্ট করে ফ্রান্সের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে, ওখানে যে সকল নারী পর্দা পরিধান করে থাকে তাদের পিতা, স্বামী এবং ভাইগণ যথারীতি জিন্স পরিধান করে থাকে এবং তারা নিত্য দাড়ি, গোঁফ শেভ করে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে পুরুষগণ মুসলমান পুরুষ হিসেবে পৃথক পরিচিতি থেকে বিরত থাকে। পর্দা প্রায়শ মুসলিম নারীর সমষ্টিক পরিচিত বহন করে থাকে।[৫৬] নারীই কেবল পরিণত হয় "guardians of identity and culture"। যে কোনো স্বাগতিক দেশে অভিবাসী নারীর উপস্থিতি দুভাবে প্রকাশ পায়, "barriers to assimilation" অথবা "vehicles of integration into dominant society"।[৫৭] Hoodfar কানাডার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, কানাডায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুসলমান নারীর পরিচিতির ক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব দৃশ্যমান হয়।[৫৮] বিপুল সংখ্যক মুসলিম নারী পর্দা পরিধান করে থাকে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয় বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে সম্প্রদায়গতভাবে পর্দাপ্রথা সেখানে প্রচলিত।

পর্দা প্রসঙ্গে নারীবাদী চিন্তাভাবনা

নারী ও পর্দার সম্পর্কটি সর্বজনীন কোনো বিষয় নয়, তাই এটি নারীর ইতিহাস বর্ণনা/রচনার মতোই সমস্যাজনক। নারীবাদীগণ এ-প্রশ্নে সকল সমাজের জন্যে সাধারণীকৃত কোনো মতপ্রকাশ অপেক্ষা বিশেষ সমাজ-সংস্কৃতির জন্যে বিশেষ সম্পর্ক নির্দেশ করতে আগ্রহী। পর্দা স্বয়ং মুসলিম নারীদের মাঝেও স্থান, কালের ভিন্নতায় বিভিন্নতা আনে। এ প্রসঙ্গে Kipling বলেন, "Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat; But there is neither East nor West,

---

[৫৩] *The Daily Star*, Dhaka, Bangladesh, October 2004.

[৫৪] Rachel A Bloul, 1997, pp. 93-109.

[৫৫] Rachel A Boul, 1997, p. 101.

[৫৬] Marie-Aimee Helie-Lucas, "The Preferential Symbol for Islamic Identity: Women in Muslim Personal Laws," *Identity Politics and Woman: Cultural Reassertions and Feminism in International Perspective,* edited by Valentine Moghadam (Boulder. Co: Westview, 1994).

[৫৭] Rema Hammami, "Women, the Hijab and the Intifada" *Middle East Report* (20: 164, May-August, 1990), pp. 24-8.

[৫৮] Homa Hoodfar, 1989.

Border, nor Breed, nor Birth, When two strong men stand face to face, tho' they come from the ends of the earth!"।[৫৯] বহু সেক্যুলার নারীবাদী, মুসলিম নারীবাদী এবং অপরাপর ধর্মের নারীবাদী চিন্তক পর্দাকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের "সুলতানার স্বপ্ন" (১৯০৫), "অবরোধ বাসিনী" (১৯২৮-১৯৩০) নারীর নিভৃতজীবন ও বন্দিত্বের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে। কল্পনা ও রসাত্মক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হলেও তাতে নারীর পর্দা, বন্দীজীবনের কথকতা ও নারীর স্বাধীনতাহীনতার প্রতিবাদেও নানাপ্রকাশ ও প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কিছু মুসলিম এবং পশ্চিমা নারীবাদীর মতে, কোরআনে পর্দার সত্যতা প্রতিপাদিত নয়।[৬০] Stowasser[৬১], ও Mernissi[৬২] পর্দার বিশেষ অর্থ অনুধাবন করে বলেছেন, পর্দা নারীর নির্জন জীবনের জন্যে দায়ী: 'the sum total of practices connected with the seclusion of women'| Mernissi-এর মতে পর্দায় আচ্ছাদিত নারী মানে 'আচ্ছাদিত প্রতিরোধ' ('veiling resistance')।[৬৩]

তবে সাম্প্রতিক কিছু কাজে পর্দাকে প্রতিরোধক্ষমরূপে নতুনভাবে দেখানো হচ্ছে।[৬৪] মুসলিম নারী এবং ইসলামী কর্মীরা পর্দাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে আগ্রহী। পোশাক শুধুমাত্র নিজেদের প্রকাশ করে না, এটি একইসাথে ইমেজ ও পরিচিতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে; এবং এটি দেখানোর জন্যে সমসাময়িক নারীবাদীগণ পোশাকের (এবং শরীর) রাজনীতিকে ইস্যু করছেন। এছাড়া, ইসলামী দর্শনের পূর্বেকার আরব ঐতিহ্যেও পর্দাকে মর্যাদার প্রতীকরূপে বিবেচনা করা হতো। যারা নিজেদের মুসলিম এবং নারীবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে চান তারা ইসলামের মাধ্যমে নারীমুক্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে আগ্রহী। তাদের ভাষ্যমতে ইসলাম-পূর্বকার বহু আচার/বিধি যা নারী-পুরুষের মাঝে অসমতার জন্ম দিয়েছে; সেগুলো সম্পর্কে ইসলামি দর্শনের যে নির্দেশনা তাতে লিঙ্গীয় সমতা নিহিত আছে। পর্দা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।[৬৫]

বিশ্বব্যাপী সকল দেশের, সকল ধর্মের নারীর জীবনে পর্দার রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা পর্দার সমষ্টিক অর্থকে ম্লান করতে পারে না,

---

[৫৯] Rudyard Kipling, "The Ballad of East and West," *A Victorian Anthology* (Edmund Clarence Stedman, 1895).

[৬০] Winifred Woodhull, 1991, p. 112.

[৬১] B. F. Stowasser, *Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism* (Cambridge University Press, 1984).

[৬২] Fatima Mernissi, *The Veil And The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Trnslated by Mary Jo Lakeland, New York: Addison-Wesley, 1991).

[৬৩] Fatima Mernissi, *Beyond the Veil* (Rev. ed., Bloomington: Indiana University Press, 1987).

[৬৪] Marie-Aimee Helie-Lucas, "The Preferential Symbol for Islamic Identity: Women in Muslim Personal Laws," *Identity Politics and Woman: Cultural Reassertions and Feminism in International Perspective,* edited by Valentine Moghadam (Boulder. Co: Westview, 1994).

[৬৫] Fatima Mernissi, 1987.

যেখানে পর্দাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স। পর্দার সাথে ধর্মীয় সংযোগ প্রাচীন কাল থেকে সংযুক্ত থাকলেও দেখা যায় যে, যেখানে নারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন এবং যেখানে ধর্মীয় পরিচয় বা ভাবাবেগ নারীর জন্যে আর ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেখানে পর্দা নারীর ওপর চাপানো সহজতর হয় না। সম্প্রদায়গতভাবে নারী যেখানে পরাধীন এবং পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত সেখানে নারীর ওপর অন্যান্য নিয়মনীতির মতো পর্দা আরোপণ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং অঙ্গীভূত।[৬৬] এছাড়া, পর্দার সাথে কেবলমাত্র ইসলামের সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন মহলে ভিন্নতা ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ, প্রাক-ইসলাম যুগে যেমনি পর্দার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, তেমনি হাল আমলেও নানাস্থানে মুসলমান নারীদের সাথে অ-মুসলিম নারীদের পর্দা পরিধান করতে লক্ষ করা যায়।[৬৭] আবার কোন কোনো অঞ্চল বিশেষে নারী নয়, পুরুষদের পর্দা করার বিধান রয়েছে, যাকে কোনোভাবেই অগুরুত্বপূর্ণ ভাববার সুযোগ নেই। সুতরাং পর্দাকে মুসলিম নারীর সাথে অনিবার্য করে তোলার বিষয়টি নিয়েও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।[৬৮]

পর্দা ও নারীমুক্তি

পর্দা পরিধানের পক্ষে ধর্মীয় যৌক্তিকতা উপস্থাপনে বহু নারী যারা হিজাব পরিধান করে থাকে, তারা পুরুষ-নারীর ভিন্নতা এই ডিসকোর্সটির প্রতি প্রশ্ন রাখেন। তাদের মতে পুরুষের অত্যধিক যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং এখানে নারীরা পুরুষের নিকট থেকে যৌনাচারের যে ঝুঁকিময় অবস্থাধীন থাকে, এক্ষেত্রে পর্দার আবশ্যিকতা ধর্মীয় যৌক্তিকতা পায়। এদের মতে পর্দানশীল নারী যৌন নির্যাতন থেকে রেহাই পায়, যদিও বিষয়টির সাধারণীকরণ এতোটা সহজ নয়। একটি কেস স্টাডিতে (অস্টিন, টেক্সাস) দেখা যায় যে, কিছু নারীর বিশ্বাস যদি পর্দার মতো আবরণী কোনো ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে তাদের নিয়ে পুরুষরা বহু অপকর্ম সম্পন্ন করতে পারতো। তাদের বিশ্বাস, ছেলেরা মেয়েদের মাঝে মিশে যেতো এবং এর ফলে তারা তাদের যে কোনো ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সক্ষম হতো।[৬৯] প্রায় একইভাবে কিছু সংখ্যক পুরুষের অভিমত হচ্ছে, নারীরা হচ্ছে 'হীরা'স্বরূপ, তারা অতিমূল্যবান। স্বামী বা ঘরের ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয় ব্যতিরেকে তাদের যার-তার সম্মুখে বের হওয়া উচিত নয়।[৭০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত যে, পর্দা বাস্তবে, নারীকে পুরুষের হাত (কুপ্রবৃত্তি) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। যেখানে বলা হয়ে থাকে যে, যৌনক্ষেত্রে নারী পুরুষের নিকট অত্যন্ত বিপদজ্জনক, ও ঝুঁকিময় অবস্থায় থাকে,

---

[৬৬] Fatima Mernissi, 1991.

[৬৭] Fatima Mernissi, *Women and Islam* (Oxford, Basil Blackwell, 1991).

[৬৮] Shanti Rozario, 1992, p. 42. ("... Hindu women in predominantly Muslim Bangladesh practice parda, although to a lesser extent than Muslim women, and that in Tuareg society it is men, not women who are veiled").

[৬৯] John P. Bartkowski, "Breaking Walls, Raising Fences: Masculinity, Intimacy, and Accountability among the Promise Keepers," *Sociology of Religion* (61, 2000), p. 33-53

[৭০] Ibid, 2000.

সেখানে একজন পর্দানশীল নারী অনায়াসে যৌনমুক্তি পায় এবং এমনকি সে নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাইরের পরিসরে নিজেকে নানা কাজের মধ্যে নিয়োজিত রাখতে পারে। অতএব, যেখানে পর্দাপ্রথার স্বপক্ষের মনীষীগণ যৌনক্ষেত্রে নারীর নাজুকতা ও ঝুঁকিময়তার কথা বলে তাদের ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকবার উপদেশ দেন, সেখানে বহু নারী নিজেদের সেভাবে করে ঘরকুনো করে রাখাকে সমর্থন করে না। তারা নিজেদের সর্বাঙ্গীণভাবে নিরাপদ অবস্থায় রেখে বাইরে কাজ করতে আগ্রহী।[৭১]

বিপরীতক্রমে, ঐ-সকল নারী যারা নিজেদের সহশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রেখেছে, তারা যুক্তি দেন যে, পর্দা বাইরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীর সৌন্দর্য ও মহার্ঘতার কথা বলে তাদের জন্যে ঘরের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট করা উচিত নয়। যে সকল নারী পর্দা করে তারা সমাজের বাইরের কেউ নয়, তাদেরও পাবলিক পরিসরে কাজ করবার অধিকার ও সামর্থ্য রয়েছে।[৭২] এটি নারীদের নানাবিধ সুবিধা দেয়, সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা নিরাপদ বোধ করে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে তারা ঝামেলামুক্ত থাকে। একজন তরুণী শিক্ষার্থী নিজেকে পর্দানশীল অবস্থায় পুরুষের পণ্যদৃষ্টি থেকে মুক্ত রাখতে পারে। যখন কোনো নারী পর্দারত অবস্থায় থাকে অন্য যে কেউ তাকে সে মোতাবেক অবলোকন করবে। বিশেষ করে পুরুষরা তাকে সম্মান করবে, তার কাজ ও মেধার মূল্যায়ন করবে।[৭৩] Bartkowski এভাবে উল্লেখ করেছেন, "if you are in hijab, then someone sees you and treats you accordingly. Especially men, they don't look at your appearance they appreciate your intellectual abilities. They respect you".[৭৪] পর্দানশীল নারী সম্মানিত হয়, কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র নিরাপদ থাকে এবং এভাবে পর্দাপ্রথাবাদীদের সাথে তাদের বিরোধও তৈরি হয়; বিশেষ করে যখন পর্দাপ্রথাবাদীরা নারীকে বাইরের পরিসরে কাজ করতে বাধা প্রদান করে এবং তাদেরকে ঘরের কাজে মনোযোগ দিতে উপদেশ দেয়। অবশ্য কারো কারো মতে, পর্দা কোনো স্বাভাবিক পোশাক নয়, এটি 'পিতৃতান্ত্রিক আরোপণ', সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুশাসন বা বাধ্যবাধকতা এবং সে মোতাবেক বিদ্যমান প্রবল পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের ফসল।

সমাজে যে সকল নারীর অবস্থান অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিময়, বাইরে কাজ করা ভিন্ন তাদের গত্যন্তর নেই সেখানে নারীর জন্যে পর্দা প্রকটভাবে বাধ্যবাধকতার রূপ নেয় না। আবার অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ নারীর জন্যেও পর্দা অনেকটা শিথিল। গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় যে, অবস্থাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রীগণ পর্দা পরিধান করে, কারণ পর্দা তার জন্যে মর্যাদার

---

[৭১] U. K. Rowzatur Romman, 2003, p. 3.

[৭২] Sheila K. Webster, *Harim and Hijab: Seclusive and Exclusive Aspects of Traditional Muslim Dwelling And Dress* (Women's State University Press, 1984).

[৭৩] Jen'nan Ghazal Read and John P. Bartkowski, "To veil or not to veil? A case study of identity negociation among muslim women in austin, texas," *Gender & Society* (14:3, 2000), p. 1336-71.("if you are in hijab, then someone sees you and treats you accordingly. Especially men, they don't look at your appearance they appreciate your intellectual abilities. They respect you").

[৭৪] Jen'nan Ghazal Read and John P. Bartkowski, 2000, p. 1354.

স্মারক। অর্থাৎ একই সমাজে নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী পর্দাপ্রথার মাত্রা ও উপযোগিতা বিভিন্ন রূপ হয়। চাদর, ওড়না বা এরূপ কোনো পোশাক মানেই পর্দা নয়, বরং মানসিক কাঠামোতে লুকায়িত থাকে আসল পর্দার প্রকৃত চেহারা। সেখান থেকে নারী, পুরুষ উভয়ের উর্ধ্বে অবস্থান করার মাঝেই নিহিত নারীর বাস্তবিক মুক্তির ঠিকানা। মত প্রকাশ ও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীন অধিকার নারীর জন্যে অবশ্যম্ভাবী। যে কোনো প্রকারের আরোপণ এক্ষেত্রে নারীমুক্তির বাধা হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে পর্দাপ্রথা

আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকে সংঘটিত ঐতিহাসিক শিল্পবিপ্লব-পূর্ববর্তী সময়ে প্রাচ্য দ্বারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হলেও পশ্চিমা বিশ্বের উত্তরোত্তর উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে বিশ্ব শাসনভার অর্থ-ক্ষমতার জোরে ক্রমে প্রতীচ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার এই যে ঐতিহাসিক পালা-বদল তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়াদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রাযুক্তিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবারের সদস্যদের মাঝে পূর্বেকার সম্পর্কজালেরও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেও পূর্ব তথা এশীয় দেশগুলোকে পশ্চিম ভিন্ন (হীন) চোখে অবলোকন করছে। পূর্বদেশীয় দেশগুলোর যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং পশ্চিমা সমাজ-সংস্কৃতির তুলনায় নিম্নজ্ঞান করা হয়। সামগ্রিক উন্নয়নের/প্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে পশ্চিমা জীবনধারাকে অনুসরণ করার জন্য সর্ব মহল থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়। পূর্ব সম্পর্কে পশ্চিমের গৎবাঁধা ধারণার ফলে পশ্চিমের সাথে পূর্বের একটি সুস্পষ্ট দেয়াল তৈরি হয়। সমাজতন্ত্রের পতনের পর মুসলিম দেশগুলো সরাসরি এবং এককভাবে পশ্চিমের এরূপ নেতিবাচক নজরে পড়ে। কারণ পশ্চিমের বিবেচনায় ইসলাম-ই পশ্চিমের একমাত্র অবশিষ্ট প্রতিপক্ষ। ফলত, ইসলামের বিভিন্ন নীতি-আদর্শের বিষয়ে পশ্চিম কঠোর সমালোচনামখর থাকে। এমনকি শক্তিবলে ইসলামকে প্রতিহত করবার প্রয়াস অব্যাহত রাখছে। পশ্চিম ইসলামকে দমন বা দুর্বল করার পেছনে যে-সকল হাতিয়ারকে ব্যবহার করছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পর্দা। পশ্চিম বলতে চাইছে পর্দা হচ্ছে ধর্মান্ধতার পরিচায়ক এবং পর্দার অনুশীলনকারী জনগোষ্ঠী (মুসলমান) আধুনিকতার বিপরীত। এটি প্রকৃতই তাদের মনগড়া অনুকল্প। প্রকৃত ইসলামের সাথে ধর্মান্ধতা বা আধুনিকতার কোনো সংঘাত নেই। এই সত্যটিকে পশ্চিম তাদের ক্ষমতাবলে আবৃত করে রাখতে চাইছে ইসলাম তথা তাদের অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের সামগ্রিক জীবনধারাকে অবমাননা করার অভিপ্রায় থেকে।

পর্দার আদি ইতিহাস ও অ-পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা রাজনীতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ইসলাম পর্দার সূচনা করেনি, তবে একে নারীর সামষ্টিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদন করে। কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা হলো এই যে, পর্দা নারীকে বিনয়ী ও সংযমী করে। অর্থাৎ নারীর ওপর পর্দা তাকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে নয় বা এটি তার সক্রিয়তার অভাবের কারণে আরোপিত নয়, বরং পর্দা কখনো কখনো নারীকে ক্ষমতায়িতও

করতে পারে।[৭৫] এটি নারীর স্বাভাবিক চলাচলে সহায়তা করে, এবং নারীকে রাস্তার যাবতীয় হয়রানি বা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতে পারে। পর্দা প্রথা বাংলাদেশেরও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো প্রায় অভিন্ন। তবে এর ভিন্নতাও অগ্রাহ্য করার মতো নয়। পর্দার নানা প্রকাশ নানা স্থানে। কখনো এটি সংখ্যালঘুদের প্রতীক, কখনো এটি অভিজাত শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এটি সুনিশ্চিতভাবে শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। পর্দাকে নারীর নৈতিক চরিত্র গঠন, সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের বিশেষ পরিক্ষেত্র হিসেবেও মনে করা হয়। আবার পর্দা যখন বাংলাদেশের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্র, বা ধর্ম থেকে চাপানো হয় তখন এটি নারীকে দমনের ও দলিত রাখার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। আফগানিস্তানের মতো তালিবান সমাজে পর্দার কড়াকড়ি এই প্রসঙ্গে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে পর্দা নারীকে বাহিরের বিশ্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখে। তাকে পতিসেবা ও পুত্র-কন্যা লালনের কর্তব্যের বেড়াজালে নিমজ্জিত করা হয়। পরাধীনতা হয় তার নিয়তি; ক্ষমতায়ন ও নারীমুক্তি তার কাছে থেকে যায় চির অচেনা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পৃথিবীর প্রায় চল্লিশ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জনেরও বেশি মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশে সাধারণভাবে পর্দা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের পর্দানশিন নারীরা পর্দার মাধ্যমে নিজেদেরকে পুরুষ ও বাহিরের কর্মক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রাখে। এটা যে তারা সবসময় স্ব-ইচ্ছায় করে তা কিন্তু নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুশাসন ও পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের অনুশীলনের ফলশ্রুতিতেই এইরূপ দূরত্বে তাদের অবস্থান। যদিও দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে পর্দার প্রচলন রয়েছে এবং মুসলিমদের মতো কিছু হিন্দুদের মাঝেও এর প্রচলন রয়েছে; একেকটা সম্প্রদায়ে পর্দা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষিত বিদ্যমান। যেখানে বাংলাদেশি মুসলিম নারী নিজেদেরকে পরিবারের বাইরের পুরুষবলয় থেকে নারী জগতের মাঝে নিরাপদ দূরত্বে বাস করতে পর্দার চর্চা করে সেখানে হিন্দু নারীর পর্দানশিন হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পতি এবং পরিবারের বরিষ্ঠদের নিকট নিজের অধস্তন উপস্থিতি। সে কারণে দেখা যায় বাংলাদেশে মুসলিম নারীর পৃথক্করণের শুরুর পর্যায় হচ্ছে বয়ঃসন্ধি কাল আর হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ।

বাংলাদেশে পর্দার অনুশীলনে বিভিন্নতা

বাংলাদেশের নারী সমাজের সার্বিক বাস্তবতা থেকে পর্দার নানা প্রকাশ লক্ষ করা যায়। শ্রেণীভেদে এবং গ্রাম-নগর ভিন্নতায় পর্দার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণত দেখা যায় যে, নিম্নবিত্তের নারীরা পর্দার বিষয়ে ততোটা আগ্রহী থাকে না। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণে বাহির পরিসরে কাজ করতে হয় বিধায়, সমাজের বিধি-নিষেধের প্রতি তাদের উদাসীনতা এবং তাদের কাজকর্মে সমাজের নজর বা খবরদারি তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মাঝে পর্দার বালাই খুব একটা লক্ষণীয় নয়। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্তের নারীদের পর্দা তথা চলাফেরার প্রতি সমাজ

[৭৫] U. K. Rowzatur Romman, 2003, p. 5.

অনেক বেশি সংবেদশীল। এই শ্রেণীভুক্তদের মাঝে পর্দানশিন হওয়ার প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে উচ্চবিত্তের ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ কম থাকার ফলে তাদের স্বাধীন চলাচলে সমাজ বা ধর্ম বাধা প্রদান করে না। এদের মধ্যে পর্দার ব্যবহার কম পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নগর বা শহরের বাস্তবতা গ্রাম থেকে আর্থ-সামাজিক ও কাঠামোগত ভিন্নতার কারণে পর্দার প্রচলনেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। শহরাঞ্চলে পর্দাপ্রথা মেনে চলা অনেকটা ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক মর্যাদা প্রকাশে অভিজাত শ্রেণীর নারীরা পর্দা ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে পর্দার নানাবিধ ধরন ও ফ্যাশন পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো কাছে পর্দা ধর্মীয় পরিচয় অপেক্ষা পোশাক হিসেবে বিবেচিত। তবে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে পর্দার ব্যবহার পূর্বের যে কোনো সময় অপেক্ষা বেশি দৃশ্যমান। বিগত জোট সরকারের আমলে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রমাণ করার মানসে গ্রাম এবং নগর উভয় ক্ষেত্রেই পর্দার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। তুলনামূলকভাবে নগর অপেক্ষা গ্রামে পর্দার ব্যবহার বেশি; এর বহুবিধ ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে।

পর্দা ও সামাজিক আচরণের মধ্যে নানা বিশেষ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। পর্দার মাধ্যমে নারীর নিকট কে সম্মানিত আর কে ক্ষমতাবান তার পরিচয় ফুটে ওঠে। যেমন, ছেলের বউ তার শাশুড়ির সামনে আসলে ছেলের বউ'র মাথা নত ও আবৃত থাকে। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় পবিত্র মুহূর্তও পর্দার মাধ্যমে বোঝা যায়। যেমন, আজানের সময়ে মুসলিম নারীরা সাধারণত মাথা আবৃত করে সম্মান জানিয়ে থাকে। অর্থাৎ পবিত্র ধ্বনি উচ্চারিত হলে সেখানেও বিশেষভাবে পর্দা ধারণ করা হয় (*awaz ka purdah*)। এই সময় নারী কোনো পর-পুরুষের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণপ্রবণ থাকে। আর এক ধরনের পর্দাকে বলা হয় দৃষ্টির পর্দা (*nazar ka purdah*)। বিভিন্ন পবিত্র ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এবং পবিত্র ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময়ে (যেমন, আজান, কোরআন পাঠ) নারী তার দৃষ্টি অত্যন্ত সংযত রাখে; দৃষ্টির পবিত্রতা সুনিশ্চিত করে। দৃষ্টির পর্দা ও আওয়াজের পর্দার ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষগণও বিশেষ সংযত আচরণ করে থাকে।

সামাজিক শ্রেণী, মর্যাদা এবং পর্দা

বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাধীনে কোনো নারীর জন্য বোরকা বা পর্দা পরিধান করে ঘরের বাইরে পদচারণ করাকে সমাজ সহজ চোখে দেখে। যদিও বাহির পরিসরে নারীর উপস্থিতি এখনও অনুল্লেখযোগ্য তথাপি পর্দা তার বাহিরে যাওয়ার বা কাজ করার একটি সমাজ/ধর্ম-স্বীকৃত উপায়। মুসলিম সমাজের নিকট পর্দা এমন একটি পোশাক যা তাকে বাহিরে চলাচলে ক্ষেত্রে যাবতীয় অসুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে। সেজন্য পর্দাকে দেখা হয় 'প্রতীকী আশ্রয়' (symbolic shelter) হিসেবে। যদিও একইভাবে পর্দা নারীকে সামাজিক ও শারীরিকভাবে সমাজ থেকে একটি 'পৃথক বিশ্বে' (separate world) অবস্থান করায়। বাংলাদেশের সমাজ অধ্যয়ন করলে নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রে পর্দার প্রভাব ও ভূমিকা লক্ষ করা যায়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ও সংস্কৃতিতে পর্দার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। সমাজে মর্যাদার মানদণ্ড, সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, বিবাহ, শ্রম বিভাজন ও নিয়ন্ত্রণের ওপর পর্দার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের একটি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী কাঠামো। এটি ইসলামের অন্যতম আদর্শ "সামাজিক সমতার" বিপরীত। এশীয় অঞ্চলে মুসলিম সমাজকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: আশরাফ ও আতরাফ। এ দুটো শ্রেণীর ভিন্নতা নারীর প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও অনুমান করা যায়। আশরাফ বা উঁচু শ্রেণীর নারীদের পর্দা পরিধান করতে হয় এবং বাহিরে এদের যাতায়াত সীমায়িত করা হয়। অন্যদিকে আতরাফের মধ্যে পর্দার রূপ এতটা কঠোর নয়। এই শ্রেণীর নারীরা পুরুষদের সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাস্তবতা বিবেচনায় দরিদ্র শ্রেণীর নারীদের জীবনে পর্দার ততোটা কড়াকড়ি নেই, কারণ পর্দা স্বয়ং যে মর্যাদা প্রতিনিধিত্ব করে তা দরিদ্র নারীর পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কাজেই পর্দার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মর্যাদার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। ধর্মের দ্যোতনার কারণে এবং যেহেতু এটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো আচরণ হিসেবে বিবেচিত সে-কারণে অর্থনীতি এককভাবে নয় বরং পর্দাও মর্যাদার নির্দেশক। বাংলাদেশের গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি গ্রামে খুব কম সংখ্যক পরিবার রয়েছে যারা কঠোরভাবে পর্দার অনুশীলন করতে সক্ষম। গ্রামের বাকি পরিবারগুলো এসব পরিবারকে মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

শ্রম বিভাজন ও বাহির পরিসর

পর্দা-অনুসৃত সমাজে নারী ও পুরুষের যে বিভাজন তা শ্রমের বিভাজনেও সুস্পষ্ট রেখা নির্দেশ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বাসগৃহে কাজকর্ম সাধারণত বিভাজিত; পুরুষ প্রধানত গৃহের বাইরে কাজ করে এবং আয়-রোজগার অর্জন করে এবং নারীরা গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। শ্রমের নির্দিষ্ট ও কঠোর বিভাজনের একটা প্রধান পরিণতি হলো নারী ও পুরুষের মাঝে উচ্চ পর্যায়ের স্বাধীনতা। গ্রামের বহু পরিবার এবং শহরের কিছু নিম্ন আর্থ-সামাজিকক শ্রেণীভুক্ত পরিবারের মধ্যে দেখা যায় নারী শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পর্দা ব্যবস্থা নারীর শ্রম-ভারকেও (work loads) প্রভাবিত করতে পারে। দেখা যায় বাইরে কাজ করার পর নারী আবার কিছু কাজ তার গৃহেও সম্পন্ন করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দেয়। এমনও দেখা যায় যে, পর্দা ব্যবহারকারী নারীর অর্থে পরিচালিত পরিবারে পুরুষগণ সেসব কাজও করে থাকে যা পূর্বে সাধারণ অর্থে 'নারীর কাজ' বলে বিবেচিত। পারিবারিক জীবনে নারীর যে বিচরণ সেখানে নারীর ক্ষমতা কতটুকু তা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যখন কোনো নারী কোনো ঘরের বউ হিসেবে প্রবেশ করে তখন ঐ ঘরের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের বেশিরভাগ তাকেই করতে হয়। তখন দেখা যায় ঐ ঘরের শাশুড়ি ঘরের বাইরের কাজগুলো দেখাশোনা করে। এটাও লক্ষ করা যায়, বিয়ের পূর্বে নারী যদিওবা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করে বিয়ের পর তাকে তার শশুর বাড়ির রীতি-নীতি বা মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পর্দানশিন জীবনের সূচনা করতে হয়।

বাংলাদেশে পর্দা ব্যবহারের পটভূমি বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে এবং এখানে প্রবল পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্বের কারণে প্রত্যক্ষভাবে পর্দা ব্যবহারের জন্য বিধি-নিষেধ করা না হলেও মতাদর্শিকভাবে নারীকে পর্দানশিন হওয়ার প্রেরণা দেয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের বেশিরভাগ অংশ পর্দা ব্যবহারের পক্ষপাতী নন।

তারা মনে করেন, পর্দা নারীকে তার গৃহাভ্যন্তরেই আবদ্ধ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। পর্দা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নগর অপেক্ষা গ্রামে এর প্রচলন বেশি; তুলনামূলকভাবে উচ্চ শিক্ষিতদের মাঝে এর ব্যবহার কম এবং অন্যান্য সময়ের তুলনায় বিগত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরে পর্দার ব্যবহারের আধিক্য বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। এর ক্রমবর্ধমান প্রচলনের কারণে এখন গ্রাম-গঞ্জে ও শহর-বন্দরে বিভিন্ন ফ্যাশনের আধুনিক সেলাইঘর ও বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যাও চোখে পড়ে। তবে যে কথাটি অনস্বীকার্য সেটি হলো, অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশে পর্দার অনুশীলনে এবং এর সূচনায় পশ্চিমা মনঃকল্পিত ভাবধারা যথার্থ নয়। বাহির থেকে কোনো দেশের সামগ্রিক বাস্তবতা বিবেচনা ব্যতিরেকে যেমনি মনোগত চিন্তা সঠিক হতে পারে মনা তেমনি একই দেশের অভ্যন্তরেও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ভিন্নতায় পর্দার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার বিধি, কারণ ও বাস্তবতা নিহিত যা এর অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে বাহির থেকে আত্মনিষ্ঠ ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

উপসংহার

পর্দা ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিরোধ, সামাজিক অভিঘাত ইত্যাদির প্রতীক হলেও বর্তমানে এটি মুসলিম ও অ-মুসলিম দেশগুলোর অন্যতম আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে পর্দাকে অত্যন্ত প্রকটভাবে মুসলিম নারীর জন্যে অবিচল ও অনুগত একটি ব্যবস্থা হিসেবে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর সমালোচকগণ পর্দাকে ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে দেখেন, যেখানে এটি নানাভাবে নারীর অধিকারে বাধা সৃষ্টি করে, নারীর কণ্ঠরোধ করে এবং প্রকারান্তরে পুরুষশ্রেষ্ঠত্বকে (male chauvinism) প্রাধান্য দেয়।[৭৬] তারা ঐ-সকল মুসলমানদের কটাক্ষ করেন যারা কিনা নারীদের জীবনের বাস্তবতা তথা কর্মক্ষেত্রের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে বাইরের কর্মপরিসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাদের অভিমত, এর ফলে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রকারান্তরে হরণ করা হয়, এবং নারীদেরকে পুরুষশ্রেষ্ঠম্মন্যতায় প্রবল বিশ্বাসী ও অনুগত নারী সৃষ্টিতে মানসিকভাবে বাধ্য করা হয়। অবশ্য কিছু সমালোচক ভিন্ন মত পোষণ করেন, এদের কথা হচ্ছে পর্দা কখনো-কখনো-বা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং সম্মানজনক চর্চা হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যা নারীকে স্বাধীনতাও দিতে পারে। এটি স্বাধীনতা দিতে পারে বা নারীমুক্তিতে সহায়ক হতে পারে, কারণ এটি মর্যাদার অলৌকিক আভা সঞ্চার করে। তাদের আরও যুক্তি হচ্ছে, এককভাবে যখন নারীকে দেখা হয় তখন তার শারীরিক সৌন্দর্যকে দেখা হয় না, তাকে দেখা হয় না যৌনবস্তুরূপে; দেখা হয় তার মনের গভীর সৌন্দর্যকে।[৭৭]

পর্দার আদি প্রচলন এবং বর্তমান সমাজে এর কার্যকারণসম্পর্ক বিশ্লেষণ না করে একে কোনোভাবেই সাধারণীকরণ করা সমীচীন নয়। প্রাচ্যের মুসলিম নারী বলতেই প্রতীচ্যের যে গৎবাঁধা ধারণা তার সংস্কার জরুরি। কারণ এরূপ স্থিরীকৃত ইতিহাস সত্যপ্রতিম নয়। একই

---

[৭৬] A. Khun & M. Wolpe (eds.), *Feminism and Materialism: Women and Modes of Production* (London: Routledge and Kegan Paul, 1978).

[৭৭] U. K. Rowzatur Romman, 2003, p. 5.

সমাজের মাঝেও পর্দাপরিহিত দুজন নারীর পর্দার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত কাজ করতে পারে, একে একই সূত্রে বিচার করা উচিত নয়। বরং সকল প্রেক্ষিত ও সত্যকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পশ্চিমের বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, তথা পূর্বের ধর্মীয় জীবনসহ যাবতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ পশ্চাৎমুখী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এই গৎবাঁধা পূর্বানুমানের কারণে পর্দাপ্রথার সাথে কোরআন বা ইসলামের অনুশাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ পর্দার সূচনা ইসলামপূর্বকার ঘটনা। এভাবে ইসলামকে নির্বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার কারণে প্রকৃত অর্থ, তথ্য ও কারণ অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। প্রচলিত ভূ-রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে করে ইসলামকে অধ্যয়ন ও অবলোকন করা হয় তা থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যমান ব্যাখ্যা, পরিবেশনার প্রতিবিধান ও সংশোধনের মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলাম ও এর যাবতীয় অনুষঙ্গকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব।

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ

এখানে আমি FOWSIA (Forum On Women in Security and International Affairs) এর নিকট গভীরতর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। এই প্রতিষ্ঠানটি "Women, Purdah and Diversity" শীর্ষক একটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করে, যেখান থেকে মূলত আমি পর্দা বিষয়ে জানবার সুযোগ ও একইভাবে এই প্রবন্ধটি লিখবার প্রেরণা বা সাহস পাই। উক্ত কর্মশালায় যে সকল বিজ্ঞজনের সম্মিলন ঘটেছিল, যেমন, ড. দিনা সিদ্দিকি, ড. এইচ. কে. আরেফিন, ড. ফস্টিনা পেরেরা, অধ্যাপক ফেরদৌস আজিম, ড. সোনিয়া আমিন, ড. গীতি আরা নাসরিন, ড. হামিদা হোসেন, ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, ড. আমেনা মহসিন, ড. রওজাতুর রহ্মান, ড. ইফতেখারুজ্জামান (বর্তমানে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক); এঁদের মূল্যবান আলোচনা আমাকে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উপকৃত ও মুগ্ধ করেছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলের আলোচনা আমাকে পর্দা সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণাদি বুঝতে সাহায্য করেছে, এ-জন্যে আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে এখানে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার প্রিয় শিক্ষক-সহকর্মী অধ্যাপক আহমেদ ফজলে হাসান চৌধুরী ও সাদাফ নূর-এ ইসলামকে; তাঁরা FOWSIA-র কর্মশালায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাকে মূল উৎসাহ জুগিয়েছেন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন : একটি এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা

এম. নূরুল ইসলাম*
শেখ আশিকুররহমান প্রিন্স•

Abstract : The rural, speciallly, the rural people of Bangladesh used to take betel-leaf, rolled into a small conical cup, after eating rice. They also entertain their guests with it. For chewing, they prepare betel-leaf with lime, betel-nut, *jarda* (scented tobacco leaves) and other *pan-mashla* (spices for betel leaf). Preparation of lime from cockle (local name is *Jhinuk)* is very hard working job. Usually the rural women do this job in their houses. In this article the author tried to explore the livelihood pattern of the rural women, who are involved with prepare lime from the cockle.

ভূমিকা

চুন শিল্প সম্পর্কে সাধারণত বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষই কমবেশি অবহিত। এর ব্যবহারও প্রায় সবারই জানা। বাংলাদেশে দুই ধরনের চুন পাওয়া যায়—পাথুরে চুন ও ঝিনুকের চুন। পাথুরে চুন মূলত বাড়ি-ঘরের রং, পানি ও মাটির ক্ষারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ঝিনুকের চুন শুধুমাত্র পানে মাখিয়ে খাওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই পান খেয়ে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে অতিথি আপ্যায়নে পান একটি অতি জনপ্রিয় বস্তু। শুধু তাই নয়, শহরাঞ্চলেও পানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঝিনুকের চুন প্রস্তুত প্রণালীর সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন পর্যালোচনা। গরবষণা পরিচালনার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর উপজেলার চুনাপাড়া গ্রামটি নির্বাচন করা হয়। আর এখান থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ প্রাথমিক উপাত্তের ওপর নির্ভর করেই প্রবন্ধটি রচিত। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর উপজেলার শুধুমাত্র এই গ্রামটির সাতটি পরিবার ঝিনুকের চুন তৈরির সাথে সম্পৃক্ত।

এ গ্রামের সকলেই জানিয়েছে যে, পূর্বে গ্রামটির বেশিরভাগ মানুষ চুন তৈরির সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলেই গ্রামটির নাম হয়েছে 'চুনাপাড়া'। এদের কার্যাবলি অবলোকন এবং সরাসরি এদের

* এম. ফিল. গবেষক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
• রিসার্চ ফেলো, নর্থইস্ট ওয়েলস্ ইনস্টিটিউট অব হায়্যার স্টাডিজ, যুক্তরাজ্য।

নিকট থেকে চুন শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আলোচ্য গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মহিলার কেস স্টাডির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার ধরন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এরা দুই ধরনের চুনই প্রস্তুত ও বাজারজাত করে থাকে। তবে আলোচ্য গবেষণায় শুধুমাত্র ঝিনুকের চুন প্রস্তুত প্রণালী ও বাজারজাতকরণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঝিনুকের চুন তৈরির সার্বিক কার্যাদি মহিলারাই করে থাকে।

ঝিনুকের চুন প্রস্তুত প্রণালী

ঝিনুকের চুন প্রস্তুত বা তৈরি করার পূর্বে ঝিনুক সংগ্রহ করতে হয়। এই ঝিনুক মূলত খাল, বিল ও পুকুরে পাওয়া যায়। আর ঝিনুক সংগ্রহের কাজটি পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই করে থাকে। এরপর পরিবারের মহিলা সদস্যরা এগুলো বড় কড়াইতে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করলে ঝিনুকগুলো মরে যায়। তারপর ঠাণ্ডা হলে এগুলোর ভেতরের নরম অংশ ফেলে দিতে হয়। অনেক ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মুক্তা এরা বাজারে বিক্রি করে। এরপর ঝিনুকগুলো রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। নিম্নে ঝিনুকের চুন প্রস্তুত প্রণালী পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

ঝিনুক পোড়ানো ভাটা

প্রথমে শুকনো ঝিনুক পুড়িয়ে ছাই করতে হয়। ঝিনুকগুলো পোড়াতে হয় 'ভাটা'-তে। উল্লেখ্য, ঝিনুক পোড়ানো চুলা বা চুল্লিকে 'ভাটা' বলা হয়। এই ভাটার আকৃতি গোলাকার। এর চারদিকের দেয়াল ও মেঝে মাটি দিয়ে তৈরি। গভীরতা ৪ থেকে ৫ ফুট এবং ব্যাস ৬ থেকে ৭ ফুট। এই ভাটার যেকোনো এক দিকে মোটামুটি এক ফুট ব্যাসের একটি ফুটা থাকে। ঝিনুক পোড়ানোর সময়ে এই ফুটো দিয়ে বৈদ্যুতিক বা হাত পাখা দ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। এ ধরনের একটি ভাটাতে এক সঙ্গে একশত থেকে দেড়শত কিলোগ্রাম পর্যন্ত ঝিনুক পোড়ানো যায়, যা থেকে প্রায় তিনশত থেকে চারশত কিলোগ্রাম চুন তৈরি হয়। উল্লেখ্য, ঝিনুক পুড়িয়ে প্রথমে ছাই করা হয়। অতঃপর এই ছাইয়ের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজন মতো পানি মিশিয়ে চুন তৈরি করা হয়।

ভাটায় ঝিনুক পোড়ানোর পদ্ধতি

ভাটায় প্রথমে কিছু শুকনো কাঠের খড়ি সাজিয়ে তার ওপর কিছু ঝিনুক বিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আবার খড়ি সাজিয়ে তার ওপর ঝিনুক বিছিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে চার-পাঁচটি স্তরে ঝিনুক সাজিয়ে ভাটায় আগুন ধরানো হয়। ভাটার এক পাশে যে পাশে ফুটো থাকে, ঐ ফুটো দিয়ে বৈদ্যুতিক বা হাত পাখা দ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। এতে ঝিনুকগুলো দ্রুত পুড়ে যায়। এক ভাটা ঝিনুক পুড়তে সময় লাগে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেক এবং একশত থেকে দেড়শত কিলোগ্রাম ঝিনুক পোড়াতে আড়াইশো থেকে তিনশত কিলোগ্রাম শুকনো কাঠের খড়ির প্রয়োজন হয়। ঝিনুকগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, সেই ছাই ঠাণ্ডা হওয়ার পর চালুনি দ্বারা ভালোভাবে চেলে নিতে হয়। এরপর সেই ছাইয়ের কিছু পরিমান 'নাইন্দ'-এ নিয়ে আস্তে আস্তে পানি দিয়ে সেগুলো 'লাকড়ি' দ্বারা ভালোভাবে নাড়তে হয়। উল্লেখ্য,'নাইন্দ' হচ্ছে মাটি খুঁড়ে, এর মেঝে ও দেয়াল পাকা করে তৈরি একটি গর্ত। এর গভীরতা প্রায় আড়াই ফুট এবং ব্যাস আনুমানিক পাঁচ ফুট। এই ভাবে কিছুক্ষণ নাড়ার পর সেগুলো গুটিগুটি হয়ে যায় (এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো, ঝিনুক পোড়ানো শুকনো ছাইয়ে পানি দেওয়ার সাথে সাথে সেগুলো টগবগ

করে ফুটতে থাকে) তখন সেগুলো চালুনি দিয়ে আবার চেলে নিতে হয়। এরপর সেগুলো আবার 'নাইন্দ'-এ পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ সময়ে এগুলো পরিষ্কার ও রং সাদা করার জন্য এর মধ্যে পরিমাণ মতো 'ফিটকিরি' ও 'হাইডোজ' দিতে হয়। এগুলো ভালোভাবে ভিজে গেলে 'নাইন্দ'-এর মধ্যে নেমে পা দিয়ে মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েক খুঁচতে হয়। এই চুন খোঁচার কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টদায়ক। কারণ এতে পায়ে যন্ত্রণা হয় এবং ঘা হয়। তাছাড়া এই খোঁচার কাজটি করতে হয় প্রায় ঘণ্টা দুয়েক।

এরপর 'নাইন্দ'-এর মধ্যে আস্তে আস্তে পানি দিয়ে সেগুলোকে কাদার মতো করা হয়। এবার শেষ বারের মতো চালুনিতে ছেঁকে পরিষ্কার চুন তৈরি করা হয়। আর এ কাজগুলো সবই করে পরিবারের মহিলারা। তবে তৈরি চুন বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পরিবারের পুরুষ সদস্যদের।

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

চুনাপাড়া গ্রামের যে সাতটি পরিবার চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত তারা সকলেই বেশ সচ্ছল জীবন যাপন করে। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এই গ্রামের পরিবার সংখ্যা মাত্র ষোলটি আর লোক সংখ্যা ৯৩ জন। এর মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ আর ৪৫ জন মহিলা। ষোলটি পরিবারের মধ্যে সাতটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে বর্তমানে তিনটি পরিবার চুন শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। আর চারটি পরিবারের পেশা কৃষি হলেও তারা ঝিনুকের ব্যবসা করে থাকে। অর্থাৎ এ সমস্ত পরিবারের কিছু সদস্য পুকুর ও খাল-বিল থেকে ঝিনুক সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে গ্রামটির সাতটি পরিবারকে চুন শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিবেচনা করা হয়েছে। এই সাতটি পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩১ জন; এর মধ্যে ২৩ জনই মহিলা এবং বাকি ৮ জন পুরুষ। উল্লেখ্য, এদের কারো বয়সই ২১ বছরের নিচে নয়। এই পরিবারগুলোর সকলেরই নিজস্ব বসত-বাড়ি রয়েছে এবং বাড়িগুলো মাটির তৈরি আর এর চালা খাড়া টিনের। এদের সবার বাড়িতেই জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সরবরাহকৃত পায়খানা রয়েছে এবং এরা সকলেই টিউবওয়েলের পানি পান করে থাকে। এই সাতটি পরিবারের চাষাবাদযোগ্য কোনো কৃষি জমি নেই। চুন শিল্পই এদের জীবীকার প্রধান উৎস।

সারণি ১

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্যসংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা
৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার	১
৪ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার	৩
৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার	২
৬ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার	১
মোট	৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য , ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণা এলাকার সাতটি পরিবারের মধ্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ১টি, ৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ৩টি এবং ৫ ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২টি ও ১টি (সারণি ১)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণা এলাকার সাতটি পরিবারের মোট সদস্য

সংখ্যা ৩১ জন এবং এদের মধ্যে মহিলা সদস্য মোট ২৩ জন। এদের সবারই বয়স ২১ ও তার উর্ধ্বে

সারণি ২

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা
বিবাহিতা ও স্বামী বর্তমান	৩
অবিবাহিতা	১২
স্বামী পরিত্যক্তা	৩
তালাকপ্রাপ্তা	২
বিধবা	৩
মোট	২৩

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে ১২ জন মহিলা অবিবাহিতা। বাকি ৩ জন মহিলা বিবাহিতা ও তাদের স্বামী বর্তমান; স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্য ৩ জন, তালাকপ্রাপ্তা ২ জন ও বিধবা মহিলার সংখ্যা ৩ জন (সারণি ২)

সারণি ৩

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের বয়স

বয়স	সংখ্যা
২১ থেকে ২৯	১৫
৩০ থেকে ৩৯	৩
৪০ থেকে ৫০	৩
৫১ থেকে উর্ধে	২
মোট	২৩

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে ২১ থেকে ২৯ বছর বয়স্কা মহিলার সংখ্যাই বেশি অর্থাৎ ১৫ জন। অন্য দিকে ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়স্কা মহিলার সংখ্যা ৩ জন, ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়স্কা মহিলার সংখ্যা ৩ জন এবং ৫১ বছরের অধিক বয়স্কা মহিলার সংখ্যা মাত্র ২ জন (সারণি ৩)। এ সমস্ত মহিলাদের সকলেই কর্মক্ষম এবং এরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করে থাকে।

সারণি ৪

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের শিক্ষা

শিক্ষা	সংখ্যা
নিরক্ষর	৯
অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	৪
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৫
৮ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩
মাধ্যমিক পাশ	২
মোট	২৩

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে ৯ জন নিরক্ষর, ৪ জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। বাকিদের মধ্যে ৫ জন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ও ৩ জন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। এবং ২ জন মহিলা মাধ্যমিক পাশ করেছে (সারণি ৪)।

সারণি ৫

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের পারিবারের আনুমানিক বার্ষিক আয় (২০০৬)

আনুমানিক বার্ষিক আয় (টাকা)	পরিবারের সংখ্যা
২০০০০ থেকে ৩০০০০	১
৩১০০০ থেকে ৪০০০০	৪
৪১০০০ থেকে উর্ধ্বে	২
মোট	৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণা এলাকার সাতটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক আয় ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা, ৪টি পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক আয় ৩১,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা এবং ২টি পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক আয় ৪১,০০০ টাকা থেকে উর্ধ্বে (সারণি ৪)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণা এলাকার সাতটি পরিবারই বেশ সচ্ছল।

সারণি ৪

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের পারিবারের আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় (২০০৬)

আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় (টাকা)	পরিবারের সংখ্যা
২০০০০ থেকে ২৫০০০	৩
২৬০০০ থেকে ৩৫০০০	৪
মোট	৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ডিসেম্বর ২০০৬।

গবেষণা এলাকার সাতটি পরিবারের মধ্যে ৩টি পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা এবং ৪টি পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় ২৬,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা (সারণি ৪)। উল্লেখ্য প্রত্যেকটি পরিবারেরই কিছু না কিছু সঞ্চয় রয়েছে এবং সেই সঞ্চয়ের পরিমান আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকারও বেশি।

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এ কথা অকপটে বলা যায় যে, গবেষণা এলাকার চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ ভালো। তাছাড়া তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, এ কাজটি করে তারা বেশ ভালো আছে।

চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরন

'জীবনযাত্রার ধরন' বলতে এখানে চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা এলাকার নির্বাচিত মহিলারা কিভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে সে বিষয়টিই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

কেস স্টাডি ১

চুনাপাড়া গ্রামের সবচেয়ে সফল, কর্মঠ ও সুখী মহিলা মনোয়ারা বেগম। বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। স্বামী হারেজ আলী বয়সের কারণে খুব বেশি একটা খাটা-খাটনি করতে পারে না। চার মেয়ে দুই ছেলে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বড় ছেলে বিয়ের পর আলাদাভাবে সংসার করে। তাদেরও দুটি সন্তান রয়েছে। মনোয়ারাই সংসারের কর্ত্রী। ছোট ছেলেটার বর্তমান বয়স আনুমানিক বাইশ। মনোয়ারার পরিবারের সকলেই চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

মনোয়ারার বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়েসে। হারেজ আলী তখন টগবগে যুবক। বিয়ের পরপরই হারেজের বাবা তাকে আলাদা করে দেয়। হারেজের বাবা ওসমান চুনের ব্যবসা করতো। তবে তাদের বাড়িতে চুনের কোনো ভাটা ছিল না। বাবার পথ অনুসরণ করে হারেজও চুনের ব্যবসা শুরু করে। পিতা-পুত্র দুজনই বাগমারার এক গ্রাম থেকে চুন কিনে এনে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করতো। এ ভাবেই তাদের সংসার চলে যেতো। এরপর হারেজের বড় ছেলে তৈয়বের জন্ম হয়। প্রথম পুত্র সন্তানের আগমনে ওরা দুজনেই খুশি হয়। তাদের সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজলভ্য তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং বিয়ের বার-তের বছরের মধ্যেই তারা ছয় সন্তানের জনক-জননী হয়ে যায়। সংসারে অভাব দেখা দেয়। হারেজ ভাবতে থাকে, এভাবে তো আর সংসার চালানো যায় না। যে ভাবেই হোক সংসারের আয় বাড়াতে হবে। এরই মধ্যে হারেজ আলী ঝিনুকের চুন তৈরির সব রকমের কাজ ভালোভাবে শিখে ফেলে। হারেজ একদিন তার স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে, 'আচ্ছা চুনের ভাটা করলে কেমন হয় ?' মনোয়ারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। সুতরাং সে এ বিষয়ে কোনো মতামতও দিতে পারে না। এরপর হারেজ পুরো ব্যাপারটি অর্থাৎ ঝিনুকের চুন তৈরির সমগ্র প্রক্রিয়াই তার কাছে বলে দেয়। এবং এর লাভ সম্পর্কেও বলে। এরপর মনোয়ারা ও হারেজ আলী একদিন সত্যি সত্যিই ঝিনুকের চুন তৈরির কার্যক্রম শুরু করে দেয়।

এখন থেকে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগের কথা। হারেজ আলীর স্ত্রীর একটা বড় খাসি ছিল। খাসিটা দুইশত তিরিশ টাকায় বিক্রি করে তারা ঝিনুকের চুন তৈরির কাজ শুরু করে। হারেজ ও তার স্ত্রী তাদের বাড়ির উঠানে ছোট্ট একটি ভাটা এবং ভাটার পাশেই একটি নাইন্দ তৈরি করে। ভাটা ও নাইন্দ সম্পূর্ণ শুকাতে সময় লাগে দশ দিনের মতো। এরপর মাত্র আধ মন ঝিনুক কিনে এনে চুন তৈরির কাজ শুরু করে। সেই থেকে এখনো তারা একই পেশায় নিয়োজিত। এর থেকেই তারা দুইটি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, এক ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে, ছেলেমেয়েদের সামান্য কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছে। চার কক্ষ বিশিষ্ট খাড়া টিনের বাড়ি করেছে। শুধু তাই নয় ছোট দুই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার খরচও তারা সঞ্চয় করে রেখেছে।

মনোয়ারার সংসারে এখন আর কোনো অভাব নেই। মনোয়ারা ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময় নিজের জন্য অথবা তার ছেলেমেয়ের জন্য কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে পারে। সে এখন দুটি সমিতির সদস্য। সেখানেও তার বেশকিছু সঞ্চয় রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মনোয়ারা জানায় যে, কাজটি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এ কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম সবারই হাতেপায়ে ঘা হয়ে যায়। আর সেই ঘা নিয়েই কাজও করতে হয়। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো সময় সারাদিন সারারাত এ কাজ করতে হয়। অনেক সময় রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে নাইন্দে নেমে চুন খোঁচার কাজ করতে হয়। তারপরও এ কাজটি তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করে থাকে। কারণ এ কাজটি তার সংসারে এনে দিয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বনির্ভরতা।

পরিবারের কর্তা তার স্বামী। তবে মনোয়ারার কথা মতোই সংসারের সবকিছু হয়।

এক ছেলে ও দুই মেয়ের বিয়ের যাবতীয় কথাবার্তা মনোয়ার উপস্থিতিতেই হয়েছিল। আর তাদের বিয়ের খরচপত্র হারেজ আলী স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেই করেছিল। বর্তমানে মনোয়ার ঘরে দুইটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে। এক মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করে বর্তমানে ব্র্যাক-এ চাকরি করে। দিনের বেলায় সময় পায় না বলে এই মেয়েটিও বিশেষ করে রাতের বেলায় পরিবারের আর সকলের সাথে চুনের ভাটায় কাজ করে। এ কাজ করতে পরিবারের কোনো সদস্যই দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করে না। এ কাজ করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছে বলে মানোয়ারা বেজায় খুশি।

বি:দ্রঃ তথ্য প্রদানকারী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হলো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মহিলারা সাধারণত সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছেড়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত সংসারের হাজারো কাজে ব্যস্ত থাকে। এদের নাওয়া-খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। নেই বিশ্রামের সুযোগ। এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছে মহিলাদের এ ধরনের সাংসারিক কাজের কোনো মূল্য নেই। কারণ সাংসারিক কাজের বিনিময়ে কোনো রকম অর্থ প্রাপ্তি ঘটে না।

কেস স্টাডি ২

রাহেলা বেগমের বাবার বাড়ি বাগমারা থানার হাট গাঙ্গোপাড়া গ্রামে। ছয় বছর বয়সে মা মারা গেলে তার বাবা আবার বিয়ে করে। সৎমা তাকে মোটেই ভালো চোখে দেখতো না। তাই বাবা কোবাদ আলী তাকে দুর্গাপুর থানার উজানখলসী গ্রামে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। রাহেলা সেখানেই সুখেদুখে বড় হয়েছে। রাহেলার নানী সে সময় তাকে একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছিল। সেই ছাগলের বাচ্চাটা নিয়েই সারাদিন সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো। আস্তে আস্তে রাহেলাও বড় হতে থাকে, তার ছাগলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাহেলার মামা অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি রাহেলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ছয়টি ছাগলের মধ্যে পাঁচটি বিক্রি করে একটি গরুর বাছুর কিনে দেয়। রাহেলা তখন থেকে সেই গরুর বাছুর আর ছাগল ছানা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।

সময় যায়। তের-চৌদ্দ বছর বয়সে রাহেলার বিয়ে হয় একই গ্রামের হোসেন আলীর সাথে। হোসেন আলী একজন ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের বেকার ছেলে। বয়স আঠার-উনিশ। বিয়ের সময়ে রাহেলার মামা নব দম্পতিকে রাহেলার পোষা তিনটি ছাগল আর একটি গাই গরু যৌতুক হিসেবে দিয়েছিল।

হোসেন আলীর বাবা একজন লোভী প্রকৃতির মানুষ ছিল। সে তার ছেলেকে একদিন বলে যে, গরু আর ছাগলদুটো বিক্রি করে সমস্ত টাকা তার হাতে তুলে না দিলে স্বামী-স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। বিষয়টি নিয়ে উভয়ের মধ্যে গোলমাল বেধে যায়। হোসেন আলী তার স্ত্রীকে বলে, তারা এ বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাবে এবং ছাগলদুটো বিক্রি করে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করবে। রাহেলা রাজি হয়। হোসেন আলী সেদিনই বত্রিশ টাকায় ছাগলদুটো বিক্রি করে চুনাপাড়া গ্রামে এসে ছয় টাকায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তাদের সবকিছু নিয়ে সেখানে চলে আসে। আর এ কাজে তাদের সহায়তা করে হোসেন আলীর বন্ধু শহীদুল। শহীদুল ফেরি করে চুন বিক্রি করতো। শহীদুলই হোসেন আলীকে চুন ফেরি করার যুক্তি দেয় এবং সেদিনই দুটি টিন, দাঁড়িপাল্লা, বাটকারা কিনে দেয় এবং নিজ হাতে বাঁশের 'বাঁহুক' বানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, শহীদুল আধমন চুন কিনে দিয়ে হোসেন আলীকে গ্রামে গ্রামে চুন বিক্রি করতে পাঠায়। সেদিন থেকেই শুরু হয় হোসেন আলী আর রাহেলার নতুন জীবন। এরই মধ্যে রাহেলার গরুর

বাছুর হয় এবং কিছুদিন পর গরুটি প্রতিদিন দুই সের করে দুধ দিতে থাকে। হোসেন আলী চুন বিক্রি করে আর রাহেলা গরুর পরিচর্চা করে। বেশ ভালোভাবে কাটতে থাকে তাদের দিনকাল।

এমনিভাবে কেটে যায় দশবার বছর। রাহেলার ঘরে আসে পরপর তিনটি মেয়ে। অপর দিকে হোসেন আলী কিছু বদ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে। হোসেন আলী প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা হলেই 'তাড়ির ভাটি'-তে যায় এবং মাঝ রাতে মাতাল অবস্থায় বাড়ি এসে অযথা চেল্লাচিল্লি করে এবং মাঝে মাঝে রাহেলাকে মারধোরও করে। সংসারে ভীষণ অশান্তি দেখা দেয়। তারপর হোসেন আলী অন্য একজন মেয়েকে বিয়ে করে। রাহেলা সেই মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে উঠতে বাধা দিলে হোসেন আলী রাহেলাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

তিনটি কন্যা সন্তানসহ রাহেলা এ সময়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু অজীবন দুঃখকষ্টে বড় হওয়া রাহেলা অসীম সাহসে বুক বেঁধে নতুনভাবে জীবন শুরু করে। তার কাছে জমানো কিছু টাকা ছিল। সেই টাকা দিয়ে সে প্রথমে এক কাঠা জমি ক্রয় করে। তারপর সেই জমির ওপর চুনের ভাটা তৈরি করে ঝিনুকের চুন প্রস্তুতের কাজ শুরু করে।

রাহেলা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা। বর্তমান তার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। চুন তৈরির ব্যবসা করে আরো দু'কাঠা জমি কিনেছে এবং সেই জমির ওপর তিন খোপ বিশিষ্ট একটি খাড়া টিনের ঘরও করেছে। তার বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। জামাইটি তার বাড়িতেই থাকে। ঘরজামাই। গত বছর দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। জামাইকে যৌতুক দিতে হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। রাহেলার স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে, তাতে তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। চুনের ব্যবসা করে সে এখন বেশ ভালো আছে।

তার কাজের কোনো সময় নেই, খাবারও সময় নেই, বিশ্রামেরও সময় নেই। তারপরও সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজটি করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তার মেজো মেয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে আর ছোট মেয়েটি ২০০৫ সালে জিপিএ ৪.৬২ পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে। সে এখন কলেজে পড়ে।

তবে গবেষণা এলাকার চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের বিষয়টি আলাদা। চুন তৈরির সিংহভাগ কাজ পরিবারের মহিলা সদস্যরাই করে থাকে। এ কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। ভাটায় ঝিনুক পোড়ানো থেকে শুরু করে চুনের ছাই চালা, ছাই নাইন্দে ভিজিয়ে রাখা এবং সেগুলো পা দিয়ে খুঁচে চুন তৈরি করতে কোনো কোনো সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদিন সারারাত কাজ করতে হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তাদের খাওয়া-দাওয়া ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সেরে নিতে হয়। নাইন্দে নেমে পা দিয়ে চুন খোঁচা কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। কারণ এ কাজ করলে হাতে ও পায়ে ঘা হয়ে যায়। তারপরও গবেষণা এলাকার নির্বাচিত মহিলারা কাজটি বিনা দ্বিধায় করে থাকে। কারণ এ কাজের মাধ্যমেই তারা খুঁজে পেয়েছে স্বনির্ভরতা, দুবেলা দুমুঠো খাবারের নিশ্চয়তা এবং ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদি ও অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার খরচের নিরাপদ ভবিষ্যৎ।

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত মহিলাদের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, এখন তারা ইচ্ছে করলেই তাদের পছন্দমতো শাড়ি, ব্লাউজ, জামা-কাপড় এবং ছোটখাটো গহনা পর্যন্ত ক্রয় করতে পারে। শুধু তাই নয়, তাদের বিয়েশাদি বা সংসারের যে কোনো ব্যাপারে তারা স্বাধীন মতামতও ব্যক্ত করতে পারে। আর পরিবারে তাদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্বও দেওয়া হয়। কারণ চুন তৈরির যাবতীয় কাজ মূলত পরিবারের মহিলা সদস্যরাই করে থাকে।

গবেষণা এলাকার চুন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তাদের দৈনন্দিন জীবনধারা সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া গেছে।

- ❖ কাজ করার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই।
- ❖ কাজ করার সময়ে বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই।
- ❖ খাওয়া, গোসল এবং ঘুমানোর নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই।
- ❖ হঠাৎ করে কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ নেই।
- ❖ এ কাজটির জন্য কোনো শ্রমিক পাওয়া যায় না।
- ❖ এ কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এ কাজ করার ফলে হাতে ও পায়ে ঘা হয়।

তবে—

- ❖ এ ব্যবসায় ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।
- ❖ এ ব্যবসায় লাভ অবশ্যম্ভাবী।
- ❖ এ ব্যবসায় মূলধনের পরিমাণ খুবই কম লাগে।
- ❖ চুন তৈরির কাজটি পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতায় সম্পন্ন করা সম্ভব।
- ❖ এ কাজটি করে সচ্ছলভাবে সংসার চালানো সম্ভব।
- ❖ এ কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ পরিবারগুলোর অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম একটি বস্তু হলো পান। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই পানের চাষ হয়ে থাকে। রাজশাহী জেলার বিশেষ করে দুর্গাপুর, বাগমারা ও মোহনপুর উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে পান উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, বন্দর, গঞ্জ, হাট, বাজার এমনকি গ্রাম এলাকার মোড়ে মোড়ে পর্যন্ত খিলি পানের দোকান রয়েছে। এই খিলি পানের দোকান করেই অনেকের সংসার চলে যায়। খিলি পানের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো ঝিনুকের চুন। তাছাড়া এ দেশের অসংখ্য পরিবারের সদস্যের পান খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। অনেক পরিবারে সুদৃশ্য 'পানের বাটা'ও রয়েছে— যেখানে পান, চুন, সুপারি ও অন্যান্য পান-মসলা রাখা হয়। পান বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহি আপ্যায়ন সামগ্রী। পানের সাথে ঝিনুকের চুনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ চুন ছাড়া পান খাওয়া যায় না।

ঝিনুকের চুন মূলত একটি কুটির শিল্পজাত পণ্য। বাংলাদেশের অনেক স্থানেই পারিবারিক পরিসরে ঝিনুকের চুন তৈরি হয়ে থাকে। এই শিল্পের সাথে মহিলারাই বেশি সম্পৃক্ত। এই শিল্পের পরিসর বৃদ্ধি হলে অনেক গ্রামীণ মহিলা উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবে। গ্রামের মহিলারা উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হলে তারা স্বনির্ভর হবে। শুধু তাই নয় এই চুন শিল্পের সম্প্রসারণ গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

চিত্র ১ : ভাটায় ঝিনুক পোড়ানো দৃশ্য

[illegible]

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী*

Abstract: Most of the santal people of Bangladesh are living in the Barind region. Osmotically they entered agricultural life leaveing thier nomad lives. Of late some non-governmental organizations (NGOs) are trying their utmost to empower these santal women through several activities. In this article the author tried to explore the measures taken for the empowerment of santal women by some NGOs in a nutshell.

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক কালের নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, জলাভূমি ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, শিকারের সহজ লভ্যতা প্রভৃতি অনেক পরিভ্রমণশীল আদিম জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে (Majumder, 1943; Allchin, 1968)।

এরূপ ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি প্রাচীন যুগ থেকেই অনেক জনগোষ্ঠীকে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ফলে কালানুক্রমে নানা যাযাবর প্রকৃতির আদিম মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। বহু শতাব্দীব্যাপী বিচিত্র রক্ত ধারার সমন্বয়ে অবশেষে এখানে এক বিশেষ মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে (Maloney, 1977)। এর ফলে এ ভূ-খণ্ডে গড়ে ওঠে প্রাচীন জনপদ। বিশেষভাবে এই ঐতিহাসিক সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে প্রায় এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে বিকশিত হয় স্থায়ী ও সুস্পষ্ট গ্রাম সমাজ তথা সাংস্কৃতিক প্রথা প্রতিষ্ঠান। গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র জীবনধারা। ক্ষুদ্রায়তন হলেও এই ভূ-খণ্ডটি কালক্রমে বহু বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর এক অনুপম আবাস ভূমিতে পরিণত হয়েছে (Paul, 1939; Dani, 1960; Chatterjee, 1970)।

ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপ্রবাহ তথা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে এই ভূ-খণ্ডে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী জন-সমাজের আবির্ভাব ঘটে। তারা নিজ নিজ ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচার শতাব্দীর পর শতাব্দী অনুসরণ করে চলতে থাকে। কিন্তু এ অঞ্চলে সময়ের প্রবাহে বিভিন্ন স্থানের নানা জনগোষ্ঠীর আগমন কমবেশি অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে এখনো বাস করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জাতি গোষ্ঠী (Ethnic group) বা উপজাতি সম্প্রদায় (রায়, ১৯৭০)।

---

* ড. মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

কালক্রমে বহিরাগমন বা অনুপ্রবেশের এ অবিরাম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে বিগত দেড় শতাব্দী কালের মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী তথা স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক উপজাতি বাংলাদেশের উত্তর-উত্তর পশ্চিমের বরেন্দ্র ভূমিতে প্রবেশ করতে থাকে। এদের মধ্যে হো, মুণ্ডা, মালো, মাল-পাহাড়ি, মাহালি, পলিয়া, টোরি, সাওতাঁল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (সাত্তার, ১৯৬৬, আলী, ১৯৮০)। সমতল ও ইষৎ বন্ধুর প্রকৃতির বরেন্দ্র ভূমিতে স্থানীয় দুটি বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমানদের পাশাপাশি উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজেদের স্থায়ী বসতি গড়ে তুললেও তারা (উপজাতি) কেউই তাদের বর্তমান বসতি অঞ্চলের ভূমিজ বা আদি বাসিন্দা নয় (Maloney, 1960, Bessaignet, 1960)। তবে ইতিমধ্যে তারা বাংলাদেশের সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এই উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের সমাজ জীবনে কেবল নবনব বৈচিত্র্য সংযোজন করেনি বরং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। সর্বোপরি এসব উপজাতি নারীর বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতায়নের বিষয়টি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি মাত্রা সংযোজন করেছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে অনেক উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও অন্যান্য উপজাতির তুলনায় সাঁওতালরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ জন্যই আলোচ্য প্রবন্ধে সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো কি ভূমিকা রাখছে, তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মূলত প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data)। আলোচ্য গবেষণাকর্মের জন্য প্রধানত সামাজিক বিজ্ঞানের জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সীমিত অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত দুটি গ্রামের জনসংখ্যা ২৫৭ জন; এর মধ্যে ১৫৬ জন পুরুষ এবং ১৫১ জন নারী। ১৫১ জন নারীর মধ্যে ১৮ বছর এবং তার বেশি বয়স্ক নারীর সংখ্যা ১০৯ জন। আলোচ্য গবেষণার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ণের মাধ্যমে এই ১০৯ জন নারীকে উত্তরদাত্রী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া FGD-এর মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার অন্তর্গত দেওপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের একটি সাঁওতাল পল্লিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক গঠন স্বতন্ত্র ধরনের এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লালচে মাটি ও পাথরের কাঁকড় সমন্বিত উপাদান দ্বারা এ অঞ্চলের ভূমি গঠিত। সমস্ত এলাকা জুড়ে রয়েছে উঁচু নিচু নানা আকৃতির অজস্র টিলা। এ সব টিলার মধ্যবর্তী স্থানসমূহ অগভীর খাদ বা বেসিন আকৃতির। কৃষি ভূমি ধাপে ধাপে (Terraced Land) বেসিনের তলদেশ পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। এ অঞ্চলটি প্রধানত বৃক্ষ-বিরল এবং আবহাওয়া কিছুটা চরমভাবাপন্ন। জানা যায়, বিগত শতাব্দীতেও এই অঞ্চলটি বন জঙ্গলাকীর্ণ ও নানা ধরনের পশু পাখির নির্ভয়ে বিচরণ উপযোগী একটি ভূ-খণ্ড ছিল। সে কারণে তৎকালে মূলত যাযাবর প্রকৃতির ও খাদ্য আহরণ অর্থনীতির ধারক সাঁওতাল প্রভৃতি জনেগোষ্ঠীর কিছু মানুষ এসব এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (Roy,1915)।

কিন্তু কালক্রমে কৃষি ভূমি উদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়ার ফলে এলাকাটি প্রায় বিরান, বৃক্ষ বিরল ভূমিতে পরিণত হয়। যার প্রভাব বসবাসকারী সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। একাধিক বড় বেসিনের

চারপাশে ঘিরে অবস্থিত উঁচু নিচু টিলার উপর গড়ে ওঠেছে এক শতাব্দী প্রাচীন এ জনপদটি। অবলকপুর ডাইংপাড়া ও গনকের ডাইং পাড়া দুটি পাড়া নিয়ে গড়ে উঠেছে এ সাঁওতাল পল্লিটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাড়া বা পাড়হা শব্দটি সাঁওতাল ভাষার একটি শব্দ (Chatterjee, 1970)। এই পাড়া দুটি ঘন বসতিপূর্ণ এবং সবকিছু মিলে একটি আদর্শ উপজাতি পল্লি।

ক্ষমতায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন অর্থ হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাৎপদ অবস্থায় রাখে, তা থেকে উত্তরণ। আর নারী ক্ষমতায়নের আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহ-অবস্থানে, সম-মর্যাদায় নারীর অবস্থান। নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ এই নয় যে, যারা ক্ষমতাসীন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এখানে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে (চৌধুরী, ১৯৯৫)। অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণই ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের নিজেদের জীবন, পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা বোঝায় (আখতার, ১৯৯৫)। Chen (1990) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা চিহ্নিত করেছেন, যেমন–সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক এবং আত্ম উপলব্ধি ক্ষমতায়নের উল্লেখযোগ্য সূচকসমূহ হচ্ছে–সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশ গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা, জন্ম শাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডীর প্রসারতা, আত্ম-মর্যাদা অর্জন, নিজের উত্তরণ ও অবস্থান উপলব্ধি ইত্যাদি (খানম, ২০০৩)। কিন্তু সাঁওতাল সমাজ পুরুষ-শাসিত এবং সমাজের সব রকম সিদ্ধান্ত পুরুষেরাই নিয়ে থাকে। সুতরাং ক্ষমতায়নের উল্লিখিত বেশিরভাগ সূচকই সাঁওতাল নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সাঁওতাল সমাজে নারীর অবস্থান

সাঁওতালদের নিজস্ব সামাজিক-প্রশাসনিক সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনের বিভিন্ন পদগুলো হচ্ছে মাঝি হাড়াম, জগমাঝি, নায়েকি, কুডম নায়েকি, গোডেত, রাইট, ভদ্দরাইট ইত্যাদি। সাঁওতাল সমাজের বিশেষত বয়স্ক, বুদ্ধিমান এবং প্রভাবশালী পুরুষেরাই এই সমস্ত পদের অধিকারী। কোনো নারী, সে যতো বিদ্বানই হোক আর যতো প্রভাবশালীই হোক তাদের সামাজিক সংগঠনের এ সমস্ত পদের কখনোই অধিকারী হতে পারে না। শুধু তাই নয়, তাদের সমাজের নেতৃ-স্থানীয় কোনো পদেরই তারা কখনো আশা করতে পারে না। এটা তাদের সমাজে বিধিসিদ্ধ নয়। সামাজিক বিচার-আচারে উপস্থিত হয়ে তারা সবকিছু অবলোকন করতে পারবে, বাদী বা বিবাদী হলে নিজের বক্তব্যও পেশ করতে পারবে, সাক্ষ্যও দিতে পারবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনোই অংশগ্রহণ করতে পারবে না। উল্লেখ্য, সাঁওতালরা সমাজবদ্ধ ও তাদের সামাজিক-প্রশাসনিক সংগঠনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এরা সমাজের কোনো রায়কে কখনোই অমান্য করে না। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও অনুষ্ঠানে নারীর অবস্থান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

জন্ম : নবজাতক শিশু প্রত্যেক পরিবারের স্নেহ-প্রেমের আকর ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সে কারণেই অনাগত সন্তানের কল্যাণার্থে সন্তান-সম্ভবা রমণীকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের রীতি গড়ে উঠলেও সাঁওতাল সমাজে এ সম্পর্কিত কোনো রীতিই নেই। গবেষণা এলাকায় অবস্থানকালে অবলোকনে দেখা গেছে যে, সন্তান প্রসবকালে গর্ভবতী সাঁওতাল

রমণীর জন্য তারা স্বতন্ত্র কোনো আঁতুর-ঘর নির্মাণ করে না। প্রসবকালে কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীকেও ডাকে না। এ জন্য তাদের সমাজের অভিজ্ঞ মেয়েরাই ধাত্রীর দায়িত্ব পালন করে। প্রসূতির অবস্থা জটিলতর হলে, ডাকা হয় তাদের সমাজের ওঝাকে। ওঝা মন্ত্রপুত, তেল, জল, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতায় তৈরি ওষুধ অথবা ঝাঁড়ফুক, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে প্রসূতিকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। সাধারণত আধুনিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে তারা নারাজ। কারণ যতো না আর্থিক, তার চেয়ে বেশি হলো ওঝার প্রতি তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব। তবে ইদানীং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে প্রসূতির অবস্থাদৃষ্টে অনেকেই নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আধুনিক চিকিৎসার জন্য যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে পরিবারের সকলেই আনন্দিত হয়। ধাত্রী পুত্র সন্তানের নাড়ি কর্তন করে তীর-ধনুকের অগ্রভাগে স্থাপিত লৌহনির্মিত ধারালো অংশ দিয়ে। তাদের বিশ্বাস এতে নবজাতক কর্মজীবনে দক্ষ তীরন্দাজ হবে। অপরদিকে, কন্যা সন্তানের নাড়ি কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় ঝিনুক। তাদের বিশ্বাস, এর ফলে নবজাতক কন্যাটি ভবিষ্যতে ঝিনুক কুড়ানি হবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তাদের সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান জন্ম থেকেই ভিন্নতর এবং তা ভবিষ্যতের লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক শ্রম বিভাজনের তথা ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণার ঈঙ্গিত বহন করে।

আদিবাসী সমাজে দুবার নারীজাতিকে খুবই অপবিত্র মনে করা হয়। প্রথমত, ঋতুকালীন সময়ে, দ্বিতীয়ত, সন্তান প্রসবের পর। ঋতুবতী মেয়েদের জন্য যেমন আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়, সন্তান প্রসবের সময়ও তেমনি তাদের আলাদা ঘরে আবিশ্যকভাবেই থাকতে হয়। বাংলাদেশের আদিবাসীদের বেলায় এই নিয়ম এককালে খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়মে অনেকটা ভাটা পড়েছে। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ফলেই হোক আর দারিদ্র্যের জন্যই হোক, বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসী সমাজ এইসব নারীর জন্য আর আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে না। আবার এই রীতি যে একেবারেই অবলুপ্ত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। আদিবাসী সমাজে গর্ভবতী নারীর স্থান ও মর্যাদা কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেই প্রথমেই বলতে হয়, Life begins with conception and convertion produces pregnoncy (Hoebel, 1958)।

বিবাহ : অধিকাংশ প্রগতিশীল ধর্ম বিবাহকে নর-নারী জীবনের কল্যাণকর কর্ম হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সাঁওতালরা বিবাহকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও বিবাহ ছাড়া এ জীবন যেন তাদের কাছে অকল্পনীয়। স্ত্রী ছাড়া পুরুষের জীবন অপূর্ণ, সংসার অচল, ঘর অন্ধকার—এই হলো তাদের ধারণা। গবেষণা এলাকার সাঁওতাল সমাজে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন দেখা গেছে; ১. ডাঙ্গুয়া বাপ্লা বা আনুষ্ঠানিক বিবাহ, ২. আঙ্গির বা প্রেমঘটিত বিবাহ, ৩. অ-র বা বলপূর্বক বিবাহ, এবং ৪. ইতুত বা কৌশল বিবাহ। সাঁওতাল সমাজে এখনো কনেপণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তবে পণের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বে এই পণের পরিমাণ ছিল ৩, ৫, ৭ বা ১২ টাকা। বর্তমানে এর পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পণের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১২ টাকা। পণ ছাড়াও বরপক্ষ কনে পক্ষকে কিছু উপহার দিয়ে থাকে। যেমন কনের ভাইকে একটা এঁড়ে বাছুর দেওয়া হয়। তাছাড়া সাঁওতালদের বিবাহে বরপক্ষ কনে পক্ষকে অন্যান্য দ্রব্যের সাথে তিনখানা বস্ত্র দান করে। এই বস্ত্র তিনটি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়। প্রথম শাড়িটি দেওয়া হয় কনের মাতামহীকে। একে বলা হয় 'বোঙ্গা শাড়ি'। দ্বিতীয় শাড়িটি দেওয়া হয় কনের মাকে। একে বলা হয় 'মা-শাড়ি'। তৃতীয় শাড়িটি দেওয়া হয় কনের ফুফুকে।

সাঁওতাল সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। সাধারণত কোনো যুবতী বিধবা হলেই একাধিকবার বিবাহ করতে পারে। তাদের সমাজে বিধবাদের 'রাণ্ডি' বলা হয়। তবে বিধবা বিবাহকে তারা সুনজরে দেখে না।

সাঁওতাল সমাজে তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের 'ছাডউই' বলা হয়। সাধারণত চরিত্রহীনা মেয়েদেরই তালাক দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজের চোখে এরা ভালো নয় । সাঁওতাল সমাজের মধ্যে বিবাহ ক্ষেত্রে 'ইতুত বিবাহ' বা জোর-জবরদস্তিমূলক বিবাহের প্রচলন রয়েছে। ইতুত বিবাহে একজন যুবক যখন একজন যুবতীর কপালে জোরপূর্বক সিঁদুর পরিয়ে দেয়, তখন সেই যুবতীর সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না।

সাঁওতাল সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে নারী

সাঁওতাল সমাজে অসংখ্য সামাজিক ও পার্বণিক উৎসব-অনুষ্ঠান রয়েছে। এ সব উৎসবাদির প্রাণ-সম্পদ হলো পান-ভোজন আর নৃত্য-গীত। 'পুষণা' হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের অন্যতম প্রধান উৎসব। পৌষ মাসে নতুন ধান ঘরে আসার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সাঁওতাল সমাজে 'পুষণা' উৎসব আসে ঘটা করে। ঘরে ঘরে পচানি, হাঁড়িয়া তৈরি হতে থাকে।

সাঁওতালদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অভিন্ন সূত্রে গ্রোথিত। তাদের ধর্ম-কর্ম, উৎসব অনুষ্ঠান সব কিছুকেই ঘিরে আছে নৃত্য-গীত। আদিবাসীরা জাত-শিল্পী। আবাল-বৃদ্ধ-বর্ণিতা সবাই গাইতে ও নাচতে জানে বনের মুক্ত বিহঙ্গের মতো। প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িত তাদের শিল্প ও সঙ্গীত জীবন। তারা নাচ-গান করে সামাজিক উৎসবে, বিবাহ অনুষ্ঠানে, তিথি-পর্ব, পূজা-পার্বণে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। নাচ-গান তাদের জাতীয় সংস্কৃতি (আলী, ১৯৮০)। এসব অনুষ্ঠানের পুরোধায় থাকে সাঁওতাল নারীরা। সাঁওতালরা একক সঙ্গীতে যেমন দক্ষ তেমনি কোরাসেও আগ্রহী। কোনো কোনো গান হয় প্রশ্নোত্তর জাতীয়। একদিকে নারী অপর দিকে পুরুষ। গানে ব্যবহৃত হয় সামান্য কিছু বাদ্যযন্ত্র, যা তারা নিজেরাই তৈরি করে।

সাঁওতালদের নাচও হয় বিভিন্ন প্রকারের। যেমন: লাগারেঞ দোন, ঝিকা, জাতুর, রিংশ, ডান্টা, দাহার ও বাহা। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢাক, ঢোল, বাঁশি, সিঙ্গা, মাদল ইত্যাদি। বাদ্যকররা মাঝখানে বসে অথবা যে কোনো একদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে বাদ্য বাজায় আর দলবদ্ধ হয়ে সাঁওতাল নারীরা নাচে গানে পরিবেশ মুখরিত করে তোলে।

সাঁওতাল রমণীর যৌনজীবন

আদিবাসী সমাজে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মেলামেশার কেন্দ্রস্থল 'আড্ডাঘর' নামে খ্যাত। এই 'আড্ডাঘর' নির্মিত হয় গ্রামের প্রান্তসীমায়, লোকালয় থেকে দূরে, মুরুব্বিদের দৃষ্টির বাইরে। আদিম সমাজের যৌনজীবন কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, হাসি-ঠাট্টা, নৃত্য-গীত, প্রেম-কৌতুক প্রভৃতি আনন্দ-স্ফূর্তিব্যঞ্জক ক্রিয়া-কর্ম ছাড়াও এ সব আড্ডাঘরে অনেক সময়ে সামাজিক জীবনের যাবতীয় কর্ম এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বিভিন্ন আদিবাসীর আড্ডাঘরের নামও বিভিন্ন। বাংলাদেশের ওরাওঁ সমাজের আড্ডাঘরের নাম 'ধুলকুরিয়া'। ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা টাবু অনুসারে ওরাওঁ যুবতীদের ধুমকুরিয়ায় যেতে দেওয়া হয় না। তবে অবিবাহিতা যুবতীদের জন্য আলাদা ধুমকুরিয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের ভাষায় একে 'পেল-এরপা' বলা হয়। পেল-এরপায় এসে যুবতীরা হাসি-ঠাট্টা এবং চিত্তবিনোদমূলক ক্রিয়াকর্মে সময় অতিবাহিত করে।

ধুমকুরিয়া এবং পেল-এরপা নির্মিত হয় বেশ দূরত্ব বজায় রেখে। পেল-এরপায় একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠা মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা থাকে। তাদের ভাষায় তাকে 'বরবা-ধাংগরীন' বলা হয়। তার প্রধান কাজ, যুবতী মেয়েদের কাজকর্ম এবং গতিবিধির ওপর নজর রাখা। যুবতী মেয়েরা 'পেল-এরপা'তে এসে কৌতুকাভিনয় করেই চলে যায়। তবে অনেকের অভিমত, বর্ষীয়সী বিধবা মহিলাদেরকে অনেক সময় 'পেল-এরপা'তে রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ কম, এবং সেখানে কোনো অন্যায় আচরণ কিংবা শ্লীলতাহানি ঘটলে তা তারা গ্রাম্য প্রধানদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। উল্লেখ্য, ঋতুবতী ওরাওঁ যুবতীরা ধুমকুরিয়া অথবা পেল-এরপা'তে যেতে পারে না। তাছাড়া ঋতুবতী রমণীদের নৃত্য-গীত কিংবা ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ ।

সাঁওতালদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুরূপ আড্ডাঘর 'আখাড়া' নামে পরিচিত। সাঁওতাল যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্মেলনের কেন্দ্রস্থল 'আখাড়া'। এখানে তারা সমবেত হয়ে গান-বাজনা শেখে, নাচের মহড়া দেয়, এমন কি ধর্মীয় শিক্ষাও গ্রহণ করে। সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা আখাড়ায় এসে প্রেমালাপ ও হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাদের যৌন মিলনের স্থান আখাড়া নয়–গহীন অরণ্য। এই সুযোগ তারা পেয়ে থাকে 'সাগরেম' নৃত্য শেষে। 'সাগরেম' নৃত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যুবক-যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে যখন পরিশ্রান্ত হয়, তখন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে তারা জোড়ায় জোড়ায় গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে এবং যৌন-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে (সাত্তার, ১৯৭৮)। গবেষণা এলাকায় 'ধুমকুরিয়া' পেল-এরপা' এবং 'আখাড়া'র অস্তিত্ব থাকলেও এগুলো যুবক-যুবতীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকার করে না। গবেষণা এলাকার মাঝি-মোড়লেরা সমাজের যৌনাচার সম্পর্কে একেবারেই অন্য রকম কথা বলেছে। তাদের মতে, আদিবাসী সমাজে অবাধ যৌনাচার বলে কিছু নেই। যা আছে তা সমাজ-স্বীকৃত। তাদের সমাজে নারী ধর্ষণ নেই। আদিতে আদিবাসী সমাজের নারীরা প্রায় অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় চলাচল করতো। কিন্তু তারপরও কোনো আদিবাসী যুবক কখনোই কোনো নারীর সাথে জোরপূর্বক যৌনক্রিয়া করে না। যা হয়, তা উভয়ের সম্মতিক্রমে। তাদের ভাষায়, একে যৌনাচার বলা যায় না।

গবেষণা এলাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন দম্পত্তির সাথে আলাপকালে জানা গেছে যে, তাদের সমাজ গর্ভবতী নারীর সঙ্গে যৌন-ক্রিয়া অনুমোদন করে না। তাদের ধারণা, এতে সন্তান পঙ্গু হতে পারে, গর্ভপাত হতে পারে এমনকি প্রসবকালে প্রসূতির কষ্টও হতে পারে। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দম্পত্তি ও যুবসমাজ এখন আর এসব মানে না।

পারিবারিক সংগঠন ও ক্ষমতার ব্যবহার

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত লোক বিশ্বাসের পটভূমিতে সাঁওতালদের চিরায়ত জীবনধারাকে অনেকখানি উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করা যায়। 'পরিবার' হচ্ছে একটি প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার গঠনের জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই সাঁওতাল পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে। তারা পারিবারিক জীবনে সংঘবদ্ধ ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যস্ত। সাঁওতালরা স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি ও নিকটতম রক্ত সম্পর্কের লোকদের নিয়ে পরিবার গঠন করে থাকে। তারা বহুলাংশে পরিবারের মাধ্যমেই নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। সাঁওতাল পরিবার পিতৃতান্ত্রিক

(Patrilineal) ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে (আলী ১৯৮০)। পারিবারিক জীবনে মহিলাদের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। গবেষণা এলাকায় একক বা অনু পরিবার ও যৌথ পরিবার-উভয় ধরনের পরিবারই দেখতে পাওয়া যায়। পারিবারিক জীবনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাঁওতাল মহিলারা গৃহ অভ্যন্তরস্থ কাজ করার পাশাপাশি মাঠেও পুরুষদের মতো কাজ করে থাকে। মাটিকাটা, জমি পরিষ্কার করা, জমিতে চারা লাগানো, ফসল নিড়ানো, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই ও মাড়াইকৃত ফসল প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এছাড়াও মহিলারা বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গমন করে থাকে। গবেষণাধীন সাঁওতাল পল্লির কিছু কিছু মহিলা বর্তমানে অকৃষি কাজ বা পেশার সাথেও জড়িত রয়েছে। যেমন—রাস্তায় মাটি কাটা, নির্মাণ শ্রমিক (দালান কোঠা নির্মাণের কাজে যোগনদার হিসেবে কাজ করে), নিকটবর্তী শহরে নর্দমা পরিষ্কার, বিভিন্ন সংস্থা ও কারখানার শ্রমিক হিসেবেও অনেকে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ নারীর কাজের ধরন বা প্রকৃতি অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিবর্তন তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলছে।

সন্তানরা পারিবারিক কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করে থাকে। হালকা ধরনের কৃষিকাজসমূহ বেশির ভাগই কিশোরীরা করে থাকে। কিশোরীরা গৃহের কাজের পাশাপাশি মা ও মাতৃস্থানীয় মহিলাদেরকে মাঠের কাজে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া গবাদি পশু মাঠে চরানো ও দেখাশুনা করা, হাঁস মুরগির জন্য শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করা, খালে-বিলে মাছ ধরা, রান্নার জন্য শুকনো লতা-পাতা-ঘুঁটে (শুকনো গোবর) ও জ্বালানির জন্য লাকড়ি সংগ্রহের মতো জরুরি কাজ তারা করে থাকে। চিরায়তভাবে সাঁওতালদের পারিবারিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা চলে পরিবার একদিকে যেমন অর্থনৈতিক একক, তেমনি সামাজিক এককও বটে। পরিবারসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা, সহমর্মিতা ও চিরকালীন সংহতিবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে সমাজ অভ্যন্তরস্থ অন্তঃসম্পর্ক (Intra-community relationship)।

সাঁওতালরা আধা যাযাবর এবং আধা-স্থায়ী অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনের অনুকূলে প্রকৃতি নির্ভর সমাজ সংগঠন নির্মাণ করছে। সাঁওতালদের চিরায়ত সমাজ দর্শন ও রাজনৈতিক আচরণের কেন্দ্রীয় প্রপঞ্চ হলো টোটেম বিশ্বাস। এ টোটেম ভিত্তিক সমাজ বিন্যাস যুগপৎ সমাজকে বিভাজন ও সংহত করেছে। সাঁওতাল সমাজ পৃথিবীর আরো অজস্র আদিম বা উপজাতি সমাজের মতোই স্থানীয়ভাবে সংগঠিত জীবনযাপন করে। এ সমাজে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের (Central authority) অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। তবে পাশাপাশি বসবাসকারী সাঁওতাল গোষ্ঠী বা পাড়াসমূহের মধ্যে এক ধরনের শিথিল সংঘবদ্ধতা (Losse confederation) বরাবরই থেকেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দিকে এসে তাদের প্রথাগত অরণ্য জীবনধারায় বাইরের জগতের প্রভাব পড়তে শুরু করে। ইতিপূর্বে তারা ক্রমশ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে গড়ে তুলতে থাকে স্থায়ী কৃষি নির্ভর জীবন ব্যবস্থা। তাদের ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারণা সাংস্কৃতিক উপাদান ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ পূর্ববৎ টিকে থাকে। এই পটভূমিতেই তারা মুখোমুখি হয় ভিন্নতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সাথে।

সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

গবেষণাধীন এলাকায় বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিও'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। যেহেতু জনগোষ্ঠীটি দরিদ্র তাই তারা বিভিন্ন সাহায্যদাতা সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক

সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণের চেষ্টা করে থাকে। যদিও উপজাতিদের সমস্যার কোনো শেষ নেই, তথাপি এনজিও'র উপস্থিতি এই দরিদ্র জনগোষ্ঠিটিকে যৎসমান্য পরিমাণ হলেও সচ্ছলতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষদের চাইতে নারীরা বেশি অগ্রসর। কারণ এখনো তাড়ি, মদ ও চুয়ানির আশায় পুরুষরা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের কাছে সব বিলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এনজিওগুলো তাদের সাহায্যে সহযোগিতা করতে আসায় উপজাতি নারীরা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়েছে।

এসব নারী পুরুষের নিকট থেকে এনজিও'দের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিচিত্র ধরনের তথ্য জানা যায়। সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নে এসব এনজিও কিভাবে সহযোগিতা করছে তা জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া নারীর আয় বৃদ্ধি, লিঙ্গ সচেতনতা, মানবাধিকার, আইনি সহায়তা, জনমত তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে এনজিও সহযোগিতা করছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নারীর ক্ষমতায়ন খুব জরুরি। এনজিওগুলোর সহায়তায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীরা (হিন্দু-মুসলমান) বিভিন্নভাবে ক্ষমতা লাভ করছে। তারা লেখাপড়া, চাকরি, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নানা স্তরে নিজেদেরকে ক্ষমতাবান করে তুলছে। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করছে। সাঁওতাল নারীরা এ বৃহত্তর নারী সমাজের একটি অংশ হলেও তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠী। আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত, অন্তর্মুখিনতা ইত্যাদি কারণে তারা অনগ্রসর। একাধিক কারণে এনজিওগুলো উদ্যোগ নিয়েছে যে, পিছিয়ে পড়া এ সাঁওতাল নারীদের অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা এবং আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করা। এর ফলে যৎসামান্য হলেও সাঁওতাল নারীরা ক্ষমতা লাভ করবে। উল্লেখ্য, সাঁওতাল নারীদের অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষমতা অনুশীলন, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করার মতো পরিবেশ তৈরি করাও এনজিওগুলোর ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিভাষাটি বিশেষভাবে চালু হওয়ায় এনজিওগুলো সাঁওতাল নারীদের মধ্যে তা বাস্তবায়িত করার জন্য নানাভাবে কাজ করছে। জাতিসংঘ 'সনদ' নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে (Akter, 1996)। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এনজিওগুলো সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই অনুচ্ছেদটি দুইটি অংশে বিভক্ত করে প্রথম অংশে এনজিওসমূহের সাঁওতালদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হবে এবং দ্বিতীয় অংশে সাঁওতাল নারীদের জীবনযাত্রার ওপর এইসব কার্যক্রমের প্রভাব অনুধাবনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

আলোচ্য গবেষণাধীন সাঁওতাল পল্লিতে যেসব এনজিও, সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে তন্মধ্যে কারিতাস, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, কেয়ার, এসিডি অন্যতম। এসব এনজিওগুলো সাঁওতাল নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও উপার্জনমুখী বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নিম্নে তাদের কার্যক্রমের ওপর সম্যক অলোকপাত করা হলো:

কারিতাস

'কারিতাস' একটি সেচ্ছামূলক সংস্থা। আড়াই দশকের অধিককাল যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারিতাস নানান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজশাহী অঞ্চলে কারিতাস যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা মূলত The Social Integration of Adibashi বা

SINA নামে পরিচিত। আলোচ্য পল্লিটিও সিনার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। SINA ছাড়াও কারিতাসের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে মহিলা সমিতি, জীন সমিতি এবং কারিতাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে রক্ষা গোলা। এই কর্মসূচিগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

মহিলা সমিতি

মহিলা সমিতি কারিতাসের একটি অঙ্গ সংগঠন। ইহার প্রধান কাজ সমিতির সদস্যদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করে তোলা। এটি একটি মুনাফা ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংগঠন। পাড়ার কতিপয় সাঁওতাল গৃহিণী মিলে এ মহিলা সমিতি গঠন করে। এ সংগঠনটিও সরকারি সাহায্য দাতাসংস্থাসহ বাইরের অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উপার্জনমুখী খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এ সবের মধ্যে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন-পালন অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য, এ সব সমিতির নেতৃত্বে রয়েছে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল গৃহবধূরা। তারা নিয়মিত মিশনারির কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা মিশনারির লোকদের (Father) নিকট পরামর্শ নিয়ে কাজ করে থাকে। সাঁওতালদের চিরায়ত নেতৃত্বের ধারা পুরুষের হাত থেকে ধীরে ধীরে নারীর হাতে হস্তান্তর হচ্ছে এবং এভাবে নারীরা ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে।

জীন সমিতি

কর্মক্ষম সাঁওতাল তরুণী এবং মহিলাদের নিয়ে 'জীন' সমিতি গঠিত। বস্তুতপক্ষে এটি এক ধরনের কৃষি শ্রমিক সংগঠন। ধান কাটার মৌসুমে অনেক কুমারী তরুণী ও গৃহবধূ চুক্তিভিত্তিক ধান কাটা ও মাড়াই-এর জন্য জীন সমিতি গঠন করে থাকে। এভাবে সংগঠিত হয়ে কাজ করলে অল্প সময়ে অধিক পারিশ্রমিক পাওয়া সম্ভব। প্রাপ্ত সমগ্র মজুরির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ তারা আলাদা করে রাখে। যে কোনো সদস্যের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনের সময় ঐ জমাকৃত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

সিনা

The Social Integration of Adivashi-কে সংক্ষেপে SINA বলা হয়ে থাকে। বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা কারিতাসের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে অনেক সাঁওতাল পল্লিতে গড়ে উঠেছে সিনা। মূলত দরিদ্র উপজাতি নারীদের বিশেষভাবে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল নারীদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করাই এর উদ্দেশ্য। এ সংগঠনটির নেতৃত্বে থাকেন এলাকার খ্রিস্টান যুবকরা, কেননা মূল অর্থ জোগানদাতা সিনা নারীদের সাথে তাদেরই যোগাযোগ বেশি।

সিনার কর্মসূচি

ক. গ্রাম্য মহাজন বা টাকা দাদনকারীদের হাত থেকে উপজাতিদের (বিশেষ করে নারীদের) রক্ষা করা।

খ. নারীদের নিজস্ব আয় থেকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা।

গ. নারীদের বয়স্ক শিক্ষা চালু করে নিরক্ষরতা দূরা করা এবং আত্মসচেতন করে তোলা।

ঘ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন ও সামাজিক দিক থেকে সংগঠিত করা (KARITAS Yearly Report, 1978 : 2)।

রক্ষাগোলা

খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং শস্য ঋণ প্রদান করাই রক্ষা গোলার লক্ষ। পড়ার যে সমস্ত নারী-পুরুষ রক্ষা গোলার সদস্য হয়ে থাকেন তারা প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য (ধান, গম, ডাল) একটি সাধারণ গুদামে (Community Godown) মজুদ রাখে। এ গুদামে যে পরিমাণ শস্য জমা হবে তার সমপরিমাণ শস্য কারিতাস অনুদান হিসেবে উক্ত গুদামে প্রদান করে থাকে। রক্ষা গোলার সদস্যগণ নিজে অথবা অন্য কোন উপজাতি ব্যক্তি তার খাদ্যের অভাব অনটন বা আর্থিক সংকটের সময় রক্ষাগোলা থেকে বাকিতে মজুদকৃত দ্রব্য ধার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। পরবর্তী ফসল কাটার মৌসুমে ধার গ্রহীতারা দেড়গুণ পরিমাণ শস্য রক্ষা গোলায় জমা দিবে। এখানে উল্লেখ্য, সাহায্যদাতা সংস্থা সাময়িক অনুদান হিসেবে প্রদত্ত শস্যের কেবল প্রকৃত মূল্য গ্রহণ করবে কিন্তু এই শস্য থেকে যে পরিমাণ বাড়তি শস্য রক্ষা গোলায় সঞ্চিত হয় তা গ্রহণ করে না অর্থাৎ লভ্যাংশ রক্ষাগোলার সদস্যদের জন্য থাকে। এভাবে সাঁওতাল নারীরা অভাবের সময়ে রক্ষাগোলা থেকে ধার নিয়ে অভাব মেটায় এবং যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করে সবাই আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

কেয়ার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা 'কেয়ার' সম্প্রতি এ পাড়ায় কয়েকটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে পুরাতন রাস্তা মেরামতসহ নতুন রাস্তা তৈরি করা অন্যতম। কেয়ার কর্মকর্তাদের অবাধ ও ঘনঘন আগমন একদিকে তারা যেমন—এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর নিজেরদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে তাদের আশ্রয়ে সাঁওতাল নারীরাও পরিবার এবং সমাজে কর্তৃত্ব করার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছে। কেয়ার এসব কর্মরত নারীদের সামান্য বেতন প্রদান করে থাকে। কর্মক্ষম নারীরা সামান্য টাকা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উপার্জন করলেও পরিবার ও সমাজে একজন উপার্জনশীল ও সাবলম্বী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে পরিবারে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নারীরা সমাজের নানা বিষয়ে (দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সালিস, সমঝোতা) মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, তাদের বিভিন্ন পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে কেয়ার কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক

নিভৃত সাঁওতাল পল্লিতে উন্নয়ন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ব্র্যাক' বিগত ১৫/১৬ বছর আগে থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গবেষণাধীন এলাকার রাস্তা ও রাস্তার পাশে খাস জমি, কবরস্থান, পুকুরপাড়ের পতিত জায়গায় তুঁত গাছসহ বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা রোপণ করেছে। এসব গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ব্র্যাক সাঁওতাল নারীদেরকে মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ব্র্যাক কর্মকর্তাগণ পুরুষদের চেয়ে নারীদের বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ মহিলাদের কম মজুরি দিতে হয়। উপরন্তু, বেশি কাজ করে নেওয়া যায়।

আনন্দস্কুল

গবেষণাধীন এলাকার যে সব কিশোর-কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি, তাদের লেখা-পড়ার জন্য বেসরকারি সংস্থার (ব্র্যাক, এসিডি ও প্রশিকা) উদ্যোগে 'আনন্দস্কুল' স্থাপন করা হয়েছে। আনন্দস্কুল কর্মসূচি এনজিওগুলোর একটি নতুন প্রকল্প। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ার উপকরণ এবং পোশাক পরিচ্ছদ এসব সংস্থা দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, যে সব সাঁওতাল মহিলারা

লেখাপড়া জানে তারা এখানে শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছে)। এ স্কুলের শিক্ষকদের বেতন/ভাতা বেসরকারি সংস্থা প্রদান করে থাকে। আনন্দস্কুল স্থাপনের ফলে একদিকে শিক্ষা বঞ্চিত ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে, অপর দিকে মহিলারাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গবেষণাধীন এলাকার সাঁওতাল নারীদের সমন্বয়ে (১০/১৫ জন) গ্রামীণ ব্যাংক ছোট ছোট সমিতি গঠন করেছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এ ব্যাংক সমিতির সদস্যদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। একান্ত আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা যায় যে, যদিও ঋণের ৩৫% অর্থ সমিতির সদস্যদের। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণের টাকা আদায় ও নতুন ঋণ প্রদানের জন্য সাঁওতাল মহিলাদেরকে মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োগ দান করেছে। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও আর্থিকভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি মোবাইল ফোনের ব্যবসার বেশ প্রসার ঘটেছে। অত্র সাঁওতাল পল্লিটিতেও বেশ রমরমাভাবে জমে উঠেছে মোবাইল ফোনের ব্যবসা। 'গ্রামীণ ব্যাংক' সমিতির মাধ্যমে এ পাড়ার একাধিক মহিলাকে মোবাইল ফোন ঋণ দিয়েছে। এ দিয়ে সমিতির সদস্যরা বেশ অর্থ উপার্জন করছে। তারা ঋণের টাকা কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকে। ব্যবসার লভ্যাংশ সমিতির মহিলাদেরকে (সদস্য) আর্থিকভাবে সাবলম্বী করে তুলছে।

সাঁওতাল নারীদের জীবনযাত্রায় এনজিও কার্যক্রমের ভূমিকা

এখন দেখা যাক এই কর্মসূচিসমূহ সাঁওতাল নারীদের জীবনে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে:

- ***অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ :*** কেয়ার এবং ব্র্যাক-এর রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তুত গাছ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিক সাঁতাল নারীরা এবং আনন্দ স্কুলের শিক্ষক সাঁওতাল নারীরা মজুরি ও বেতন গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছেন। এ ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের মোবাইল ফোন-এর ঋণ গ্রহিতা নারীরা মোবাইল ফোনের ব্যবসার মাধ্যমে এবং মহিলা সমিতির সদস্য সাঁওতাল নারীরা হাঁস-মুরগি ও পশু পালন কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক লেনদেনে সম্পৃক্ত হচ্ছেন, যা ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য সূচক।

- ***পারিবারিক অর্থনীতিতে অবদান :*** মজুরি, বেতন, ব্যবসা এবং আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও সাঁওতাল নারীরা 'রক্ষা গোলার' মাধ্যমে আপৎকালীন সময়ে পারিবারিক খাদ্য সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখেন, যা পরিবারে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে।

- ***পুঁজি গঠন :*** 'সিনা' সাঁওতাল নারীদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এই অঙ্গ সংস্থাটি সাঁওতাল নারীদেরকে দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ থেকে রক্ষা করে নিজেরা ঋণ প্রদান করে, যা পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক এদেরও ঋণ প্রদান কর্মসূচি রয়েছে।

- ***সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা :*** পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাঁওতাল নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত সন্তানের শিক্ষা, বিবাহ, চিকিৎসা এবং নিজের প্রজনন নিয়ন্ত্রণের

ব্যাপারে তারা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা অর্জন করেছে, এ সবই সম্ভব হয়েছে এনজিওসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রমের ফলে।

- *শিক্ষা অর্জন :* শিশুদের জন্য ব্র্যাক স্কুল এবং আনন্দ স্কুল ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে সাঁওতাল নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে শিক্ষা তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

- *স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা :* এনজিওসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচারণা কার্যক্রম এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে এখন অনেক সাঁওতালদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খান ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। এখন তাদের অনেকেই ওঝা বা কবিরাজের পরিবর্তে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে। সাঁওতাল নারীদের অনেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক সামগ্রী ব্যবহার করে।

- *বিচরণের গণ্ডীর প্রসারতা :* সাঁওতাল নারীদের বিচরণের গণ্ডী পূর্বে গৃহ এবং মাঠ-ঘাট, নদী-পুকুর ও বনাঞ্চলেন মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এনজিও অফিস, স্কুল ব্যাংক, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, সালিস কেন্দ্র প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যাতায়াত করে, যা তাদেরক নিজ অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

উপজাতি সাঁওতাল নারীরা বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে অর্থ উপার্জনের পথ আবিষ্কার করে যেমন একদিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে, তেমনি তারা এসব সংস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবেও বেশ সচেতন হচ্ছে। নিকট অতীতেও পুরুষরা কেবল রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করত তথা ভোট দেওয়া নেওয়া ইত্যাদি কাজ সবই ছিল পুরুষদের। বর্তমানে উপজাতি নারীরা ভোট প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। নির্বাচন এলে তারা নিজেদের নাম ভোটারলিস্টে তালিকাভুক্ত করা, প্রার্থী হওয়া, স্বপক্ষের প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালানোসহ অনেক ধরনের কাজ করে থাকে। তারা বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। অত্র এলাকার সাঁওতাল মহিলা সমিরন হাঁসদা তার নিজ ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাঁওতাল নারীরা ইদানীংকালে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। এসব সম্ভব হয়েছে একমাত্র বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিওগুলোর নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা। এক সময়ে নারীরা তাদের স্বামী কিংবা পাড়ার মোড়লের কথায় ভোট দিত। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয় নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। যা তাদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের সাহায্য করছে।

গবেষণা এলাকার সমাজপতি মাঝি-মোড়লদের সাথে সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, সাঁওতাল সমাজ মূলত চিরায়ত সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোয় নিয়ন্ত্রিত। এই সমাজ-কাঠামোর প্রতিটি স্তরের প্রধানই পুরুষ। এখানে সাঁওতাল নারীর অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই নেই। তবে ইদানীং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মতামতের বেশ মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষত পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষিতা এবং বয়স্কা

নারীদের মতামতকে যথেষ্টই মূল্যায়ন করা হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান, সাঁওতাল নারীরা তাদের দিনমজুরির অর্থ যে নিজের ইচ্ছেমতো একেবারেই খরচ করতে পারে না, তা ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তাদের উপার্জিত অর্থ খরচ করে থাকে। আর যৌন সম্পর্কতি বিষয়টি তাদের একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর একটি বিষয়, সাঁওতাল নারীরা সমাজের কোনো নেতৃস্থানীয় পদে থাকতে পারে না ঠিকই, কিন্তু সামাজিক বিচার-আচারে সমাজের অন্যান্য সদস্যের মতো দর্শক-শ্রোতা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওগুলোর সম্পৃক্ততার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন—সাঁওতাল নারী এখন যথেষ্ট স্বাস্থ্য সচেতন, তাদের অনেকের বাড়িতেই এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে, অসুখ-বিসুখে তারা এখন 'ওঝা' বা 'কবিরাজ'-এর পরিবর্তে আধুনিক চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায়। যদিও পূর্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তারা এক ধরনের ভেষজ ওষধি ব্যবহার করতো, কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

সাঁওতাল নারীরা এনজিওগুলোর নিকট থেকে যে প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, সে খাতে গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যয় না করে দৈনন্দিন চাহিদা পুরণ করে এবং দিন মজুরি করে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করে থাকে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশের কোনো সম্প্রদায়ের নারীরই সার্বিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে বলে মনে হয় না। আর সাঁওতাল সমাজ তো চিরায়ত সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোয় আবদ্ধ। এখানে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়। তারপরও সাঁওতাল সমাজের নারীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে তাদের ধারণা।

উপসংহার

আলোচ্য সাঁওতাল পল্লিটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, সাঁওতাল নারীরা অতীতের ন্যায় কেবল মাত্র ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ নেই। অতীতের অন্তর্মুখিনতা অতিক্রম করে তারা আজ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তৎপর। এজন্য তারা সংগঠিত হচ্ছে। সেই সাথে পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল নারী স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর, যা নিকট অতীতেও উপজাতি সাঁওতাল নারীদের মধ্যে ছিল না। দেখা যাচ্ছে যে, সাঁওতাল নারীরা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা লাভ করছে। গোটা বিশ্বের বৃহত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সাঁওতাল উপজাতি নারীরাও ক্ষমতাবান হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিওর ভূমিকা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আগামী নতুন শতাব্দীতে এই সাঁওতাল নারীরা আরো বেশি করে নিজেদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান করে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এটাই প্রত্যাশা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আলী, মেহেরাব (১৯৮০) *দিনাজপুরের আদিবাসী*। দিনাজপুর: আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমী, ।

আখতার, তাহমিনা (১৯৯৫), *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*,ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খানম, সুলতানা মোসতাফা (২০০৩) "বাংলাদেশে নারী -উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : মীথ এবং বাস্তবতা" সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) *নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ্ ও এস. রশীদ (১৯৯৫) *নৃবিজ্ঞান: উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, নাজমা ও আখতার, বেগম হামিদা (১৯৯৫) *ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন।

তপন, শাহজাহান (১৯৮৭) *অ্যাসাইনমেন্ট ও থিসিস লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*। ঢাকা ।

রায়, নীহার রঞ্জন (১৯৭০) *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*। কলিকাতা: লেখক সমবায় সমিতি ।

রুপাই বাগসী (সাক্ষাৎকার দাতা) একজন প্রবীণ সাঁওতাল নেতা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সাত্তার, আবদুস (১৯৭৮), *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সাত্তার, আব্দুস (১৯৬৬) *আরণ্য জনপদে*। ঢাকা: জলি বুকস।

Ali, Ahshan (1989) *Social Change among the Snatals of Bangladesh: A Study of Cultural Isolation*. Calcutta.

Allchin, B and Raymond Allchin (1968) *The Birth of Indian Civilization*. Baltimor.

Aiyappan. "A Some Patterns of Tribal Leadership". *The Economic and Political Weekly*. Vol. II, Nos. 1-2. J, Troisi (ed.). *The Santals: Reading in Tribal Life*. Vol. V. Colcutta: Indian Social Institute, 1997.

Bailey, F.G. (1960) *Tribe Cast and Nation*. Bombay: Oxford University Press.

Bessaignet, P. (1960) *Tribes of Northern District of East Pakistan*. Dacca: Social Research in Pakistan Asiatic Society.

Chatterjee, S.K. (1970) *Originand Development of Bangali Language*. London.

Caritas Yearly Report (1978) Rajshahi.

Dani, A.H. (1960) *Prehistory and Protohistory of Eastern India*. Culcatta.

Dalton, E.T. (1973) *Tribal History of Eastern India*. Delhi: Cosmo Publisher.

Majumder, R.C. (1943) *The History of Bengal*. Vol. I. Dacca University Press.

Maloney, C. "Bangladesh and Its People in Prehistory". *IBS Journal*, Vol. II, Rajshahi: Rajshahi University, 1977.

Karl, M. (1995) *Women and Empowerment- Participation and Decision Making*, London: Zed Books Ltd.

Hoebel, E. A. (1958) *A Man in the Primitive World*. London : 1958.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজের পরিবর্তমান পরিবার কাঠামো : একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাহ্‌নাজ সুলতানা*

Abstract: Mainly 89.02% single, 8.54% joint and 2.44% Ghardi Jawai types of family have been identified within the studied 164 family of Santal community from four villages of Niamatpur upazilla, Naogaon district. In the research area, about 84.76% Santals includes in nuclear family. Within nuclear family there is single member, sub-nuclear and supplementary nuclear families but joint family is only lineal joint type family. It is observed that political, social, cultural, economic, changing land ownership, modernization, personal rituals and belief are responsible for transforming joint family into nuclear family. Family patterns in this area are deeply influenced mainly by economic factors.

ভূমিকা

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহে পর্যুদস্ত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাস্তুত্যাগী হয়ে নিরাপদ জীবন ও জীবিকার সন্ধানে সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গসহ আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল (Hunter, 1876:VII; রায়, ১৯৭২; Mallick, 1993:133-138; সিদ্দিকী, ১৯৯৮:১৪০-১৪১)। তখন থেকেই নওগাঁসহ বরেন্দ্র এলাকায় সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্যতম প্রধান নৃগোষ্ঠী হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে আসছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের বর্তমান সাঁওতাল সম্প্রদায় সেইসকল সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর তৃতীয় অথবা চতুর্থ অধস্তন পুরুষ (আহমেদ, ১৯৯৮:১৩; শিলু, ১৯৯৮:১৬; সিদ্দিকী, ১৯৯৮:৫৫)। সাঁওতাল সম্প্রদায় অতি প্রাচীন স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও স্বতন্ত্র চিরায়ত জীবন ব্যবস্থার অধিকারী যা তারা এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও বহুলাংশে বজায় রেখেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বহুবার প্রতারিত ও জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হলেও চিরসঙ্গী ছিল তাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং ঐতিহ্যবাহী চিরায়ত সাংস্কৃতিক ধারা ও বর্ণিল জীবনধারা যা থেকে তারা পূর্বে কখনও বিচ্যুত হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন ও প্রসারতা, সরকারি ও বেসরকারি নানা সংস্থার

* প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, খাদেমুল ইসলাম বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা ও স্বনির্ভরতা সম্পর্কিত উন্নয়ন এবং ধর্মীয় কার্যক্রম সাঁওতালদের সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন যাপন প্রণালীসহ সামাজিক ব্যবস্থা এমনকি পারিবারিক কাঠামো ও প্রকৃতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে (Datta-Majumder, 1956; Mukherjee, 1962; Das Gupta, 1964:71-81; Orans, 1965; Sinha, 1967; Kochar, 1970; Hossain and Sadeque, 1984; সিদ্দিকী, ১৯৯৮; Ali, 1998; জলিল, ১৯৯১; কায়েস, ১৯৯৫; Hossain, 2000; Karim, 2000; কামাল, চক্রবর্তী এবং নাসরীন, ২০০১)। আলোচ্য প্রবন্ধে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৪টি গ্রামের সাঁওতাল সমাজের মূলত পারিবারিক কাঠামো ও প্রকৃতি এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র ও তথ্যের উৎস

নিয়ামতপুর উপজেলা নওগাঁ জেলা সদর হতে ৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এই উপজেলার আয়তন ৪৪৯.১০ বর্গকিলোমিটার। নিয়ামতপুর উপজেলা ২৪°৪১′-২৪°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৩′-৮৮°৪০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত (চিত্র ১)। মোট ৮টি ইউনিয়ন, ৩২১টি মৌজা এবং ৩২৬টি গ্রাম নিয়ে এই উপজেলা গঠিত। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাধীন সাংশৈল, বিজলী, চকপাচড়া ও ভালাতৈড় এই ৪টি গ্রামকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে (চিত্র ১)।

গবেষণাধীন গ্রামসমূহে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং কারণসমূহ বিশ্লেষণের জন্য নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহ, প্রধানত সরেজমিন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও

চিত্র ১ : গবেষণা এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান

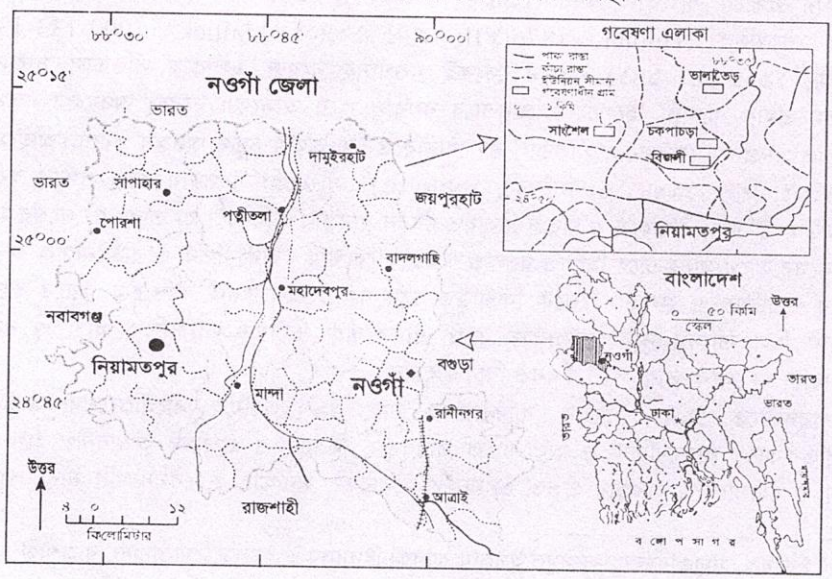

গবেষণার অভীষ্ট লক্ষ্যে সফলভাবে পৌছানোর জন্য সামাজিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, কেস স্টাডি, জরিপ পদ্ধতি ইত্যাদির সহায়তা প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় মূলত প্রাথমিক তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে যা এপ্রিল ২০০০ হতে জুলাই ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্য পূণরায় যাচাইকরণের জন্য গবেষণা এলাকায় বারংবার যাতায়াত করা হয়েছে।

সামাজিক সংগঠনের স্বরূপ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে সমাজ যেকোনো এলাকার সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক প্রাণকেন্দ্র (Bertocci, 1970; Islam, 1974; Thorp, 1978; Karim, 1983; Rahman, 1990; হোসেন এবং ইমাম, ২০০০)। সমাজে বিভিন্ন পরিবার, বংশ, গোত্র এবং এমনকি ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন লোকজন বাস করে থাকে। বর্তমান গবেষণায় সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠনের মূল একক পরিবার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তথা পারিবারিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিফলন ঘটে থাকে। সামাজিক সংগঠনে পরিবারই তাদের সকল প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্র। ফলে তারা সংগঠনের এই এককে অনেকখানি মূল্য দিয়ে থাকে। সাঁওতাল গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহের সমাজিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, ক্ষমতা অর্জন, অনুশীলন ও সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়সমূহ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে প্রধানত তাদের ঐতিহ্যগত ও চিরায়ত পারিবারিক ও সামাজিক ধারা তথা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথা এবং প্রচলিত কল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে।

বহুকাল ধরে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীবনধারা থেকেই গড়ে উঠেছে সাঁওতালদের নিজস্ব পারিবারিক ও সমাজিক ব্যবস্থা, প্রথা, আচরণ ও ধ্যান-ধারণা। কারণ তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধর্ম-বিশ্বাস, সম্পত্তি ব্যবস্থা, বিবাহ, পেশা ইত্যাদি উপাদানসমূহের বিকাশও হয়েছে মূলত পরিবারকে কেন্দ্র করে। ফলে তারা তাদের চিরায়ত মৌলিক জীবন যাপন প্রণালী, ধর্ম-বিশ্বাস, উৎসব ও সাংস্কৃতিক ধারা এবং নিজস্ব গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য অনেকাংশে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। আবহমানকাল থেকেই সাঁওতাল সমাজ হলো ধারাবাহিক প্রচলিত সমাজ। এদের সমাজ পরিবার ও গ্রাম ভিত্তিক (Bertocci, 1970; Ellickson, 1972; Nath, 1979)। এই ধারাবাহিক সমাজে একটি নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল ও চমৎকার নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। সাধারণত তাদের পারিবারিক ও সমাজ সংগঠনের নির্দেশ-উপদেশ বা আইন-কানুন কেউ অমান্য করে না। তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তারা এ অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলে না।

তাদের সামাজিক সংগঠনগুলো মূলত ভূখণ্ড বা এলাকা, আত্মীয়তা, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবোধ এবং টোটেমিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠন তাদের বিভিন্ন ব্যক্তি, পারিবারিক ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ও আদর্শগত ব্যবহার থেকেই গড়ে ওঠে। সাঁওতাল সমাজ সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন একক, দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সামাজিক সংগঠনের স্তর বা মূল এককগুলো হলো: পরিবার, চত্বর,

গোষ্ঠী বা বংশ, পাড়া ও সমাজ। বর্তমান প্রবন্ধে সাওতাল সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র পারিবারিক কাঠামো ও প্রকৃতি এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাঁওতাল সমাজে পরিবার

সামাজিক সংগঠনের মূল ও সবচেয়ে ছোট একক গোষ্ঠী হলো পরিবার। পরিবার সেই সকল একদল মানুষকে বোঝায়, যারা একই চুলা ব্যবহার করে ও একই খাদ্য গ্রহণ করে এবং একই চালার বা ছাদের নীচে বা একই চৌহদ্দিতে বা চত্বরে বসবাস করে। পরিবারকে সংহতি বা একতার প্রতীক ও অর্থনৈতিক একক বলে গণ্য করা হয়। সাধারণত পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একই খানার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক শিল্প-অর্থনৈতিক সমাজে সব চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত পরিবার হলো একক পরিবার (Arensberg, 1955; Gore, 1961; Orenlein, 1961)। অর্থনৈতিক আধুনিকায়নের ফলে প্রচলিত যৌথ পরিবারের ধারণা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং বাধ্য হয়েই একক পরিবার গঠন করছে। গ্রাম্য পরিবেশে বাজার অর্থনীতির প্রবেশ এবং লোকজনদের আধুনিক পেশা গ্রহণের ফলেই যৌথ পরিবারসমূহ ভেঙ্গে নতুন একক পরিবার হচ্ছে (Bailey, 1963)। যৌথ পরিবার টিকে থাকা না থাকার অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক অবস্থা (Shahani, 1961:182)। বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, সন্তানদের জন্ম, লালন-পালন, ভরণ-পোষণ, সহাবস্থান, বংশধর গঠন, অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি মিলে একটি মূল দাম্পত্য একক গঠন করে যা সমাজ সংগঠনের মূল বা কেন্দ্রীয় একক এবং এর সাথেই জ্ঞাতিত্ব, পরিবার এবং বংশ এমনকি সকল ধরনের সামাজিক সংগঠন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবার হলো একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে দম্পত্তি তাদের সন্তান জন্মদান করে লালন-পালন করে তাদের সামাজিকীকরণ করে থাকে (Scott, 1999:146)। জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ লোকজনই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (Miller, 1999:214) এবং পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে (Tylor, 1999:199)। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ, কতিপয় কক্ষের সমষ্টি অথবা একটি একক কক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহে বসবাসকারী লোকজনদের খানা বলে যেখানে পারিবারিক সদস্য ব্যতীত পারিবারিক সম্পর্কহীন লোকজনও বাসস্থানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস করে থাকে (Scott, 1999:189)। অনেক গবেষক ঘর, পরিবার এবং খানাকে পরস্পর সমার্থক শব্দ হিসেবে উল্লেখ করলেও অনেক গবেষণায় ঘর, বাড়ি এবং পরিবারের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (Islam, 1974)। কিন্তু এ মতের সমালোচনা করে অনেকে এটাকে বিতর্কিত বিভাজন হিসেবে উল্লেখ করেন (Arefeen, 1986:84; Karim, 1990:63)। ঘরকে একক পরিবার, বাড়িকে বিস্তৃত বা সম্প্রসারিত বা যৌথ পরিবার এবং পরিবারকে 'স্থানীয়/স্থানিক পিতৃগোত্রজ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Karim, 1990:63)। সাঁওতালদের পরিবার ও সামাজিক সংগঠন বিশ্লেষণে বর্তমান গবেষণায় 'পরিবার' এবং 'খানা' পদ দুইটিকে সমার্থক পদ হিসাবে বিবেচনায় রেখে বাঙালি পরিবার ও সমাজ সংগঠন বিশ্লেষণের অনেক গবেষকের (Bertocci, 1970:77; Karim, 1990:63, করিম, ১৯৯৩:৯৩) মত Pauline Kolenda (1968) প্রদত্ত পরিবার কাঠামোর কিছু পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আদর্শ বাঙালি সমাজের মতো সাঁওতাল সমাজেও সামাজিক সংগঠনের মূল একক হলো পরিবার। সাঁওতালদের পারিবারিক উন্নয়ন চক্রে এই মূল এককের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর একক পরিবার হলো পরিবারসমূহের মূল একক। সাঁওতালদের পরিবার সাঁওতাল সমাজের ক্ষুদ্রতম

লেখচিত্র ২ (ক): গবেষণা এলাকার পুরুষ ও নারী জনসংখ্যা

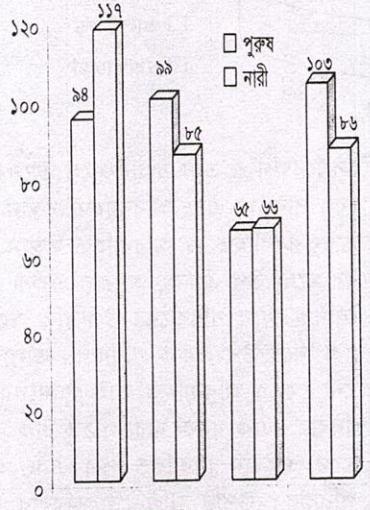

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত

লেখচিত্র ২ (খ): গবেষণা এলাকার পরিবার ও মোট জনসংখ্যা

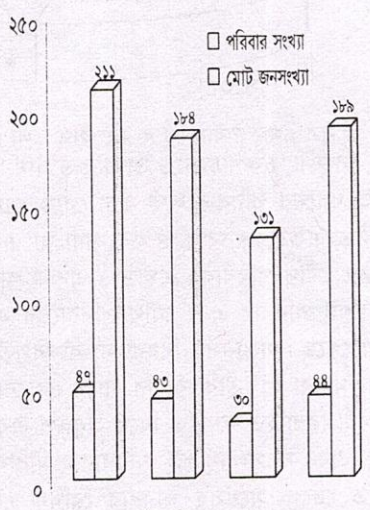

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত

অংশ যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক বন্ধনের ধরন গঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত পিতার জীবদ্দশাতেই পরিবারসমূহ ভেঙ্গে পৃথক খানায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিত পরিবারের রূপ নেয়। এমনকি এসব পরিবার ভেঙে আবার নতুন একক পরিবারে পরিণত হয়। সাঁওতাল সমাজে জন্মের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পারিবারিক সদস্যপদ লাভ করে থাকে। তবে বিবাহিত মহিলারা বাবা ও স্বামীর ঘরে দ্বৈত সদস্যপদ ভোগ করে থাকে (Srinivas,1952)। আবার 'ঘারদি জাওয়াই'-এর ক্ষেত্রে পুরুষ তার পিতৃগৃহের সদস্যপদ হারিয়ে শ্বশুর গৃহের সদস্যপদ লাভ করে। এ সবের কারণ হলো সাঁওতাল সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতা। একজন মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে অথবা বিধবা হওয়ার কারণে পিতৃপরিবারের সদস্যপদ ফিরে পায় তবে সে কোনো পরিবারেরই আইনগত ও প্রথাগত অধিকার ভোগ করে না। আবার পৃথকভাবে বসবাসকারী চাচা বা ভাই মারা গেলে তাদের সন্তানেরা জ্ঞাতিত্ব, বংশগত ও উত্তরাধিকারের নিয়মানুযায়ী বাবার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-আত্মীয়ের সাথে বসবাস করে তাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে গোত্র বহির্ভূতরা সাময়িকভাবে সদস্যপদ পেলেও জন্মগত সদস্যদের মতো সামাজিক ও আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারে না এবং সামাজিক অনুশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

লেখচিত্র ৩ : গবেষণা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের পরিবারপ্রতি গড় সদস্য সংখ্যা

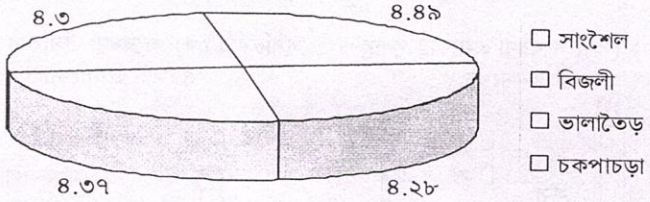

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

সাংশৈল, বিজলী, চকপাচড়া ও ভালাতৈড় গ্রাম চারটি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহকালে তাদের মধ্যে মূলত দুই ধরনের পরিবার লক্ষ করা গেছে যেমন: ক) বাবা-মা এবং অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত একক পরিবার ও খ) বাবা-মা এবং তাদের বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত যৌথ পরিবার। এছাড়াও একক পরিবারের মধ্যে উপ-একক, অনুরূপ একক ও এক সদস্য বিশিষ্ট পরিবার এবং যৌথ পরিবারের মধ্যে রৈখিক যৌথ পরিবারের উপস্থিতি স্বল্পাকারে লক্ষ করা গেছে। সন্তানসহ বিধবা মা বা বিপত্নীক বাবা নিয়ে উপ-একক পরিবার। তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা মা বা বিপত্নীক বাবার সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিবাহিত ভাই-বোনদের সাথে বসবাসকারী বিবাহিত দম্পতি নিয়ে অনুরূপ একক পরিবার। এক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত এক ব্যক্তিক গৃহস্থালী, এক সদস্য বিশিষ্ট পরিবার। মাবাবার সাথে একজন বিবাহিত পুত্র এবং অন্যান্য অবিবাহিত ছেলে-মেয়েসহ পরিবার রৈখিক যৌথ পরিবার। উপরি উল্লিখিত পরিবার ছাড়াও গবেষণা এলাকার সাঁওতাল সমাজে ঐতিহ্যবাহী 'ঘরদি জাওয়াই' পরিবার লক্ষ করা গেছে। নিম্নে গবেষণা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পরিবারের ধরন ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

গবেষণা এলাকায় মোট ১৬৪টি পরিবারে জনসংখ্যা ৭১৫ জন এবং নারী-পুরুষ এর অনুপাত প্রায় সমান। গ্রামগুলোতে পরিবার প্রতি গড়ে ৪.৩৬ জন সদস্য বাস করে (লেখচিত্র ২ক, ২খ ও ৩)। সমগ্র এলাকার ৮৯.০২% (১৪৬টি) পরিবারই হলো একক পরিবার (লেখচিত্র ৪)। সমগ্র এলাকার ৮৪.৭৬% (৬০৬ জন) সাঁওতাল নারী-পুরুষ এসকল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের

লেখচিত্র ৪: গবেষণা এলাকার সর্বমোট ৪টি গ্রামের সাঁওতালদের পরিবারের ধরন

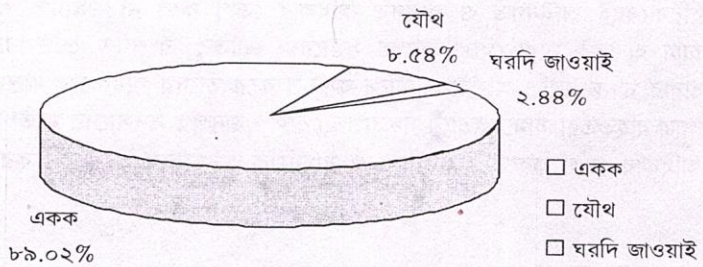

সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

পরিবারগুলোর গড় সদস্যসংখ্যা ৪.১৬ জন। যৌথ বা বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৮.৫৪% (১৪টি)। এ ধরনের পরিবারগুলোয় সমগ্র সাঁওতাল নারী-পুরুষের মাত্র ১২.৩১% (৮৮ জন) বাস করে। যৌথ বা বর্ধিত পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৬.১৭ জন। একক ও যৌথ পরিবার ব্যতীত *ঘরদি জাওয়াই* পরিবারের সংখ্যা ৪টি যা সমগ্র এলাকায় সাঁওতাল পরিবারের মাত্র ২.৪৪%। এ ধরনের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ২১ জন বা মাত্র ২.৯৪% এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪ জন। একক পরিবার ভালাতৈড় গ্রামে সর্বোচ্চ (৯৩.৩৩%) এবং সাংশৈল গ্রামে সর্বনিম্ন (৮৫.১১%)। এলাকার সাংশৈল গ্রামে যৌথ পরিবারের হার অন্যান্য এলাকার চাইতে লক্ষণীয়ভাবে বেশি (১২.৭৭%)।

সাংশৈল গ্রামের ৪৭টি পরিবারের মধ্যে ৬.৩৮% উপ-একক, ৬.৩৮% অনুরূপ একক, ১০.৬৪% রৈখিক যৌথ, ২.১৩% সমগামী যৌথ ও ২.১৩% 'ঘরদি জাওয়াই' পরিবার, বিজলী গ্রামের ৪৩টি পরিবারের মধ্যে ৪.৬৫% উপ-একক, ৮.৬৫% অনুরূপ একক, ৬.৯৮% রৈখিক

লেখচিত্র ৫ ঃ গবেষণা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের পরিবারের ধরন

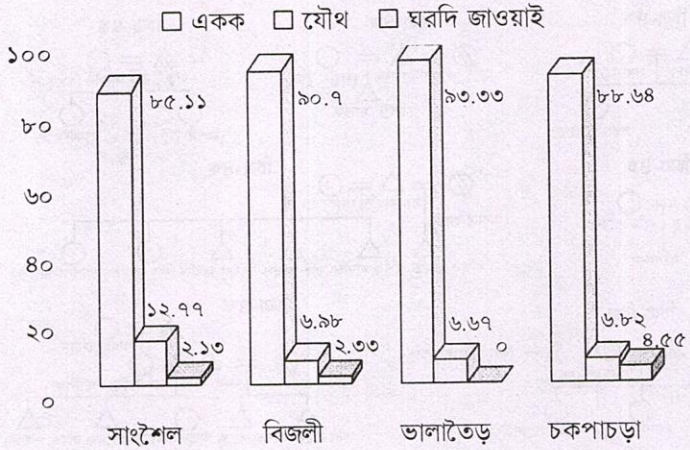

সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

যৌথ পরিবার ও ২.৩৩% 'ঘরদি জাওয়াই' পরিবার, ভালাতৈড় গ্রামে ৩০টি পরিবারের মধ্যে ৬.৬৭% উপ-একক ও ৬.৬৭% রৈখিক যৌথ পরিবার এবং চকপাচড়া গ্রামের ৪৪টি পরিবারের মধ্যে ৬.৮২% উপ-একক, ২.২৭% অনুরূপ একক, ৬.৮২% রৈখিক যৌথ ও ৪.৫৫% 'ঘরদি জাওয়াই' পরিবার লক্ষ করা গেছে। উল্লেখ্য যে, সাংশৈল, বিজলী, ভালাতৈড় ও চকপাচড়া গ্রামে একক পরিবারের হার যথাক্রমে ৮৫.১১%, ৯০.৭০%, ৯৩.৩৩% ও ৮৮.৬৪% (লেখচিত্র ৫)। গবেষণা এলাকার ৪টি গ্রামে যে সকল বিভিন্ন ধরনের পরিবার সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলোর পারিবারিক কাঠামো ও পরিবারসমূহের ধরন নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ক) এক সদস্য বিশিষ্ট পরিবার

বিজলী গ্রামের মৃত বাবার একমাত্র অবিবাহিত সন্তান রুবেন হাঁসদা (২২) ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। রুবেনের মা ২য় বিবাহ করে তিন সন্তানসহ তার স্বামীর সংসার করে। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী রুবেন হাঁসদা মায়ের সঙ্গে একই আঙিনাতে থায়। কৃষিজীবী রুবেন হাঁসদার নিজস্ব জমি ৩.৫ বিঘা।

গবেষণাধীন বিভিন্ন গ্রামের উপ-একক পরিবারসমূহ

চিত্র-৪ক

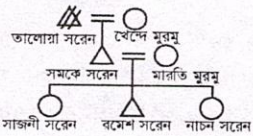

চিত্র-৪খ

গবেষণাধীন বিভিন্ন গ্রামের একক পরিবারসমূহ

চিত্র-৪গ

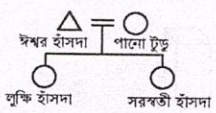

চিত্র-৪ঘ

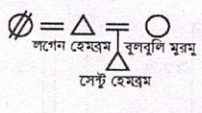

চিত্র-৪ঙ

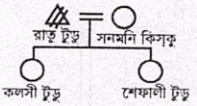

চিত্র-৪চ

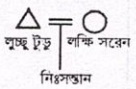

চিত্র-৪ছ

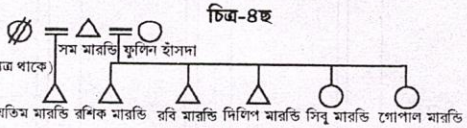

চিত্র-৪জ

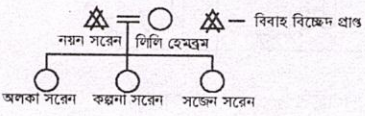

চিত্র-৪ঝ

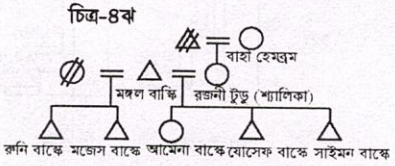

গবেষণাধীন বিভিন্ন গ্রামের অনুরূপ-একক পরিবারসমূহ

চিত্র-৪ঞ

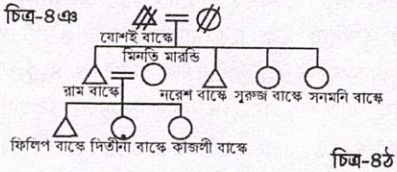

চিত্র-৪ট

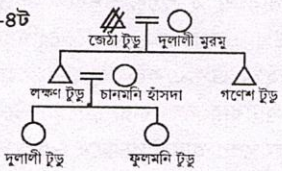

চিত্র-৪ঠ

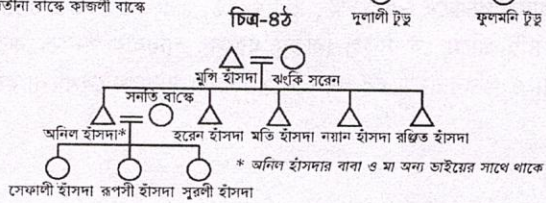

সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহীত তথ্য ।

খ) উপ-একক পরিবার

সাংশৈল গ্রামের মৃত তালোয়া সরেনের পুত্র সমকে সরেন (৪৭) এবং ভালাতৈড় গ্রামের মৃত সম হেমব্রমের পুত্র ফিলিপ হেমব্রম (২০)-এর পরিবার উপ-একক (চিত্র-৪ক, ৪খ)।

গ) একক পরিবার

সাংশৈল গ্রামের ঈশ্বর হাঁসদার (৪৬) স্ত্রী ও ২ মেয়ে নিয়ে পরিবার (চিত্র ৪গ)। তার বড় ভাই মারা যাওয়ার পর ভাবীকে বিয়ে করেছে। সনাতনধর্মী ও নিরক্ষর ঈশ্বর হাঁসদার প্রায় ৬ বিঘা নিজস্ব জমি আছে। সে পেশায় কৃষিজীবী।

সাংশৈল গ্রামের রেশকাই হেমব্রমের পুত্র লগেন হেমব্রমের (৩৫) স্ত্রী ও ১ সন্তান নিয়ে একক পরিবার (চিত্র ৪ঘ)। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে। সনাতনধর্মী ও নিরক্ষর লগেন হেমব্রম বর্তমানে ভাবীকে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। সে দিনমজুর।

সাংশৈল গ্রামের নিরক্ষর, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সনমনি কিস্কু (৩০) তালাকপ্রাপ্তা। দুই মেয়ে নিয়ে থাকে (চিত্র ৪ঙ)। নিজস্ব দুই বিঘা জমি বন্ধক দেওয়া আছে।

সাংশৈল গ্রামের গকুল টুডুর পুত্র নিঃসন্তান লুচ্ছু টুডুর (৬৫) স্ত্রী নিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট একক পরিবার (চিত্র ৪চ)। সনাতমধর্মী ও নিরক্ষর লুচ্ছু টুডু সাংশৈল গ্রামের মাঝি হাড়াম। ভাইয়ের ছেলেদের সাহায্য করে ভালোভাবে মানুষ হবার জন্য। লুচ্ছু টুডুর জমিজমা নিজ আত্মীয়-স্বজনরা চাষ করে এবং কিছু জমি বর্গা দেওয়া আছে। সে পেশায় কৃষিজীবী। চকপাচড়া গ্রামের সম মারান্ডির (৫৩) দ্বিতীয় বিবাহের একক পরিবার (চিত্র-৪ছ)।

চকপাচড়া গ্রামের লিলি হেমব্রমের (২৮) ৪ সদস্য বিশিষ্ট মাতৃপ্রধান একক পরিবার (চিত্র

গবেষণাধীন বিভিন্ন গ্রামের রৈখিক-যৌথ পরিবারসমূহ

চিত্র-৪ঙ

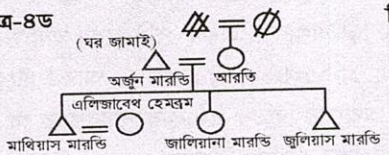

চিত্র-৪চ

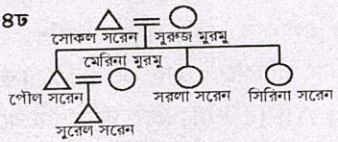

চিত্র-৪ন

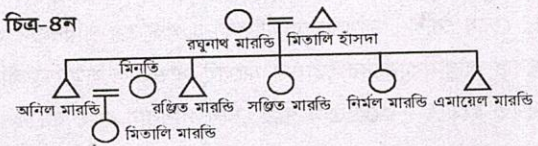

গবেষণাধীন সাংশৈর গ্রামের ঘরদি জাওয়াই পরিবার

চিত্র-৪ত

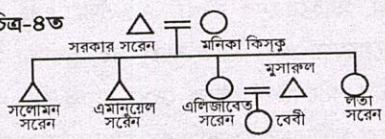

সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহীত তথ্য।

৪জ)। ভালাতৈড় গ্রামের মঙ্গল বাস্কের (৪৮) স্ত্রী, ৪ ছেলে ১ মেয়ে ও শাশুড়ি নিয়ে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একক পরিবার (চিত্র-৪ঝ)।

ঘ) অনুরূপ একক পরিবার

সাংশৈল গ্রামের রাম বাস্কের (৩৫) স্ত্রী, ১ ছেলে, ২ মেয়ে, ১ ভাই ও ২ বোন নিয়ে অনুরূপ একক পরিবার (চিত্র ৪ঞ)। সাংশৈল গ্রামের মৃত জেঠা টুডুর পুত্র লক্ষ্মণ টুডুর (৩০) ৬ সদস্য বিশিষ্ট অনুরূপ একক পরিবার (চিত্র ৪ট)। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা ও ভাইকে নিয়ে থাকে। বিজলী গ্রামের অনিল হাঁসদা (৩৮) স্ত্রী, ৩ মেয়ে এবং ৪ ভাই নিয়ে অনুরূপ একক পরিবার (চিত্র ৪ঠ)।

ঙ) রৈখিক যৌথ পরিবার

বিজলী গ্রামের মাথিয়াস মারান্ডির (২৯) বাবা, মা, ভাই, বোন ও স্ত্রী নিয়ে রৈখিক যৌথ পরিবার (চিত্র ৪ড)। সাংশৈল গ্রামের সোকল সরেনের (৫৭) পুত্র পৌল সরেন (২৫) স্ত্রী, ছেলে, পিতা, মাতা ও বোনের রৈখিক যৌথ পরিবার (চিত্র ৪ঢ)। চকপাচড়া গ্রামের বিশম মারান্ডির পুত্র রঘুনাথ মারান্ডির (৫০) ৯ সদস্য বিশিষ্ট রৈখিক যৌথ পরিবার (চিত্র ৪ন)। স্ত্রী, ছেলে, ছেলে বউ, নাতনী নিয়ে তার সংসার।

চ) ঘরদি জাওয়াই পরিবার

সাংশৈল গ্রামের সরকার সরেনের (৫০) স্ত্রী, ২ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতনী ও মেয়ে জামাই নিয়ে 'ঘরদি জাওয়াই' পরিবার (চিত্র ৪ত)।

এখানে লক্ষণীয় যে, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি এলাকার সাঁওতাল পরিবারের চাইতে গবেষণা এলাকায় একক পরিবার বেশি। গোদাগাড়ী এলাকায় একক পরিবারের হার ৬০-৭০% এবং যৌথ পরিবারের হার ৩০-৪০% (কায়েস, ১৯৯৫:৬৬-৬৭)। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, Ahsan Ali (1998) তাঁর গবেষণায় বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার পরিবারের যে কাঠামো দেখিয়েছেন বর্তমান গবেষণা এলাকায় তা একটু ভিন্ন। কারণ এখানে একক পরিবারের সংখ্যা তাঁর উল্লিখিত হারের চেয়ে বেশি। জমিজমার মালিকানা পদ্ধতির পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত আধুনিকায়নের ছোঁয়ার ফলেই সাঁওতাল সমাজে পরিবারসমূহ ছোট হয়ে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে যৌথ পরিবার কমে যাচ্ছে।

একক পরিবারগুলোতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে একত্রে বসবাস করে কিন্তু যৌথ পরিবারসমূহে সদস্য সম্পর্ক একটু জটিল। দেখা গেছে যে, যৌথ পরিবারসমূহে মোট সদস্যের ১০.৯৮% মাত্র বাবা ও মা, ভাইবোনের সংখ্যা ৭.৯৩% এবং ভাই-বোন, বাবা-মা ব্যতীত উত্তরদাতার স্ত্রী ও তার ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনিসহ অন্যান্য সদস্যদের সংখ্যা ২৬.২২% (সারণি ১)। এখানে বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা এলাকায় পরিবারের ধরন অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। যাদের বিষয় সম্পত্তি বেশি তাদের তুলনায় গরিবদের পরিবার দ্রুত ভেঙে গেছে। ফলে গরিব পরিবারে কনিষ্ঠ সদস্যরা দ্রুত তাদের নিজ

সারণী ১: গবেষণা এলাকার গ্রামসমূহের সাঁওতালদের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের ধরন।

গ্রাম	মোট পরিবার সংখ্যা	একক পরিবারের সংখ্যা (%)	যৌথ পরিবারের সংখ্যা (সম্পর্কের ধরন সহ) স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয় সহ %				
			সংখ্যা	বাবা এবং মা (১)	ভাই এবং বোন (২)	অন্যান্য (৩)	মোট (১+২+৩)
সাংশৈল	৪৭	৪০	৬	৮	১০	১৭	৩৫
বিজলী	৪৩	৩৯	৩	৪	২	৯	১৫
ভালাতৈড়	৩০	২৮	২	৪	১	৪	৯
চকপাচড়া	৪৪	৩৯	৩	২	০	১৩	১৫
মোট →	১৬৪	১৪৬ (৮৯.০২)	১৪ (৮.৫৪)	১৮ (১০.৯৮)	১৩ (৭.৯৩)	৪৩ (২৬.২২)	৭৪

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ও অধিকতর ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং নতুন একক পরিবার গঠন করেছে।

পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তনের কারণসূমহ

বর্তমান গবেষণায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানত নিম্নবর্ণিত ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো:

(ক) ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তনের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন;

(খ) জ্ঞাতিত্ব বা জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনের দরুন পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন; এবং

(গ) সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জমিজমার মালিকানা পদ্ধতির পরিবর্তন, আধুনিকায়নের ছোঁয়া এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবর্তনের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন।

পরিবার কাঠামোর এই পরিবর্তনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো একক কারণে এ সকল পরিবর্তন না হয়ে নানাবিধ কারণে নানা মাত্রায় এ পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে সবার অলক্ষ্যে নীরবে সংঘটিত হয়েছে।

গবেষণা এলাকা তথা সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলে সাঁওতাল সম্প্রদায় ভূ-প্রকৃতিগত কারণে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলেও আদিকাল থেকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকালাপের মাধ্যমে তাদের নিজেদের পারিবারিক বন্ধন তথা পরিবার কাঠামো এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ টিকিয়ে রেখেছে। প্রকৃতিগতভাবে পরিবার ও সমাজ যতোই বর্ধিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তথা তাদের মৌলিক চাহিদার প্রয়োজনে তারা ততোই বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, একে অপর হতে ততোই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আবার সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ ধর্মীয় কারণে তারা বহুবার আদি বাসস্থান হতে অভিবাসিত হয়েছে। ফলে পরিবার তথা জ্ঞাতি-আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে বিভক্তি দেখা গেছে। তাদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও জ্ঞাতি বন্ধনের শিথিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের

সংগঠনসমূহের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিমানস, পরিবার ও সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমানে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে তাদের পরিবার কাঠামোর বিভক্তি দেখা গেছে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে আদিবাসী চিরায়ত ও খ্রিস্টান সাঁওতাল জ্ঞাতি-আত্মীয়দের মধ্যে যোগাযোগ ও লেনদেন থাকলেও মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে একই পরিবার বা বংশের জ্ঞাতিদের মধ্যে এই দূরত্ব অনেকখানি বেশি। ফলে পারিবারিক বন্ধনের এই টানা পড়েন সম্বন্ধের কারণে পারিবারিক তো বটেই বংশীয়, গোত্রীয় এমনকি সামাজিক বন্ধনহীনতা ও ভাঙনের সৃষ্টি করেছে। যার ফলে তারা যৌথ ভাবনা ছেড়ে একক বা নিজস্ব ভাবনায় উপনীত হয়েছে যা গবেষণা এলাকায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংস্কৃতায়ন ও আধুনিকায়ন এবং নগরায়নের ফলে বাঙালি সমাজের পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের পাশাপাশি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পারিবারিক কাঠামোতেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। দেশীয় বর্তমান আর্থ-সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ধারার গড্ডলিকা প্রবাহে তারাও যুগের প্রয়োজনে টিকে থাকার তাগিদে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। নানা প্রয়োজনে তারাও বহুবিধ লোকজনের সাথে জ্ঞাতিত্ব ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলতে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ বণ্টন, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকরণের অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে তাদের মধ্যে সুষ্ট ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকছে না। যার প্রভাবে তাদের পরিবার কাঠামোর উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ তাদের যৌথ পরিবার কাঠামো ভেঙে গিয়ে একক পরিবার কাঠামোতে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেও পরিবার সদস্যদের ভিতরে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। উপরি উল্লিখিত নানাবিধ কারণে সাঁওতাল সমাজের পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

পূর্বে সাঁওতাল সম্প্রদায়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ একান্নবর্তী পরিবার যৌথ বা বর্ধিত পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী বা যৌথ সামাজিক ব্যবস্থা বা পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল। আদিকালের অরণ্যচারী হতে কৃষিজীবী এবং তা হতে নানাবিধ পেশাজীবীতে পরিণত হওয়ার ফলে দিনে দিনে তারা অর্থনৈতিকভাবে যেমন অসচ্ছল হয়ে পড়েছে তেমনি তারা যৌথ ভাবনার চাইতে ব্যক্তি চেতনায় অধিকতর মনোনিবেশ করছে। বর্তমানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ব্যাপক পরিবর্তন এবং জমিজমা মালিকানা ধরনের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে তা সমাজ থেকে ব্যক্তি মালিকানায় এসেছে। ব্যক্তিচেতনা বাড়ার সাথে সাথে এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যৌথ পরিবারসমূহ দ্রুততার সাথে ভেঙে গিয়ে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে যার সত্যতা গবেষণা এলাকায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যাদের বিষয় সম্পত্তি বেশি তাদের তুলনায় গরিবদের পরিবার কাঠামো দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনা ও বিশ্লেষণে এটা নিশ্চিত যে, অর্থনৈতিক কারণ পরিবার-ধরনের মুখ্য শর্ত এবং এটাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকে তার সকল সদস্যদের আয় একীভূত করা সুবিধাজনক। পরিবারের সম্পদ যেখানে ভাগাভাগি হয়নি সেখানে সদস্যদের একত্রে থাকবার একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এটাও স্পষ্ট যে, পরিবারের কাঠামোগত ধরন অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। চূড়ান্তরূপের পরিবার-ধরন দ্বি-বিভাজনে' অর্থনৈতিক প্রভাব পজিটিভ ও গতিময় শক্তি। পরিবার কাঠামো, বিশেষ করে যৌথ পরিবার কাঠামো, সম্পদ পুঞ্জীভবনের একটি পজিটিভ ও গতিময় শক্তি এবং তা যৌথ পরিবারের সম্পত্তি

বহুগুণে বৃদ্ধি করে। যৌথ পরিবার কাঠামো থাকার ফলে ধনীরা আরও ধনী হয় অন্যদিকে, দরিদ্র পরিবারগুলো একত্রিত থাকার পক্ষে খুবই কষ্টকর। সেজন্য দরিদ্র পরিবারের যুবকরা ভালো অর্থনৈতিক সুযোগের প্রত্যাশায় তাদের যৌথ পরিবার ভেঙে চলে যায়। দরিদ্র পরিবারের তরুণ সদস্যরা সেই ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র একক পরিবার গঠন করে অর্থনীতি ও যৌথ পরিবার কাঠামো উভয়কেই প্রভাবিত করে। এই আলোচনা থেকে আরও দেখা যায় যে, সমর্থ যুবকরা তাদের আয় দিয়ে যৌথ পরিবারের চেয়ে একক পরিবারেই বেশি অবদান রাখতে পারে। অধিকন্তু, যৌথ পরিবারের তরুণ সদস্যরা গ্রামের রাজনীতিতে প্রবেশ করলে যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকে একটা নিরাপদ ভিত্তি খুঁজে পায়। তারা শুধু পারিবারিক কাঠামোই শিথিল করে না বরং তারা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী এক সমাজ কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটায়।

উপসংহার

বাঙালি সমাজের মতো সাঁওতাল সমাজেও সামাজিক সংগঠনের মূল একক হলো পরিবার। সাঁওতালদের পরিবার সাঁওতাল সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক বন্ধনের ধরন গঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত পিতার জীবদ্দশাতেই পরিবারসমূহ ভেঙে পৃথক খানায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিত বা যৌথ পরিবারের রূপ নেয়। এমনকি এসব পরিবার ভেঙে আবার নতুন একক পরিবারে পরিণত হয়।

গবেষণা এলাকায় পরিবারের কাঠামোগত বৃহদাকার ধরন হচ্ছে অযৌথ ও যৌথ এবং এই শ্রেণীবিভাগ আবার অনুপদী উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এটা পরিষ্কার যে, সবচাইতে প্রচলিত পরিবারের ধরন হচ্ছে একক পরিবার এবং ৪টি গ্রামেই সংখ্যার দিক দিয়ে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি (৮৯.০২%)। গ্রামগুলিতে যৌথ পরিবার এখনও বিরল নয়। তবে ঐতিহ্যবাহী দুই-তিন প্রজন্মের পরিবার আজকাল আর তেমন দেখা যায় না।

গবেষণা এলাকায় মোট ১৬৪টি পরিবারে গড়ে ৪.৩৬ জন সাঁওতাল বাস করে। এর মধ্যে ১৪৬টি (৮৯.০২%) পরিবারই একক পরিবার। একক পরিবারসমূহে সমগ্র এলাকার ৮৪.৭৬% সাঁওতাল নারী-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত যেখানে গড় সদস্য সংখ্যা ৪.১৬ জন। যৌথ বা বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১৪টি (৮.৫৪%) যেখানে পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৬.১৭ জন। এলাকায় ঘরদি জাওয়াই পরিবারের সংখ্যা ৪টি (২.৪৪%)। একক পরিবার ভালাতৈড় গ্রামে সর্বোচ্চ (৯৩.৩৩%) এবং সাংশৈল গ্রামে সর্বনিম্ন (৮৫.১১%)। এলাকার সাংশৈল গ্রামে যৌথ পরিবারের হার অন্যান্য এলাকার চাইতে লক্ষণীয়ভাবে বেশি (১২.৭৭%)। একক পরিবারসমূহের মধ্যে এক সদস্য বিশিষ্ট পরিবার, উপ-একক ও অনুরূপ-একক এবং যৌথ পরিবারসমূহে রৈখিক যৌথ পরিবার রয়েছে।

সাঁওতাল সমাজের পারিবারিক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এলাকায় তেমন কোন একক নির্দিষ্ট কারণে যৌথ পরিবার ভাঙছে না তবে বহুবিধ কারণে যেমন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ধর্মীয় (খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে), জমিজমার মালিকানা পদ্ধতির পরিবর্তন, আধুনিকায়নের ছোঁয়া, ক্রমান্বয়ে পরিবার ও প্রজন্ম বড় হওয়া ও জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে। এটা চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, পরিবারের কাঠামোগত ধরন অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত। অপেক্ষাকৃত সম্পদশালীদের তুলনায় গরিবদের পরিবার দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, ফয়েজ (১৯৯৮) 'শোষিত-বঞ্চিত আদিবাসীদের দাবী' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ই ডিসেম্বর।

কামাল, মেসবাহ, চক্রবর্তী, ঈশানী ও নাসরীন, জোবাইদা (২০০১) *নিজভূমে পরবাসী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) এবং উৎস প্রকাশনী।

কায়েস, শাহানা, (১৯৯৫) *রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন*, অপ্রকাশিত এম, ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ।

জলিল, আব্দুল, (১৯৯১) *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি* , ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়, সুপ্রকাশ, (১৯৭২) *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা: ডি, এন, বি, এ, ব্রাদার্স।

শিলু, সাজেদুর রহমান, (১৯৯৮) "সাঁওতালদের দিনকাল", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৪শে মে।

সিদ্দিকী, আব্দুর রহমান, (১৯৮৮) 'বরেন্দ্র ভূমির সাঁওতাল উপজাতি', অপ্রকাশিত ফিল্ড রিপোর্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সিদ্দিকী, আব্দুর রহমান, (১৯৯৮) "বরেন্দ্র ভূমির চিরায়ত বাসিন্দা: নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান", ডক্টর সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী: মোঃ মমতাজুর রহমান।

সিদ্দিকী, আতাউল হক, (১৯৯৮) "কালে কালান্তরে নওগাঁ", মোঃ ইসরাফ আলী দেওয়ান ও অন্যান্য; সম্পাদিত, *কালান্তরে নওগাঁ*, নওগাঁ: জেলা প্রশাসক।

সুলতানা, আবেদা, (২০০২) *সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব: রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা*, অপ্রকাশিত পি-এইচ, ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ।

হোসেন এবং ইমাম, (২০০০) *বাংলাদেশের গ্রাম*, ঢাকা: সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র।

Ali, Ahshan, (1998), *Santals of Bangladesh,* Midnapur: Samaj Seva Sangha Press.

Arefeen, H.K.S.,(1986), *Changing Agrarian Structures in Bangladesh*, Dhaka: Center for Social Studies.

Arensberg,C.M.,(1955), "American Communities" *American Anthropologist,* 66.

Bailey, F. G., (1963), *Politics and Social Change in Orissa in 1959* (Berkley: University of California Press).

Bertoci, Petter, J., (1970), "Elusive Villages", *Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, Unpublished Ph.D. Dissertation, Michigan State University.

Das Gupta, P. K., (1964), "Impact of Industrialization on Tribal Life", Calcutta, *Bulletin of Anthropological Survey of India*,13(1-2).

Datta-Majumder, N., (1956), *The Santal, A Study in Cultural Change,* Calcutta: Government of India Press.

Ellickson, Jean, (1972) "Islamic Institution in Bangladesh" *Contribution to Indian Sociology*, No. VI, p.53-65.

Gore, M. S., (1961), "The Impact of Industrialization and Urbanization on Aggarwal Family in New Delhi Area", Unpublished Ph. D. Thesis, Columbia University, USA.

Hossain, K. T. & Sadeque, S. Z., (1984), "A study in Social and Cultural Change", M. S. Qureshi (ed), *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS: Rajshahi University.

Hossain, K. T., (2000), "The Santals of Bangladesh: An Ethnic Minority in Transition", Workshop Paper ENBS, Oslo.

Hunter, W. W., (1876), *A Statistical Account of Bengal*, Vol. 3.9 and 16, London: Trubner and Co.

Islam, A. A. M. Aminul, (1974), *A Bangladesh Village Conflict and Cohesion: Anthropological Study of Politics*, Cambridge: Schenkman Publishing Company.

Karim, A. H. M. Zehadul, (1983) "Rural Elite's and the Power Structure in Bangladesh: A Case Study of Puthia Union, Rajshahi District", Unpublished M. A. Thesis, Syracuse University, Dept. of Anthropology.

Karim, A. H. M. Zehadul, (1990), *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society: A Case Study of the Changing Power Structure in Bangladesh*, New Delhi: Northern Book Center.

Karim, A. H. M. Zehadul, (2000), "The Occupational Diversities of the Santals and their Socio-Cultural Adaptability in a Periurban Environmental Situation of Rajshahi in Bangladesh: An Anthropological Explanation," Annual Conf. of The Indian Anthropological Society, Santiniketan, India.

Kochar, Vijay, (1970), *Social Organization Among the Santals*, Calcutta: Editions India.

Kolenda, Pauline, (1968) "Religion, Caste and Family Structure", A Comparative Study of the Indian Joint Family, M. Singer and B.Com (eds.) *Structure and Change in Indian Society*, Chicago: Al dine.

Mallick, Samar Kumar, (1993), *Transformation of Santal Society: Prelude to Jharkhand*, Calcutta: Minerva Associates Pvt. Ltd.

Miller, Barbara. D., (1999), *Cultural Anthropology*, London: Allyn and Bacon.

Mukherjee, Charulal, (1962) *The Santals,* Calcutta: Mukherjee and Co. Pvt. Ltd.

Nath, Jharna, (1979) *The Role of Women in Rural Bangladesh in the Situation of Women in Bangladesh* , Dacca: Women's Development Program, UNICEF.

Orans, Martin, (1965) *The Santals, A Tribe in the Search of Great Tradition,* Michigan:Wayne State University Press.

Orenstein, H., (1961), "The Recent History of the Extended Family of India", *Social Problems* 8.

Rahman, S. M. Zillur, (1990), "Kinship Organization in a Village in Bangladesh", Unpublished Ph.D. Thesis, Delhi University.

Scott, W. P., (1999) *Dictionary of Sociology*, New Delhi: Goyl Soab.

Shahani, Savitri, (1961), "The Joint Family - A Case Study", *The Economic Weekly*, Vol. 12, No. 49.

Sinha, A.C., 919670 *Leadership in a Tribal Society.* (Ranchi: Man in India).

Srinivas, M. N., (1952), *Religion and Society Among the Coorgs of South India,* Oxford.

Thorp, John, P., (1978) *Power Among the Farmers of Daripalla: A Bangladesh Village Stud,* KARITAS: Bangladesh.

Tylor, E. B., (1999) *Dictionary of Anthropology*, Delhi: W. R. Goyal Publishers and Distributors.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বাংলাদেশে ই-কমার্স : প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা

মোঃ শাহ্ আজম*
সালমা আক্তার**

Abstract: The advancement of ICT and its adoption, particularly, wide usage of internet has reshaped the way of conducting business and transaction as well as increased the potential market for e-commerce on annual basis in America and other developed countries. Like many other developing countries Bangladesh's position in this regard is not quite backward. This paper analyses existing situation of e-commerce looking at different barriers and obstacles in developing the institutions related to e-commerce in Bangladesh. Basing on secondary data the paper reports that B2C e-commerce is not viable while B2B e-commerce has the potentials in accelarating the growth of Bangladesh's exportable items. Poor technological, legal, financial and delivery infrastructure, lack of internet connectivity with high band width in a low cost and technological know how as well as competent human resources are the barriers of e-commerce. The paper outlines some policy guidelines to overcome the existing hardles for e-commerce.

১. সূচনা

বিশ্বব্যাপী অনলাইনের ব্যাপক ব্যবহার এবং প্রসার প্রতিবছরই ই-কমার্সের সম্ভাব্য বাজার বৃদ্ধি করে চলেছে। ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে বিশাল অঙ্কের শিল্পপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাণিজ্য রীতিতে নবতর পদ্ধতির সূচনা করেছে যা ই-কমার্স নামে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেট গ্রহণের (Adoption) অবিশ্বাস্য বর্ধিত হার এবং যে কোনো স্থান ও পরিবেশ থেকে এর সার্বক্ষণিক ব্যবহারযোগ্যতা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। এর ফলে ইন্টারনেট-ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান, ক্রেতা অন্বেষণ ও বাজারজাতকরণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় যোগাযোগ ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব সমধিক। ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসায় যোগাযোগ ও লেনদেন ব্যবস্থা ই-কমার্সের সফল প্রয়োগের ফলে বিশ্বের অসংখ্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ তাদের রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যপক ব্যবহার এই প্রযুক্তিকে এযাবৎকালের দ্রুততম পরিব্যাপ্ত (Diffused) প্রযুক্তিতে পরিণত করেছে (Azam, 2006, Azam, 2007a, and Azam, 2007b)।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** লেকচারার (মার্কেটিং), স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

আই.টি.ইউ-এর তথ্যানুযায়ী ২০০১ সালে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ কোটিতে যা ২০০০ সালের তুলনায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থাৎ ৩০% বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে এই সংখ্যা ৫৯ কোটি ১০ লক্ষে উন্নীত হয় (UNCTAD, 2003)। ২০০৩ সালের শেষে বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭ কোটি ৬০ লক্ষে যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১১.৮% (UNCTAD, 2004)। বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উন্নত বিশ্বে প্রতি দশ হাজারে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৩ ও ২০০২ সালে ছিলো যথাক্রমে ৪৪৯৫ ও ৪৪৭৪ যা ০.৪৮% প্রবৃদ্ধির সূচক। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে একই সময়ে এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ২০০৩ ও ৪২৯ য. ১৬.৭৮% প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। বালাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহার চিত্রও উল্লিখিত প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করে। আই.টি.ইউ-এর পরিসংখ্যানানুযায়ী ২০০০ সালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীব সংখ্যা ছিলো প্রায় ১ লক্ষ যা ২০০5 সালে প্রায় ৩ লক্ষে উন্নীত হয়। জনসংখার বিচারে জনপ্রতি ইনটারনেট ব্যবহারকারীর হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.৭৪ এবং ০.২২।

যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন পপুলেশন ২০০১ সালে ছিলো ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ যা ২০০৬ সালে ২১ কোটি ৮ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন খুচরা ব্যবসার পরিমাণ ছিলো ৪৭৮০ কোটি ডলার যা ২০০৬ সালে ১৩,০৩০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হয় (Geocart, 2006)। বাস্তবে এ হার আরও বেশি।

বিশব্যাপী ই-কমার্সের বর্ধিত হার উন্নত বিশ্বের সাথে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহকেও এই প্রযুক্তির দ্রুত গ্রহণ, পরিব্যাপ্তি ও প্রয়োগকে উৎসাহিত করে। ফলে এশিয়ার দেশসমূহও এর সুফল অর্জনে পিছিয়ে নেই। ইতিমধ্যেই জাপান, সিঙ্গাপুর, মালোয়েশিয়া সহ এশিয়ার অনেক দেশ ই-কমার্সের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। বিশ্বের এই উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের অগ্রসরমাণতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও তা হতাশাব্যঞ্জক নয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেবল নেটওয়ার্ক বা তথ্য মহাসড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারের গড় হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় হতাশাব্যঞ্জক হলেও এদেশে ইন্টারনেট ব্যবহার এবং এর প্রবৃদ্ধিতে ব্যপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে ই-কমার্সের প্রচলন বাস্তবসম্মত না হলেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস, চামড়া, ঔষধশিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহ রপ্তানিতে ই-কমার্সের প্রয়োগ আবশ্যক এবং বর্তমানে এর প্রচলনও শুরু হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশে ই-কমার্সের অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ই-কমার্সের সাথে জড়িত আইটি শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত এবং সেগুলো দূর করার জন্য প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. ই-কমার্সের ধরন

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ নেটের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে ইন্টারনেট বিশ্বকে পরিণত করেছে গ্লোবালভিলেজে। ইলেক্ট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (ইডিআই), ইলেক্ট্রনিক মেইল (ই-মেইল), ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ (ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.) এবং ইন্টারনেটেরে প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ই-কমার্স

ব্যক্তি, কেম্পানি এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে মূল্যবান তথ্য বিনিময়ের পথনির্দেশ করেছে। সহজ কথায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করাকে ই-কমার্স নামে অভিহিত করা যায় (Joseph, 2002)। অন্যভাবে বলা যায় ই-কমার্স একটি আধুনিক ব্যবসা পদ্ধতি, যা বিশ্বের প্রায় দুইশত দেশের বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বা টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের আন্তঃসংযোগ স্থাপনকারী নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ই-কমার্স ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা বা ক্রেতা প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করার সুবিধা প্রদান করে, পণ্যের মান উন্নয়ন করে এবং ব্যবসায়িক খরচ ক্ষমায়, সর্বোপরি মানসম্পন্ন দ্রুত সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বস্তুত ইলেক্ট্রনিক কমার্স ডিজিটাল 'ডেটা' প্রসেসিং এবং ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদান। সাধারণত এই কাজটি সম্পন্ন করা হয় একটি সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এ কথা ঠিক যে, ইন্টানেটের মাধ্যমে বই, কম্পিউটার ইত্যাদি বস্তুগত পণ্য বিক্রয়ের বিষয়টি মিডিয়া জগতের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্যে বাজারজাতকৃত অধিকাংশ পণ্যই অদৃশ্যমান প্রকৃতির, যেমন: ভ্রমণ সংক্রান্ত সেবা, সফট্ওয়্যার, এন্টারটেইনমেন্ট, ব্যাংকিং, বিমা, ইনফরমেশন সার্ভিস, আইনগত পরাামর্শ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা-গবেষণা এবং সরকারি সার্ভিস ইত্যাদি (হোসেন ও খান, ২০০০)।

ই-কমার্স অসংখ্য প্রতিষ্ঠান (যেমন: সরকার, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ক্রেতা-ব্যবহারকারী ইত্যাদি), ক্রিয়া (যেমন: বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, অর্থ পরিশোধ ইত্যাদি), বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (যেমন: লোকাল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, কর্পোরেট এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক), আইনগত বিষয়াবলি এবং দক্ষ জনশক্তির সঙ্গে জড়িত (Rahman, 2002)।

বর্তমান বিশ্বে নানা ধরনের ই-কমার্সের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকৃতির যোগাযোগ এবং বিভিন্ন পক্ষের অর্ন্তভুক্তি ইলেক্ট্রনিক ব্যবসায়ে নতুন নতুন ধারার সূচনা করেছে। বিভিন্নমুখী ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ এবং ব্যবসায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে সমুদয় ব্যবসায়ের ধারাকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়:

- ✓ ব্যবসায় –ভোক্তা ই-কমার্স (বিটুসি)
- ✓ ব্যবসায় – ব্যবসায় ই-কমার্স (বিটুবি)
- ✓ ব্যবসায় – সরকার ই-কমার্স (বিটুজি)
- ✓ ব্যবহারকারী – ব্যবসায় ই-কমার্স (সিটুবি)
- ✓ ব্যবহারকারী – ব্যবহারকারী ই-কমার্স (সিটুসি)

ব্যবসায় থেকে ভোক্তা ই-কমার্স (বিটুসি

একজন প্রত্যক্ষ ভোক্তা বা ক্রেতার ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন ধাপ, যেমন: ব্রাউজ করা, ক্রয় আদেশ প্রেরণ করা এবং টাকা পরিশোধ কার্যক্রম সহ এ জাতীয় কার্যক্রমের সমন্বিত রূপ হলো বিটুসি ব্যবসায় –ভোক্তা ই-কমার্স। ব্যবসায় এবং ক্রেতার আন্তঃসম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া নিম্নলিখিত কার্যক্রম দ্বারা ব্যাপৃত:

- ✓ প্রসার কার্যক্রম
- ✓ ক্রয় আদেশ
- ✓ পণ্য সরবরাহ
- ✓ বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদান

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রেডিও, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজের মতো ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে বিজ্ঞাপন প্রদান চালু হয়েছে যেমন ইয়াহু সাইটে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। বই, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র, সিডি জাতীয় পণ্যের ক্রয়াদেশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। মিউজিক অথবা সফট্ওয়্যার জাতীয় ডিজিটাল পণ্য ডাইনলোড করা যায় এবং ই- মেইল ও বারবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বিক্রয় পরবর্তী সেবা পাওয়া যায় (Cahudhury and Kuilboer, 2002)।

ব্যবসায় থেকে ব্যবসায় ই-কমার্স (বিটুবি)

বিটুবি ই-কমার্স (বিজনেস টু বিজনেস) ই-কমার্সের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসায় যোগাযোগ সংগঠিত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের বিভিন্ন পক্ষ ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী বা উৎপাদনকারী হতে পারে।

এ পর্যন্ত ই-কমার্সের যে প্রসার ঘটেছে তার সিংহভাগ অবদানই বিটুবি ই-কমার্সের। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সহজে এবং দ্রুত গতিতে নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করছে। শারীরিকভাবে উপস্থিতির মাধ্যমে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাঝে অংশীদারিত্ব স্থাপন ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। দূরবর্তী স্থান বা দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একই টেবিলে পাশাপাশি অবস্থান করার মতো সুযোগ ইন্টারনেট করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় পরস্পরের অর্ডার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, লেনদেন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, দ্রুত অর্ডার প্রসেসিং, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সরবরাহের কাজও ইন্টারনেটের মাধ্যমে করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রতিনিয়তই দ্রুত গতিতে বিটুবি-র পরিমাণ বাড়ছে, আকৃষ্ট করছে নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে। কোনো কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান মনে করেন প্রতি বছর বিটুবি এর ব্যবসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫০%। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের চা, মাছ, গার্মেন্টস, চামড়া, সবজি ইত্যাদি সকল পণ্যের রপ্তানি বাজার অক্ষুণ্ন রাখতে ই-কমার্সে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উন্নত বিশ্বে ই-কমার্সে ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবসা হচ্ছে বিটুবি এর আওতায়। এই মাধ্যমে ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে (হোসেন ও খাঁন, ২০০০)।

ব্যবসায় – সরকার ই-কমার্স (বিটুজি)

বিটুজি (**ব্যবসায়–সরকার**) ই-কমার্স ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ এবং লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য একটি পরিচিত ওয়েব সাইট হলো: *iGov.com*.

ব্যবহারকারী – ব্যবসায় ই-কমার্স (সিটুবি

সিটুবি **(ব্যবহারকারী – ব্যবসায়)** একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার চাহিদা বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের মূল্য প্রকাশ করতে ক্রেতাদের সক্ষম করে তোলে। এ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট চাহিদার স্বরূপ সংগ্রহ করে এবং বিক্রয়কারীকে সে অনুযায়ী অফার করতে উৎসাহিত করে। ভ্রমণ, গাড়ি ও ভোক্তা ইলেক্ট্রনিক্সের জন্য *reverseauction.com* এবং ভ্রমণ, টেলিফোন ও বন্ধকের জন্য *priceline.com* ই-ব্যবসায় মডেলের উদাহরণ।

ব্যবহারকারী – ব্যবহারকারী ই-কমার্স (সিটুসি)

সিটুসি **(ব্যবহারকারী – ব্যবহারকারী)** ইলেক্ট্রনিক কমার্সে একজন ব্যবহারকারী সরাসরি অন্য ব্যবহার কারীর কাছে তার ব্যক্তিগত সেবা ও কারিগরি দক্ষতা অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রয়ের সুযোগ পায়। নিলামের জন্য *ebay.com* এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে *traderonline.com* ব্যবহারকারী হতে ব্যবহারকারীর কাছে সরাসরি বিক্রয়ের উদাহরণ (Joseph, 2002)।

৩. ই কমার্স এবং প্রচলিত ক্রয়-বিক্রয় প্রথা

প্রচলিত ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় অথচ শুধুমাত্র একটি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ই-কমার্স তার সমুদয় কাজ সমাধা করতে সক্ষম (Koshiur, 2002)। নিম্নলিখিত সারণির মাধ্যমে ই-কমার্স এবং প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১: ক্রয় সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী অবস্থা

বিক্রয়চক্রের ধাপ	প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য	ই-কমার্স
পণ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	ম্যাগাজিন, ফ্লাইয়ার্স, অনলাইন ক্যাটালগ	ওয়েবপেজ
পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	মুদ্রিত ফর্ম, চিঠি	ই-মেইল
মূল্য যাচাই	ক্যাটালগ	অনলাইন ক্যাটালগ
ক্রয় আদেশ প্রস্তুত	মুদ্রিত ফর্ম	ই-মেইল, ওয়েবপেজ
ক্রয়আদেশ এবং পরবর্তী কার্যক্রম		
বিক্রয়চক্রের ধাপ	প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য	ই-কমার্স
ক্রয়াদেশ প্রদান এবং গ্রহণ	ফ্যাক্স, মেইল	ই মেইল, ইডিআই
মজুতমাল যাচাই	মুদ্রিত ফর্ম, ফোন, ফ্যাক্স	অনআইন ডাটাবেজ, ওয়েবপেজ
সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম		
বিক্রয়চক্রের ধাপ	প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য	ই-কমার্স
সরবরাহ কর্মসূচি	মুদ্রিত ফর্ম	ই মেইল, অনলাইন ডাটাবেজ
ইনভওয়েস তৈরি	মুদ্রিত ফর্ম	অনলাইন ডাটাবেজ
চূড়ান্ত রশিদ	মুদ্রিত ফর্ম	ই মেইল
ইনভয়েস গ্রহন এবং প্রদান	মেইল	ই মেইল, ইডিআই
অর্থ পরিশোধ ও গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম		
বিক্রয়চক্রের ধাপ	প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য	ই-কমার্স
অর্থ পরিশোধ	মুদ্রিত ফর্ম	ইডিআই, অনলাইন ডাটাবেজ
পেমেন্ট প্রদান এবং গ্রহণ	ডাক	ইডিআই, ইএফটি

সূত্র: "E-Commerce and Concerns for E-Commerce in Bangladesh", *Journal of the Institute of Bankers Bangtladesh*, vol. no. 48.

৪. ই-কমার্সে অংশগ্রহণ করতে যা যা প্রয়োজন

ই-কমার্সে লেনদেন করতে হলে প্রয়োজন একটি কম্পিউটার তা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং অথবা অন্য কোনোপ্রকার নেটওয়ার্ক সংযোজিত থাকুক বা না থাকুক, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অর্থপরিশোধের জন্য ক্রেডিট কার্ড বা মাস্টার কার্ড অথবা এটিএম কার্ড অথবা অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম। এছাড়া অনলাইন অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকরণ, অর্ডারিং এবং লেনদেন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় করতে প্রয়োজন সফ্টওয়ার। উপরিউক্ত হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার এবং অন্যান্য সাপোর্ট সার্ভিস ও প্রযুক্তিগত উপকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে ই-কমার্স অপারেশনের স্তরের উপর।

ই-কমার্স অপারেশনের স্তর

ই-কমার্স অপারেশনের স্তর একবারে সাধারণ ওয়েবসাইট থেকে হতে পারে সম্পূর্ণ সয়ংক্রিয় পরিপূর্ণ অনলাইন ওর্ডারিং, প্রসেসিং এবং লেনদেন ব্যবস্থা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায় পদ্ধতি যা ফ্রন্ট অফিস ও ব্যাক অফিসকেও অনলাইন পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় করে। একটি সাধারণ ওরেয়বসাইটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার তথ্য প্রদান এবং পরবর্তী সমুদয় কার্যক্রম ব্যক্তিগতভাবে অথবা কুরিয়ার কিংবা অন্য কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা করাকেও ই-কমার্স অপারেশন বলে গণ্য করা হয়। এই স্তরকে ই-কমার্স অপারেশনের নিম্ন স্তর বলে ধরা হয়। আর সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অফারিং, ওর্ডার প্রসেসিং এবং অনলআইন লেনদেন ও বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা সংবলিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে ই-কমার্স অপারেশনের উচ্চস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। ই-কমার্স অপারশনের মাত্রা পরিবেশ, ব্যবসায়ের প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অনুসন্ধিৎসু মনোভাব, প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ, প্রতিযোগী ও ক্রেতা-ভোক্তাদের চাহিদা এবং দেশের প্রযুক্তি, অর্থ সংক্রান্ত এবং আইনগত অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে। একারণে পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান ভেদে ই-কমার্স অপারেশনের মাত্রায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় (Kendall et. al, 2001)। ভিন্ন ভিন্ন ই-কমার্সের জন্য হার্ডওয়ার, সফ্টওয়ার ও অন্যান্য অবকাঠামোমূলক সুবিধা ও উপকরণাদির চাহিদার পার্থক্য দেখা যায়।

ই-কমার্স অপারেশনের জন্য হার্ডওয়ার, সফ্টওয়ার ও অন্যান্য অবকাঠামোমূলক সুবিধা ও উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন। ই-কমার্স অপারেশনের জন্য অনুকূল টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার, সফ্টওয়ার, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অর্থ সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং অনুকুল আইনগত ও পলিসি নির্দেশনা অপরিহার্য (ITRC, 2002)।

টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো

ই-কমার্সের জন্য একটি উন্নত এবং দক্ষ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো অপরিহার্য। ই-কমার্সে অফার, ওর্ডার, বিভিন্নপ্রকার অনুসন্ধান প্রসেসিং ও পেমেন্ট পরিশোধ-গ্রহণ অনলআইনে সম্পন্ন হয় এছাড়া সার্ভিসের ক্ষেত্রে ডেলিভারিও অনআইন ডাটা প্রসেসিং-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সুতরাং এই যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি বা ব্যান্ডওয়াইডথ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ই-কমার্সের প্রধান ইস্যু। ব্যান্ডওয়াইডথ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি ই-কমার্স অপারেশনের স্তর ভেদে ভিন্নভাবে নিশ্চিত করা হয়। কোনো কোনো অপারেশনের জন্য বিশেষ করে উচ্চস্তরের পরিপূর্ণ ই-কমার্সের জন্য ব্যান্ডওয়াইডথ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবার নিম্ন স্তরের ই-কমার্সের জন্য এই ইস্যুটি অতটা সংবেদনশীল বলে পরিলক্ষিত হয় না। অনলআইন

পেমেন্ট ব্যবস্থার জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Fire wall এবং Encryption mechanism এর মাধ্যমে অন-লাইন অপারেশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। অপরদিকে সার্ভিস-বেজড পূর্ণ মাত্রার ই-কমার্স অপারেশনের জন্য উচ্চ ব্যান্ডওয়াইডথ অত্যন্ত জরুরি।

হার্ডওয়ার

টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামোর মতো হার্ডওয়ারের প্রয়োজনীয়তাও ই-কমার্স অপারেশনের স্তরভেদে ভিন্ন হয়। উচ্চ ট্রাফিক ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার প্রয়োজন অন্যদিকে নিম্ন ট্রাফিক সাইট অনায়াসে একটি সাধারণ পেন্টিয়াম কনফিগারেশনের কম্পিউটার দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব। একটি সাধারণ পেন্টিয়াম III, পেন্টিয়াম IV বেজড সার্ভার যা অন্ততপক্ষে প্রতিদিন একশত ক্রেতা-ভোক্তার সাপোর্ট দিতে সক্ষম। অন্যদিকে একটি উচ্চ ট্রাফিক সাইটের হার্ডওয়ার চাহিদা নির্ভর করে প্রতি সেকেন্ডে লেনদেনের সংখ্যা, প্রতি সেকেন্ডে হিটের সংখ্যা, প্রতি সেকেন্ডে অনুসন্ধানের সংখ্যা, প্রতি সেকেন্ডে প্রক্রিয়াকরণকৃত পেজের সংখ্যা ইত্যাদির উপর। এছাড়া উচ্চ ট্রাফিক সাইটের হার্ডওয়ার নির্বাচনের সময় বিবেচনা করতে হয় ব্যাক-আপ সার্ভারের প্রয়োজন আছে কি না? যা প্রাইমারি সার্ভারের যেকোনো সমস্যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেশন চালু রাখবে।.

সফ্টওয়ার

ই-কমার্স অপারেশনের জন্য এখন অসংখ্য সফ্টওয়ার ইন্টারনেটে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যেমন, Apache Web Server, Apache-Jserv Servlet Engine, Linux Operating System, my SQL database, postgresql ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার ই-কমার্স অপারেশনের প্রয়োজনে এই সফ্টওয়ারসমূহ সকল সময় যথোপযুক্ত নাও হতে পারে। উচ্চ মাত্রা ও স্তরের ই-কমার্স অপারেশনের প্রয়োজনে সফটওয়ার ডেভেলপ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা

যেহেতু ই-কমার্সের ক্ষেত্রে হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং এই সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর এবং সফ্টওয়ার ডেভেলপার উভয়েরই অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর এর অবশ্যই কম্পিউটার হার্ডওয়ার সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং e-commerce অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অপারেটিং সফ্টওয়ার যেমন, Apache, mySQL এবং Java Servlet bEngine ইত্যাদি ইনস্টলেশন এবং কম্পাইল করার কাজে দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইসাথে হার্ডড্রাইভ, মাদারবোর্ড, প্রসেসর সহ প্রযোজনীয় যন্ত্রাংশ আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রযোজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা অপরিহার্য।

অন্যদিকে সফ্টওয়ার ডেভেলপারের high level language সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সহ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। তাকে জানতে হবে কিভাবে ই-কমার্স পরিচালিত হয়। ই-কমার্সের ডাটা প্রবাহ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযোজনীয় মডিফিকেশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্ধারিত বিষয়ের জ্ঞান ছাড়াও একজন ডেভেলপারের C, PHP, Java, SQL programming, এবং data architechture সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আর্থিক অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় আইনগত এবং নীতি নির্ধারনমূলক সুযোগ সুবিধা

আর্থিক লেনদেন একটি ব্যবসায়িক চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যেকোনো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আর্থিক লেনদেন অপরিহার্য। আর্থিক লেনদেন হলো বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য বা সেবার মূল্য প্রাপ্তির উপায়। এইজন্য ক্রেতা-বিক্রেতারা ব্যাংকিং সেবার উপর নির্ভর করে। ক্রেতা-বিক্রেতাগণ সাধারণত তাদের নিকটবর্তী ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সমাধা করে থাকে। পরিপূর্ণ মাত্রার ই-কমার্স অপারেশনের জন্য উপযুক্ত ব্যাংকিং বা আর্থিক লেনদেন সুবিধা অপরিহার্য। এজন্য অনলাইন ব্যাংকিং অপারেশন এবং নিরাপদ লেনদেন ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাংকিং অপারেশন, ব্যাংকিং অপারেশনে ওয়ান (WAN) এবং ইন্টরনেটের ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ফানড ট্রান্সফার ব্যবস্থার প্রচলন, ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার প্রচলন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন, অনলআইন পেমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করণ, বৈদেশিক বিনিময় রেমিটেন্স পদ্ধতি ইন্টানেটের মাধ্যমে পরিচালনা ইত্যাদি জাতীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ই-কমার্সের ব্যাপক প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

ই-কমার্সের জন্য প্রয়োজন অনায়াসে বিনা বাধায় ডিজিটাল যোগাযোগ এবং চুক্তি সম্পাদন। ডিজিটাল কন্ট্রাক্ট, বিভিন্ন প্রকার অনলাইন যোগাযোগ ও ডকুমেন্টেশন এবং অনলআইন যোগাযোগ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতারণা ও হয়রানি থেকে ক্রেতা সাধারণকে রক্ষা করার স্বার্থে ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ আইন সহ বিভিন্ন প্রকার আইন ও সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

ই-কমার্সে ভোক্তা খুঁজে বের করা অথবা প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনকারী কিংবা সরবরাহকারী খুঁজে বের করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা শুধু মাত্র একটি মিডিয়া নির্ভর বলে যে কোনো স্থানে বসে যে কোনো সময়ে ক্রেতা বিক্রেতা সংযোগ সাধন এবং তা রক্ষা করা সম্ভব। এই সুবিধাটি ই-কমার্সকে প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য হতে আলাদা করেছে সেই সাথে এই ব্যবসা পদ্ধতিতে বিক্রেতা ও গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। সময়, স্থান এবং বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা দূর করার মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। পরিবর্তনের এই হাওয়া মানুষকে করে তুলছে সদা কর্মচঞ্চল । যেকোনো সময় যেকোনো স্থান বা পরিবেশ থেকে ই-কমার্সের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা যায় বলে এখন উন্নত বিশ্বে ব্যবসায়ীদের প্রচলিত অফিস সময়সূচির অনুসরণ করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের প্রধান কার্যালয় কিংবা ব্যবসায় অফিসে যাবার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।

৫. ই-কমার্সে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ই-কমার্স একটি প্রযুক্তি নির্ভর লেনদেন ব্যবস্থা। যার উন্নয়নের সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সরাসরি ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে ই-কমার্সের ব্যাপকতা বৃদ্ধির বিষয়টি জড়িত। বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নয়নে মন্থরতা পরিলক্ষিত হলেও এদেশের যুবসমাজ এবং বিভিন্ন ব্যবসায় ও সরকারি কর্তৃপক্ষের মনোভাব এদেশের আইটি শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

যেহেতু ই-কমার্সের জন্য প্রযোজন ইন্টারনেট সুতরাং দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং গতি এদেশের ইন্টারনেট পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক

সমস্যার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ঘনত্ব এখনো এদেশের নগণ্য কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের তুলনায় অনেক কম। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের ১০টি ফোন কলের মধ্যে গড়ে দুইটি ফোন কল সফলভাবে সম্পন্ন হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত এবং চীনের তুলনায় যা অত্যন্ত নগণ্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১০টি কলের মধ্যে নয়টি, চীনে ৮টি, ভারতে ৬টি এবং পাকিস্তানে ৫টি কল সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের টেলিফোনের ঘনত্ব দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের ১০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে বর্তমানে ২ জনের টেলিফোন সংযোগ আছে। যেখানে প্রতি হাজারে ভারতের ১১ জন, পাকিস্তানের ১৬ জন এবং শ্রীলঙ্কার ১০ জন অধিবাসী টেলিফোন সুবিধা ভোগ করছে (Ahmad, 2003)। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া এদেশ থেকে ইন্টারনেট সংযোগের আর কোনো উপায় নেই। পৃথিবী ব্যপী ইন্টারনেট সংযোগের জন্য নির্মিত ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা সাবমেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে সংযোগ না থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিশ্ববাজার এবং আইটি পেশা ও সফটওয়ার সংক্রান্ত নানান সুযোগ-সুবিধাসমূহ সম্পর্কে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও এর সুবিধাদি গ্রহণ করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ই-কমার্সে বাংলাদেশের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মানব সম্পদের উন্নয়ন। বাংলদেশের আইটি সেক্টরে যোগ্যতর মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগ। ই-কমার্সের নিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানসহ এদেশের গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে ব্যাপক অর্থসংস্থানের প্রয়োজন। বাংলাদেশের যুব সমাজকে আইটি-মুখী এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের যুগপৎ কর্মসূচি প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আইটি বিপ্লবের এই যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার উপযোগী এদেশের মেধাবী আইটি শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তার সুবিধা বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারছে না । কারণ উচ্চ বেতন সুবিধার কারণে এসব অমূল্য মেধার অধিকারী ব্যক্তিগণ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। টেক বাংলা কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, আইটি সেক্টরে বাংলাদেশের ৮১ জন শিক্ষক এবং ৮৫.২% শিক্ষার্থীর বিদেশে অভিবাসনের পরিকল্পনা আছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে যাদেও সম্ভাবনা রয়েছে তাদের জন্য উচ্চ বেতন নির্ধারণ এবং আন্তরিক শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মেধা পাচার রোধ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ই-কমার্সের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ এবং ই-কমার্সে লেনদেনে আগ্রহী ক্রেতা-বিক্রেতার সংকট না থাকলেও ডিজিটাল ক্যাশ ট্রান্সফার ব্যবস্থার প্রচলন না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় আইন না থাকায় এদেশে ই-কমার্সের ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কপি রাইট অ্যাক্ট ২০০০ নামে একটি আইন পাশ করেছে। এই আইনটি এককভাবে দেশের আইটি শিল্পের উন্নয়নে সংঘটিত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং ই-কমার্সের অবাধ প্রয়োগ ও বিভিন্ন জটিলতা নিরসনে সক্ষম নয়। এদেশের আইটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কম্প্রিহেনসিভ আইটি অ্যাক্ট যা বিভিন্ন উন্নত দেশে ইতিমধ্যেই পাশ এবং চর্চা শুরু হয়েছে। অবাধে ডিজিটাল ক্যাশ ট্রান্সফার এবং ডিজিটাল লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সহায়ক সাইবার 'ল' অথবা ই-কমার্স আইন। দেশের আইটি শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারের মাধ্যমেই ই-কমার্সের ব্যাপক প্রচলন এবং প্রসার সম্ভব। এ কারণে দ্রুততার সাথে

উন্নততর এবং উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ সহ বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সফটওয়ার পার্ক এবং আইটি ভিলেজ সমূহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৬. বাংলাদেশে ই-কমার্সের সম্ভাবনা

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের প্রধান অংশ এবং জনসাধারণের মাথাপিছু আয় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অত্যন্ত কম। নিম্ন শিক্ষার হার, উচ্চ মাত্রার বেকারত্ব এবং নিম্ন মাথাপিছু আয় এদেশে ই-কমার্সের প্রচলনের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক হলেও, বিশ্বব্যাপী তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও বিশ্বায়নের ফলে সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল এবং ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের প্রয়োগ ই-কমার্সের প্রচলনকে জনপ্রিয় করেছে। এই প্রভাবে ক্রমেই প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য রীতির পরিবর্তে ই-কমার্স নির্ভরযোগ্য, ব্যয়-সাশ্রয়ী, দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং স্বচ্ছ মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ই-কমার্সে অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো উপায় নেই। ই-কমার্স ইন্টারনেট নির্ভর একটি ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা। বর্তমানে বাংলাদেশের টেলিফোন ব্যবহারকারী এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্রম বৃদ্ধি এদেশে ই-কমার্সের প্রচলনের ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে। দেশের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের সবগুলোই এখন অন-লাইনে প্রচার শুরু হয়েছে। অনেক সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। ঢাকা শহর সহ বিভিন্ন শহরের সর্বত্রই সাইবারক্যাফে গড়ে উঠেছে। যা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাহয্যে ক্রয় বিক্রয় সহ বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি করছে। এছাড়া ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-কমার্সের বহুমুখী ও বিশেষায়িত সুবিধাসমূহ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ক্রেতা-বিক্রেতাকেও আলোড়িত করে (Nuruzzaman, 2002)। যেমন:

- পণ্য ও সেবার প্রসারে সুবিধা;
- পণ্য সম্পর্কে তথ্যের সহজলভ্যতা;
- বিস্তৃত বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার কারণে কম খরচে উন্নত গুণাগুণ, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পরিমাণে বেশি পণ্য ও সেবার নিশ্চয়তা;
- কম খরচে অধিক সংখ্যক ক্রেতার কাছে বিজ্ঞাপন প্রচার;
- পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ক্রেতা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দ্রুত সেবা প্রদান;
- মধ্যস্থকারীর সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহে দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সাধারণ অফিস সময়ের পরেও লেনদেনের সুবিধা; এবং
- ই-মেইল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা তথ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বিটুসি ই-কমার্স

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, মাথাপিছু নিম্ন আয়, কম অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা, দুর্বল তথ্যভিত্তি এবং বিশ্বস্ততার অভাব, অনলাইন পেমেন্টের সীমাবদ্ধতা, সচেতনতার অভাব, অপর্যাপ্ত অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা, দুর্বল পণ্য ও সেবা সরবরাহ পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় আইন সহায়তার অভাব এদেশে বিটুসি ই-কমার্সের প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। নিম্ন মজুরি, উচ্চ বেকারত্বের হার এবং নিম্ন কর্মসংস্থানের এ দেশে ক্রয় বিক্রয় অথবা যেকোনো লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার শারীরিক উপস্থিতি অপরিহার্য (Hossain, 2000)।

এছাড়া ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এদেশে বিটুসি ই-কমার্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক।

বিটুবি ই-কমার্স

বাংলাদেশে বিটুবি ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পায়তন হলেও বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই বিটুবি ই-কমার্সের প্রচলন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তৈরি পোশাক শিল্পে ই-কমার্সের ব্যবহার প্রায় প্রচলিত। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান ৭৫%। যার পরিমাণ বার্ষিক ৪.৩৫ বিলিয়ন ডলার।

২০০৫ সালের পর কোটা এবং জিএসপি সুবিধার বিলুপ্তির পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এই প্রতিযোগিতার পরিবেশে নিজেদের অবস্থান সুসংহত রাখতে নতুন বাজার খুঁজে বের করা, ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত নির্ধারণ, প্রতিযোগিতার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ , কাঁচামাল ও সহায়ক উপকরণাদির উৎস খুঁজে বের করা ও নির্বাচন, অর্ডার গ্রহণ ও প্রদান এবং পণ্য ও সেবার ডেলিভারি গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ই-কমার্সে অংশগ্রহণ আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে সহায়ক অবকাঠামোমুলক সুযোগ সুবিধা যেমন, অর্থ ও আইন সংক্রান্ত অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন।

ই-কমার্স বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে সরকার, বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং জনসাধারণের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অর্থ উপার্জনকারী এই শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাবনাময়ী শিল্প, যেমন– চা, হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, সবজি ও অন্যান্য পণ্য বা সেবার রপ্তানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বিটুজি ই-কমার্স

সরকারি কর্মকাণ্ডে ই-কমার্সের প্রচলন বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। বিটুজি ই-কমার্সের প্রচলন এদেশের সরকারি ক্রয় ও সংগ্রহ ব্যবস্থাতে স্বচ্ছতা আনয়ন করবে। বাংলাদেশে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার এককভাবে সর্ববৃহৎ ক্রেতা বা সংগ্রহকারী। সরকার টেন্ডারের মাধ্যমে এই ক্রয় কার্য সমাধা করে। সরকারি এই ক্রয় বা সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সকল সরবরাহকারী সমানভাবে অংশ নিতে পারে না। অবস্থানগত দূরত্ব, পেশিশক্তি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নৈতিক স্খলনের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সরবরাহকারী নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। ত্রুটিপূর্ণ ক্রয় বা সংগ্রহ প্রক্রিয়া সরকারি অসংখ্য কাজের অদক্ষতার কারণ।

সরকার সাধারণত জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে ক্রয় বা সংগ্রহ সংক্রান্ত খবরা খবর এবং নিয়মাবলি প্রচার করে থাকে। কাগজে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন ফর্ম এবং ডকুমেন্টস নির্ধারিত অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আত্মীয়করণ, রাজনৈতিক প্রভাব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনৈতিক আচরণ, ঘুষ প্রথা

এবং অবস্থানগত দূরত্বের কারণে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ অনেক সরবরাহকারীর কাছে দুরূহ হয়ে পড়ে। যার ফলে অনেক যোগ্য সরবরাহকারী টেন্ডারে অংশ নিতেই পারে না। এক্ষেত্রে যদি টেন্ডার প্রচার, সমুদয় ডকুমেন্টস সরবরাহ এবং কোটেশন সংগ্রহের কাজগুলো অনলাইনের মাধ্যমে সমাধা করা যায় তাহলেই এই সুবৃহৎ সেক্টরের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব। বাংলাদেশে বিটিটিবি–র সহায়তায় কিছু কিছু টেন্ডারের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য

বিতরণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই এদেশে ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা দেশে বিটুজি ই-কমার্স প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ।

ই-কমার্সে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা, আইনগত সুবিধা এবং উপযুক্ত জনবল থাকলেই ই-কমার্সের ব্যাপক প্রচলন বা প্রসার নাও হতে পারে। ই-কমার্সের ফলপ্রসূতা আনয়নের জন্য লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের ই-কমার্সে অংশগ্রহণ করার সদিচ্ছা এবং বিশ্বস্ততা প্রয়োজন।

৭. উপসংহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষকরে ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশ্বব্যাপী এর বিভিন্নমুখী ব্যবহার ও দ্রুত বিস্তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে, সূত্রপাত ঘটিয়েছে এক নবতর বাণিজ্য ধারার। সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এই বাণিজ্য ব্যবস্থা 'ইলেক্ট্রনিক কমার্সে ' অংশ নিয়ে নিজেদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুদৃঢ় করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি, সরকার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আমেরিকা এবং উন্নত দেশগুলোর অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্ভাবনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী দ্রুতবর্ধনশীল ইলেক্ট্রনিক বাজারের একটি বৃহৎ অংশ অর্জনের জন্য এশিয়ার দেশগুলোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারতসহ এশিয়ার অনেকদেশ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎমুখিতা, সীমাহীন দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ নানা দিকে পিছিয়ে থাকলেও এই সেক্টরে বিশেষ অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্য মহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হলেও দেশের বিভিন্ন সেক্টরে এর কাম্য ব্যবহার এখনো নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়নি। সরকারি পৃষ্ঠপোষণা, প্রযুক্তির কাম্য ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ইলেক্ট্রনিক কমার্সের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারলে এদেশের সরকার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-কমার্সে অংশগ্রহণের উৎসাহ ও উদ্যোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। যা নিশ্চিতভাবে এদেশের বাণিজ্য, লেনদেন ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নসহ দেশীয় পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি ও প্রত্যাশিত ক্রেতা আকর্ষণের নবতর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যপঞ্জি

হোসেন, মোঃ আলমগীর ও খান, মোঃ আজিজুর রহমান (২০০০), *ইলেক্ট্রনিক কমার্স: আগামী দিনের ব্যবসা*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী।

Ahmad, Banajir (2003), "Prospect of It–sector in Bangladesh", *The Bangladesh Observer* (Dhaka), April 5.

Azam, Md. Shah (2006), "Implementation of B2C E-Commerce in Bangladesh: The Effects of Buying Culture and E-Infrastructure", *Advances in Global Business Research*, Dianne H.B. Welsh, Mohd. Shukri Ab Yajid, Valentin H. Pasthenko and Zafar U. Ahmed (eds.), Vol. 3, No. 1: 55-66.

Azam, Md. Shah (2007), "Internet adoption and Usage in Bangladesh", *Japanese Journal of Administrative Science,* Vol. 20, No. 1:43-54.

Azam, Md. Shah (2007), "E-Commerce in Bangladesh: Understanding SMEs Intention and Exploring Barriers", *Journal of Business Studies*, Vol. 2, No.1.

Chaudhury, Abhijit and Kuilboer, Jean-Pierre (2002), *e-Business and e-Commerce Infrastructure Technologies Supporting the e-Business Initiative*, International ed., New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Goecart (2006), "E-Commerce Market Size and Trends", goecart.com/ecommerce_solutions_facts.asp

Hossain, Najmul (2000), "E-Commerce in Bngladesh: Statutes, Potentials and Constraints", www.,iris.umd.edu/publications/..., accessed 13 January 2004.

ITRC (2000), "E-Commerce in Bangladesh: A Readiness Assessment," http:/ www.itrc.techbangla.org./ accessed 13 June 2004.

Joseph, P.T. (2002), *E-Commerce a Managerial Perspective*, New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.

Kendall, J. D., Tung, L. L., Chua, K. H., Ng, C. H. D. and Tan, S. M. (2001), "Receptivity of Singapore's SME to Electronic Commerce Adoption", *Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 10:223-242.

Kosiur, D. (1997), *Understanding Electronic Commerce*, cited in *Journal of the institute of Basnkers Bangladesh*, vol. 48:89-90.

Nuruzzaman, Md. (2002), "Electronic Commerce in Bangladesh-Its Opportunites and Challenges," *Journal of Marketing*, Vol. 3.

Rahman, M.Lutfar (2002), "E-Commerce and Concerns for E-Commerce in Bangladesh", *Journal of the Institute of Bankers Ban*gladesh, Vol. 48:89-90.

UNCTAD (2003), "E-Commerce and Development Report 2003", Internet edition prepared by the UNCTAD secretariat, New York and Geneva: United Nations, cited at http:// www.unctad.org/ecommerce/, accessed 7 June 2004.

UNCTAD (2004), "E-Commerce and Development Report 2004", Geneva: United Nations, http://www.unctad.org, accessed 10 October 2005.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড

মো. রুহুল আমিন*

Abstract: Functions of the Parliament are undoubtedly more significant as a pivot of democracy and as a superior organization for establishing transparency and accountability in the State management. The Fourth Parliament of Bangladesh during its period under the Presidential form of government performd—law making, constitution amendment and executive control, which the researcher tried to discuss in this article.

ভূমিকা

আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। আইনসভা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন। দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব আইনসভার। আইনসভা দেশের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আইনসভা জনমতের ভিত্তিতে যে আইন বা বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে, তা রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ কার্যকর করে থাকে, বিচার বিভাগ আইন মোতাবেক বিচার করে থাকে। এভাবে আইনসভা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বত্র শক্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয় এবং জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে।

একটা উপ-ব্যবস্থা হিসেবে আইনসভার ভূমিকার ওপর তার নিজস্ব বৈধতা নির্ভর করে এবং তা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। আইনসভার বৈধতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার সিদ্ধান্তমূলক কাজের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর। সে জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্যগণ, বিশেষ করে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ আইন প্রণয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ পান কিনা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সংসদীয় পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় কিনা এবং সর্বোপরি আইনসভার সদস্যগণ সরকারের নীতি বা কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারেন কিনা এগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যদি আইনসভা কেবল 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে কাজ করে এবং বিরোধী দলসমূহ আইনসভার মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত বা নীতিসমূহ প্রভাবিত বা সংশোধন করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা আইনসভার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনসভার বাইরে সহিংস আন্দোলনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট করে। এভাবে আইনসভা তার কার্যকারিতা হারায় এবং গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ক্ষুণ্ন হয়।

---

* ড. মো. রুহুল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে, যার নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদ পাঁচ বছরের জন্য ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। জাতীয় সংসদের অধিকার এবং স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন স্পিকার। জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও পরীক্ষণ সর্বত্রই করা হয়। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, বিচার সংক্রান্ত ও সংবিধান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে।

রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ২৪শে মার্চ ১৯৮২ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেও প্রধান বিরোধী দলসমূহ এরশাদ সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এরশাদের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আটদল, সাতদল ও পাঁচদল আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ৩রা মার্চ ১৯৮৮ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে প্রধান বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। নির্বাচনে কেবল জাসদ-এর দুটি উপদল জাসদ (রব) ও জাসদ (সিরাজ) অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচনে খুব কমসংখ্যক ভোটার ভোটদান করেন। নির্বাচনে সরকারও ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে। সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৫১টি, সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি, জাসদ (সিরাজ) ৩টি, ফ্রিডম পার্টি ২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৫টি আসন লাভ করে। প্রধান বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচন বর্জন করলে নির্বাচন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদ তার সময়কালে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে কী পরিমাণ আইন প্রণয়ন করেছে এবং তা কার্যকর করার লক্ষ্যে কী জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে তা উপস্থাপন করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১. আইন প্রণয়ন

গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কেন্দ্র হিসেবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদের কার্যাবলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, ৩রা মার্চ ১৯৮৮ নির্বাচিত বাংলাদেশের চতুর্থ পার্লামেন্ট ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ভেঙে দেওয়া হয়।[১] এবং এই সময়কালে পার্লামেন্ট সাতটি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্য দিবসে ৮০৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ করে।[২]

আইন প্রণয়ন আইনসভার প্রধান কাজ। প্রত্যেক আইনসভা নির্দিষ্ট সাংবিধানিক সময়-সীমার মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওপর সংবিধানের ৮০ থেকে ৯২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।[৩] তত্ত্বগতভাবে বিশ্বের প্রায় সব দেশের আইনসভার সংসদ সদস্যদের বিল উত্থাপনের অধিকার

---

[১] Khalada Habib, *Bangladesh Elections, Parliament and the Cabinet* (Dhaka: Book Syndicate, 1991), p. 99; Ahmad Ullah, *Fifth National Assembly members Documentary Compilation* (Dhaka: Shuchayan Prokashan, 1992), pp. 30-31.

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

[৩] *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, (Dhaka: Government of Bangladesh, 1996), Article-80-92, pp. 66-72.

থাকলেও সরকারের ধরন অনুসারে এ অধিকারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক এই অধিকারের প্রয়োগ খুবই কম দেখা যায়। কারণ বর্তমান কালে দলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত হবার প্রেক্ষাপটে সংসদ সদস্যরা দলীয় মন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, বেসরকারি কাজের জন্য পার্লামেন্টের কার্যসূচিতে পর্যাপ্ত সময়ের অভাব, বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিলগুলো টেকনিক্যাল গাইডেন্স হতে বঞ্চিত, অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের একটা প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ পার্লামেন্টেও বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে।[৪]

বাংলাদেশের চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ১৫৩টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সরকারি বিলের নোটিশের সংখ্যা ছিল ১৪৬টি এবং বেসরকারি বিলের নোটিশ ছিল ৭টি। প্রাপ্ত মোট ১৫৩টি বিলের মধ্যে ১৪৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলের ১৪২টি ছিল সরকারি ও ২টি ছিল বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল। উত্থাপিত ১৪৪টি বিলের মধ্যে ১৪২টি বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যার সবগুলোই ছিল সরকারি বিল।

সারণি ১ : চতুর্থ পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতি আমলে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশনওয়ারি সংখ্যা

অধিবেশন	বিলের নোটিশের সংখ্যা	স্পিকার কর্তৃক গৃহীত বিলের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা
প্রথম অধিবেশন ২৫.৪.৮৮-১১.৭.৮৮	৪০	৩৯	৩৯	৩৮
দ্বিতীয় অধিবেশন ১৬.১০.৮৮-১৯.১০.৮৮	৮	৭	৭	৭
তৃতীয় অধিবেশন ১.২.৮৯-২.৩.৮৯	২৩	২১	২১	২১
চতুর্থ অধিবেশন ২২.৫.৮৯-১০.৭.৮৯	১৯	১৮	১৮	১৭
পঞ্চম অধিবেশন ৪.১.৯০-৮.২.৯০	৩২	২৯	২৯	২৯
ষষ্ঠ অধিবেশন ৩.৬.৯০-১.৮.৯০	৩১	৩০	৩০	৩০
সপ্তম অধিবেশন ২৫.৮.৯০-২৫.৮.৯০	-	-	-	-
মোট	১৫৩	১৪৪	১৪৪	১৪২

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

১.১ অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

সাধারণভাবে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে পার্লামেন্টের ওপর। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট যখন অধিবেশনরত না থাকে অথবা পার্লামেন্ট যখন বিলুপ্ত তখন জরুরি পরিস্থিতি (Urgent situation or extreme necessity) মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন এবং অনুরূপ অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় (as an Act of Parliament) সমান ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।[৫]

---

[৪] Aminur Rahman ,"Bangladesh Parliament : Its Working (1973-1982)" [unpublished Ph.D. thesis], (Rajshahi University, 1996), p. 143.

[৫] Md. Abdul Halim, *Constitution, Contitutional Law and Politics : Bangladesh Perspective* (Dhaka: Rico Printers, 1997), p. 229.

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ ভেঙে গেলে, অথবা সংসদেও অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে তাহলে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন।[৬] অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদনের জন্য সংসদের পরবর্তী প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে। উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদে অধ্যাদেশের অনুরূপ বিল পাস হতে হবে; অন্যথায় ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এর কার্যকারিতা লোপ পাবে।[৭]

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ১৫৩টি সাধারণ বিলের নোটিশের মধ্যে ১৪৪টি সংসদে উত্থাপনের জন্য স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলোই সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ১৪২টি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়; যার মধ্যে ৫৩টি ছিল মৌলিক এবং ৮৯টি অধ্যাদেশ। চতুর্থ পার্লামেন্ট আমলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৯২টি অধ্যাদেশ জারি করেন। তন্মধ্যে ৯১টি অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ২টি অধ্যাদেশ অনিস্পন্ন থেকে যায়। অর্থাৎ সংবিধানের বিধানানুযায়ী অধ্যাদেশগুলো আইনের মর্যাদা হারায়। ৮৯টি অধ্যাদেশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

অধ্যাদেশ জারির সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতি সংসদকে অবমূল্যায়ন করে জরুরি নয় এমন গুরুত্বহীন বিষয়েও অধ্যাদেশ জারি করেন, যেমন: The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, 1988, The President's Pension (Amendment) ordinance, 1988, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) ordinance, 1988, The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, 1988, The Vice-President (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, ১৯৮৮, উপ-প্রধানমন্ত্রীর (পারিশ্রমিক ও বিশেষ অধিকার) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮, উল্লেখ করা যায়। এভাবে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির কঠোর সমালোচনা করে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, সংসদ নেতা, মাননীয় মন্ত্রী যেভাবে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীদের ঐচ্ছিক মঞ্জুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছেন তাতে মনে হয়, কালকে হয়তো আমাদের সংসদ সদস্যদের জন্যও ঐচ্ছিক কোনো মঞ্জুরির ব্যবস্থা করা হবে। এর পরে যারা সংসদের দর্শক আছেন, তাদেরও হয়তো একটা ব্যবস্থা করা হবে।[৮] জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম বলেন, সংসদের কার্য ক্ষমতা দিন দিন যেভাবে কমে যাচ্ছে, তাতে দিন দিন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের আনুতোষিক ভাতা এবং পেনশন ইত্যাদি যেভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, আমার মনে হয়, মাননীয় স্পিকার এসবের কোনো যুক্তি নেই। আর্থিক শক্তি না বাড়িয়ে সংসদের শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব রাখছি।[৯] এমনকি, পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু করার পূর্বে ও পরেও অধ্যাদেশ জারি করার নজির পরিলক্ষিত হয়। এই অধিবেশনের বিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ বা মৌলিক বিল অপেক্ষা অধ্যাদেশের পরিমাণই ছিল বেশি। অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করে সংসদের

---

[৬] *The Constitution of the People's* ..., p. 75.

[৭] Aminur Rahman, p. 145.

[৮] বিতর্ক, খণ্ড১, সংখ্যা-৬, ৫ মে, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

[৯] বিতর্ক, খণ্ড১, সংখ্যা-৮, ৯ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫৪-৪৫৮।

অনুমোদন চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিলগুলো পাস করার তাগিদ প্রদান করেন। এবং দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার অনায়াসে উক্ত অধ্যাদেশগুলোকে সংসদে বৈধ করে নেয়।

১.২ সংসদে আলোচনা

পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হলে সেখানে সংসদ সদস্যরা যেমন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করতে পারেন অন্যদিকে জনগণও বিল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে পাসকৃত বিলগুলো নিখুঁত ও উন্নত হয় এবং এর গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে গৃহীত ১৪২টি সাধারণ বিলের মধ্যে ১১৩টির ওপর আলোচনাপর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৯টি কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। তবে লক্ষণীয় যে, ১১৩টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও এর মধ্যে শুধুমাত্র ৩৭টির ওপর যথার্থ এবং ৭৬টির ওপর খুবই কম আলোচনায় বিল পাস হয়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলগুলোর ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিল উত্থাপনের সাথে সাথে তা পাস করার তাগিদ প্রদান করলে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা বিরোধী দলকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কণ্ঠভোটে সহসাই তা পাস করে নেন। সংসদে বিরোধী দলীয় স সংসদ সদস্য জনাব খন্দকার মফিজুর রহমান রোকন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "সরকারি দলের পক্ষ থেকে যে বিলগুলো হাউসে আসবে সেই বিলগুলোই পাস হবে, আমরা যতো বিরোধিতাই করি না কেন যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সেহেতু পাস হবেই। সরকারি দল থেকে যদি বিল আসে যে সূর্য উত্তর দিকে ওঠে, তাই পাস হয়ে যাবে। কাজেই আমি মনে করি, সরকারি দলের সকল সংসদ সদস্যই তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বিবেক সবকিছুই সরকারি দলের কাছে বন্ধক রেখেছে।"[১০] তিনি আরও বলেন, "যতগুলো বিল এই মহান সংসদে এসেছে সবগুলোই পাস হয়ে গেছে। আগামীতে যত বিল হাউসে আসবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সব বিলই পাস হয়ে যাবে। আমাদের বক্তব্য, আমাদের আলোচনা, গঠনমূলক সমালোচনা সব কিছুই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।"[১১]

বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের যুক্তি, সমালোচনা, মতামত বা পরামর্শকে অবজ্ঞা করে সংসদের মর্যাদাহানি ঘটানোর প্রমাণও মেলে, যেমন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৮৯। এই বিলটির সমালোচনার এক পর্যায়ে আবদুস সাত্তার মাস্টার বলেন, "সেদিন আমরা বিরোধী দল থেকে এই বিলের খুঁটিনাটি দিকগুলো আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু সরকারি দল আমাদের কোনো যুক্তি বা কথায় কর্ণপাত না করে সেদিন শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কণ্ঠভোটে পাস করলেও মাত্র ২ মাস পরে আবারও এই বিল সংশোধিত আকারে সংসদে উত্থাপন করতে হয়।[১২] আমরা মনে করি, আমরা সেদিন যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, সেই বক্তব্য আমাদের সঠিক ছিল।[১৩] আমরা যত যুক্তিতর্কের অবতারণাই করি না কেন, আমাদের

---

[১০] বিতর্ক, খণ্ড১, সংখ্যা-৬, ৫ মে, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

[১১] বিতর্ক, খণ্ড১, সংখ্যা-১২, ২২ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৭৯৬-৮১৮।

[১২] বিতর্ক, খণ্ড৪, সংখ্যা-৮, ৩১ মে, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬-৯৭।

[১৩] বিতর্ক, খণ্ড৪, সংখ্যা-৭, ৩০ মে, ১৯৮৯, পৃ. ৭১।

মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র সরকারি দল থেকে একটা দায়সারা বক্তব্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কণ্ঠভোটে তা পাস করে নেওয়া হয়।"[১৪]

সরকারি বিলগুলো সংসদে উত্থাপনের পূর্বে অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলের পার্লামেন্টারি পার্টিতে আলোচিত হওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ বিলের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সর্বসম্মতিক্রমে বিল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও চতুর্থ পার্লামেন্টে তার কোনো প্রমাণও মেলেনি। সংসদে কোনো বিল উত্থাপনের অন্যূন তিন দিন পূর্বে তার কপি সংসদ সদস্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

১.৩ বিল সংশোধন

সংসদের প্রত্যেক সদস্য সংসদে উত্থাপিত বিলের ওপর সংশোধনী আনার অধিকার ভোগ করে থাকেন। যে সকল সংশোধনী সরকারি উদ্যোগে সংসদে উত্থাপিত হয় সেগুলো সাধারণত দলের পার্লামেন্টারি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ পেশ করে থাকেন।

লক্ষণীয় যে, সংসদে উত্থাপিত বিলের ওপর সংশোধনী উত্থাপনের অধিকার নিয়ে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা চতুর্থ পার্লামেন্টে উত্থাপিত ১৪২টি বিলের মধ্যে ১০৯টি বিলের ওপর ২৬৫ টি বিভিন্ন আকারের সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব ১০৮টি, বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ২৮টি, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ৪টি এবং বিভিন্ন ক্লজের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব ছিল ৭৮টি। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা যে ১০৮টি জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব, ২৮টি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব, ৪২টি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার সবগুলো প্রস্তাবই সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাকচ করে দেন। তবে বিভিন্ন ক্লজের ওপর যে ৮৭টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে শুধুমাত্র ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হলেও ৭৮ টি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠার জোরে নাকচ করা হয়। অর্থাৎ ১৪২টি সাধারণ বিলের মধ্যে শুধুমাত্র ৩টি বিল সংশোধনীসহ এবং ১৩৯টি বিল সংশোধনী ছাড়াই গৃহীত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের কোনো সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার মত মানসিকতা সরকারের ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়।

১.৪ কমিটির ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ওপর জাতীয় সংসদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ তথা জন প্রতিনিধিদের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রায় সব দেশেই কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত এর কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত যে সকল ছোট ছোট সংস্থার ওপর আইন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিস্তৃত বিচার বিবেচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেগুলোকে আইনসভার কমিটি বলে। বিভিন্ন প্রশ্নের খুঁটিনাটি বিবেচনার পর কমিটি এর মন্তব্য ও সুপারিশ রিপোর্ট আকারে আইনসভায় পেশ করলে আইনসভা সহজে ও অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে সংসদের ওপর এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

---

[১৪] বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা-৭, ৩০ মে, ১৯৮৯, পৃ. ৭১।

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ১১টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত এবং গঠন করা হয়। এছাড়া ৩২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পিকার জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদের 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি', ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন এবং ২৪০ বিধি অনুসারে সংসদে ১০ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার' সম্পর্কিত 'স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[১৫]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে স্পিকার ১০ জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে কার্য প্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে 'পিটিশন কমিটি' ও ২৫৭ বিধি অনুসারে 'লাইব্রেরি কমিটি' মনোনীত করেন। এছাড়া কার্য প্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি,' ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' এবং ২৬৪ বিধি অনুসারে 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[১৬]

অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০ জন করে সংসদ সদস্যসমন্বয়ে মোট ৩২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে, অধিবেশনের ১০ম বৈঠকে (১) প্রতি রক্ষা (২) মৎস্য ও পশুপালন, (৩) পররাষ্ট্র এবং (৪) অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[১৭] অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে (৫) সংস্থাপন, (৬) ধর্ম ও (৭) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি,[১৮] অধিবেশনের ১৩তম বৈঠকে (৮) ডাক ও টেলিযোগাযোগ (৯) খাদ্য এবং (১০) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি,[১৯] অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে (১১) তথ্য (১২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২০] অধিবেশনের ১৫তম বৈঠকে (১৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন (১৪) আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২১] অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে (১৫) পূর্ত (১৬) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২২] অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে (১৭) শ্রম ও জনশক্তি, (১৮) সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২৩] অধিবেশনের ১৮তম বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২০) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী

---

[১৫] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-২, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৮।
[১৬] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-৪, ৩ মে, ১৯৮৮।
[১৭] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১০, ১১ মে, ১৯৮৮।
[১৮] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১২, ২২ মে, ১৯৮৮।
[১৯] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৩, ২৩ মে, ১৯৮৮।
[২০] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৪, ২৪ মে, ১৯৮৮।
[২১] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৫, ২৫ মে, ১৯৮৮।
[২২] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৬, ২৬ মে, ১৯৮৮।
[২৩] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৭, ২৯ মে, ১৯৮৮।

কমিটি,[২৪] অধিবেশনের ১৯তম বৈঠকে (২১) যোগাযোগ (২২) নৌ- পরিবহণ (২৩) বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২৫] অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে (২৪) বাণিজ্য (২৫) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২৬] অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে (২৬) ভূমি (২৭) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ,[২৭] অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে (২৮) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (২৯) স্বরাষ্ট্র (৩০) শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,[২৮] এবং অধিবেশনের ২৪তম বৈঠকে (৩১) কৃষি (৩২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[২৯]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে দেশের 'উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে' ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য চতুর্থ অধিবেশনে কমিটি সংসদ সদস্যসংখ্যা আরও ৫ জন বৃদ্ধি করে মোট ১৭ জন করা হয়।[৩০]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদে উত্থাপিত 'দণ্ডবিধি (সংশোধন), বিল ১৯৮৮' সম্পর্কে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[৩১]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পূণর্গঠন, ৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৩২]

অধিবেশনের চতুর্থ ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনে গঠিত কার্য প্রণালী বিধিতে 'স্থায়ী কমিটি'[৩৩] পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে (১) শ্রম ও জনশক্তি (২) মৎস্য ও পশুপালন (৩) নৌ-পরিবহণ (৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং (৫) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন করা হয়।[৩৪]

---

[২৪] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৮, ৩০ মে, ১৯৮৮।
[২৫] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-১৯, ৩১ মে, ১৯৮৮।
[২৬] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-২০, ১ জুন, ১৯৮৮।
[২৭] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-২১, ২ জুন, ১৯৮৮।
[২৮] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-২৩, ৬ জুন, ১৯৮৮।
[২৯] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-২৪, ৭ জুন, ১৯৮৮।
[৩০] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-৪, ৩ মে, ১৯৮৮।
[৩১] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-৪, ৩ মে, ১৯৮৮।
[৩২] বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টেবার, ১৯৮৮।
[৩৩] ঐ বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টেবার, ১৯৮৮।
[৩৪] বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টেবার, ১৯৮৮।

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২ জন সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'দেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে' ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৩৫]

চতুর্থ অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন, ১টি কমিটির ২বার রদবদলসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য ১৫ বার রদবদল করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫ জন বৃদ্ধি করা হয়।

অধিবেশনের ৩৩তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৬, ২৩৯ ও ২৪৫ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি' 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' এবং 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির' সংসদ সদস্য পরিবর্তন করা হয়।[৩৬]

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত ১৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫ জন সংসদ সদস্য রদবদল করা হয়। এগুলো হচ্ছে, (১) স্বাস্থ্য ও পরিবার (২) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ (২বার) (৩) কৃষি (৪) যোগাযোগ (৫) খাদ্য (৬) তথ্য (৭) পররাষ্ট্র (৮) মৎস্য ও পশু সম্পদ (৯) সমাজকল্যান ও মহিলা বিষয়ক (১০) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ (১১) নৌ-পরিবহণ (১২) যুব ও ক্রীড়া (১৩) ভূমি এবং (১৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৩৭]

অধিবেশনের ৩৪তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনে গঠিত উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কিত কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫ জন বৃদ্ধি করা হয়। ৫ জন বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিটি সংসদ সদস্য সংখ্যা ১৭ তে উন্নীত হয়।[৩৮]

পঞ্চম অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন এবং ১টি সংসদীয় কমিটির ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এছাড়া ২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, ৮টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য রদবদল ও ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্য সংসদ সদস্যপদ পূরণ করা হয় এবং ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সংসদ কমিটি' স্পিকার পুনর্গঠন করেন[৩৯] এবং অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে ২৬৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়।[৪০]

অধিবেশনের ২৬তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে (১) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং (২) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[৪১]

---

[৩৫] বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টেবার, ১৯৮৮।

[৩৬] বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা-৩৩, ৬ জুলাই, ১৯৮৯।

[৩৭] বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা-৩৩, ৬ জুলাই, ১৯৮৯।

[৩৮] বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা-৩৪, ১৯৮৯।

[৩৯] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-৫, ১০ জানুয়ারি, ১৯৯০।

[৪০] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-২৩, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

[৪১] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা ২৬, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন এবং ৩টি কমিটির ১টি করে শূন্য সংসদ সদস্যপদ পূরণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে (১) স্বরাষ্ট্র (২) খাদ্য (৩) সমাজকল্যাণ (৪) ত্রাণ ও পুনর্বাসন (৫) কৃষি (৬) শ্রম ও জনশক্তি (৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং (৮) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (সাংসদ পরিবর্তন) এছাড়া (১) বেসামরিক বিমান (২) পাট এবং (৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্য সাংসদপদ পূরণ করা হয়।[৪২]

অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৩ সাংসদ সমন্বয়ে সংসদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখা সম্পর্কে সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে ১টি[৪৩] এবং অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ১১ সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'শ্রম আইন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে' ১টি মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৪৪]

ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ৩৫তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৪৫]

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৯ সংসদ সদস্যসমন্বয়ে 'স্বাস্থ্য নীতি' সম্পর্কে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৪৬]

বৈঠক

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয়, ৩৪ টি মন্ত্রণালয়, ৫টি বিশেষ ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৫১ টি কমিটি এবং এসব কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি চতুর্থ জাতীয় সংসদের মেয়াদ কালে মোট ৮২৫ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১১টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।৫১টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬০টি এবং মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত ৬টি উপ-কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩টি, মোট ৩৫৩টি।

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪টি কমিটির ৬টি রিপোর্ট, ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৩টি কমিটির ৩টি রিপোর্ট এবং ১টি বিশেষ কমিটির ২টি রিপোর্টসহ মোট ১১টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়।সংসদীয় কমিটি ৭টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩১টি, ৪টি বিশেষ এবং ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৪৩টি কমিটি কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি।

---

[৪২] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা ২৬, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

[৪৩] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-১৬, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯০।

[৪৪] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-২০, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯০।

[৪৫] বিতর্ক, খণ্ড ৬, সংখ্যা-৩৫, ১ আগস্ট, ১৯৯০।

[৪৬] বিতর্ক, খণ্ড ৬, সংখ্যা-৩৫, ১ আগস্ট, ১৯৯০।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী সংসদীয় ৪টি কমিটি হচ্ছে (১) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২টি (২) অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি ১টি (৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ২টি (৪) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ১টি। বাকি ৭টি সংসদীয় কমিটির কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে ৩টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করে সেগুলো হলো: (১) আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (২) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৩) ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি। বাকি ৩১ টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বিশেষ ১টি কমিটি হলো দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি ২টি। বাকি ৪টি বিশেষ কমিটির কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ পার্লামেন্টে উত্থাপিত ১৫৩টি বিলের মধ্যে ১৪৪টি স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐ গৃহীত বিলগুলোই সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১৪২ টি সংসদ কর্তৃক পাস হয়। এবং পাসকৃত ১৪২টি বিলের ৫৩টি ছিল মৌলিক এবং ৮৯টি ছিল অধ্যাদেশ। তন্মধ্যে ১১৩টি বিল আলোচনা পর্বসহ পাস হলেও ২৯টি বিল কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়।

সারণি ২ : রাষ্ট্রপতি আমলে চতুর্থ পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

ক্রমিক নং	আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান	সংখ্যা
১	বিলের নোটিশের সংখ্যা	১৫৩
২	স্পিকার কর্তৃক গৃহীত বিলের সংখ্যা	১৪৪
৩	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১৪৪
৪	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	১৪২
	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা:	
	(ক) মৌলিক বিল-	৫৩
	(খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃতবিল-	৮৯
	(গ) আলোচনাসহ গৃহীত বিল-	১১৩
	(ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল-	২৯
	(ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল-	৩
	(চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল-	১৩৯

সূত্র: বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৩২, ২০ জুন, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৭৮-২৯৮৪; বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৩৩, ২১ জুন, ১৯৮৮,পৃ. ৩১০৫; বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৩৮, ২৮ জুন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬৬৯-৩৬৭১; বিতর্ক, খণ্ড-১,সংখ্যা-৩৮, ২৮ জুন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬৬৯-৩৬৭১।

২. সংবিধান সংশোধন

সংসদের আইন দ্বারা সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের জন্য সংসদের মোট সদস্যের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা হয়। চতুর্থ পার্লামেন্টে সংবিধানের তিনটি সংশোধনী গৃহীত হয়। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

২.১ অষ্টম সংশোধনী

জেনারেল এরশাদের অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে অব্যাহত আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় ৩রা মার্চ ১৯৮৮ সংসদ নির্বাচনের পর ১৩ই মার্চ ১৯৮৮[৪৭] রাষ্ট্রধর্মের প্রয়োজনীয়তার শ্লোগান উত্থাপন করলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী উপরোক্ত ঘোষণাকে মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বর্ণনা করেন। আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশে বলেন, সরকার পাকিস্তানি কায়দায় ধর্মের রাজনীতি শুরু করেছেন। বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ নতুন করে ধর্মের সার্টিফিকেট নেবে না। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) পথেই মানুষ ধর্ম পালন করবে।[৪৮] বিএনপি মহাসচিব ঢাকায় এক সমাবেশে বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হলে জনগণ তা প্রতিহত করবে। জামায়াতে ইসলামির ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এক বিবৃতিতে বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করলেই দেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে বা জনগণের মুক্তি আসবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না।[৪৯] জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে সরকার ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন।[৫০] খিলাফত আন্দোলন প্রধান শাহ্ আহমদুল্লাহ্ আশরাফ রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণাকে একটি অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি বলে আখ্যায়িত করেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক চৌধুরী বলেন, সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে আইনজীবীগণ ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনার হীন চক্রান্তকে কোনো মতেই সমর্থন করতে পারেন না।[৫১] এ সকল সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৩রা এপ্রিল ফরিদপুরের আটরশিতে বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ঘোষণা করেন যে, আগামী সংসদ অধিবেশনে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করবার প্রস্তাব করে একটি বিল পেশ করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার ব্যাপারে জনমত গঠনের কাজে তিনি সফল হয়েছেন।[৫২] অন্যদিকে দেশের ২০ জন বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, ৩রা মার্চের নির্বাচন জনগণ বর্জন করেছে। কাজেই বর্তমান সংসদের কোনো বৈধতা নেই এবং এই সংসদে সংবিধান সংশোধন বা কোনো আইন পাস করা হলে দেশবাসীর তাতে সম্মতি থাকবে না। এতৎসত্ত্বেও সকল মতামতকে উপেক্ষা করে ১১ই মে ১৯৮৮ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়।

৭ই জুন ১৯৮৮ সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে নিজ নিজ ধর্ম অনুশীলন করতে পারবে।[৫৩]

---

[৪৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ, ১৯৮৮।

[৪৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ, ১৯৮৮।

[৪৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ, ১৯৮৮।

[৫০] দৈনিক সংবাদ, ১২ মে, ১৯৮৮।

[৫১] দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল, ১৯৮৮।

[৫২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ এপ্রিল, ১৯৮৮।

[৫৩] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর: টাউন স্টোরস, ১৯৯৮), পৃ. ২০০।

এ সংশোধনীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ঢাকার বাইরে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারককে এক একটি স্থায়ী বেঞ্চে মনোনয়ন দেবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচার পতির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করবেন। এবং প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চ সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক সম্পূরক বা অনুবর্তী বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করবেন।[৫৪]

অষ্টম সংশোধনীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, রাষ্ট্রকে খেতাব, সম্মান, পদক, ভূষণ ইত্যাদি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে খেতাব, সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ করবেন না।[৫৫]

এছাড়া এ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ইংরেজি লিপির Bengali শব্দের স্থলে Bangla এবং Dacca এর স্থলে Dhaka শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত অংশটি সংবিধান বহির্ভূত, অকার্যকর ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[৫৬]

২.২ নবম সংশোধনী

বেসামরিকীকরণের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরেও এরশাদ কাঙ্ক্ষিত বৈধতা অর্জন করতে পারেননি, বিধায় বিরোধী দল ও জোটগুলো ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে নতুন চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন করে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে এরশাদের পদত্যাগ ও একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখে যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এরশাদ ক্ষমতাসীন উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে বিরোধী দলসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে নব নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দিয়ে নিজে ক্ষমতা হতে সরে দাঁড়াবেন। এভাবেই সাংবিধানিক ধারা বাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। ঠিক তখনই ক্ষমতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত না থেকে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে জটিল করে সংবিধান সংশোধন করতে অগ্রসর হন।[৫৭]

৬ই জুলাই ১৯৮৯ নবম সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয় এবং তা ১০ জুলাই, ১৯৮৯ গৃহীত হয়। ১১ই জুলাই রাষ্ট্রপতি এই বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এটি ১৯৮৯ সালের ৩৮নং আইন। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদের ন্যায় উপ-রাষ্ট্রপতি পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা

---

[৫৪] আবুল ফজল হক, পৃ. ২০০।

[৫৫] *The Constitution of the People's* ... Op.cit., Article-3 and 5, p. 5-6; তারেক শামসুর রেহমান, পৃ. ১৩৭।

[৫৬] মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া (সম্পাদিত), *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)* (ঢাকা: হেলেনা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৩-৩৪।

[৫৭] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড), পৃ. ১৯০-২০৩।

হয়। এবং এছাড়া একাদিক্রমে দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করা হয়। সে সঙ্গে আরো বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উক্ত নিয়োগ সংসদের মোট সংসদ সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। ১লা অক্টোবর ১৯৮৯ থেকে এই সংশোধন কার্যকর করা হয়।[৫৮]

নবম সংশোধনী নিয়ে ক্ষমতাসীন দল মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। কারণ দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীগণ সংবিধানের উক্ত সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে বলেন যে, যেহেতু এই সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন আনয়ন করেছে সেহেতু এমন সংশোধনী গ্রহণের ব্যাপারে সংবিধান সরকারকে একক এখতিয়ার প্রদান করেনি। তদুপরি তারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটি বিতর্কিত সংসদে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পাস করা সঙ্গত নয়। সঙ্গত কারণেই সুপ্রিম কোর্ট সরকারের ওপর রুল নিশি (Rule Nishi) জারি করেন। সুপ্রিম কোর্ট বিভাগ নবম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৭২নং অনুচ্ছেদের (৪) দফার পর ৪ (ক) উপ-দফা সংযোজন কেন অবৈধ বলে ঘোষণা করা হবে না তা কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের নিকট রুল জারি করেন। এবং এই নয়া সংশোধন সংবিধানের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন।[৫৯]

পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে নবম সংশোধনীর সমালোচনা করে বলেন, পাঁচ দলের মতে বর্তমান সংসদের সংবিধান সংশোধনের কোনো অধিকার নেই। এই ধরনের সংশোধনী দেশের বিরাজমান সংকটের কোনো সমাধান করবে না বলে তারা মন্তব্য করেন।[৬০] আওয়ামী লীগ সভানেত্রী একে 'গণ-বিরোধী পদক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেন।[৬১]

২.৩ দশম সংশোধনী

বাংলাদেশের চতুর্থ জাতীয় সংসদ ২৩শে জুন ১৯৯০ সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে। এই সংশোধনীর মূল উপজীব্য হচ্ছে সংসদে মহিলা সাংসদদের সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ নবায়ন এবং রাষ্ট্রপতির মেয়াদ সমাপ্তি, পদ ত্যাগ, মৃত্যু ও অপসারণের ক্ষেত্রে পুনরায় নির্বাচন হওয়ার তারিখ সংশোধন করা।

মূল সংবিধানের (১৯৭২) বিধান মোতাবেক অতিরিক্ত ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং উক্ত আসনগুলো নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্যের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন।[৬২] তবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে (১৯৭৯) জেনারেল জিয়াউর রহমান সংরক্ষিত মহিলাদের আসন সংখ্যা ১৫ হতে ৩০ এবং সংরক্ষণের সময় সীমা ১০ হতে ১৫ বছরে বৃদ্ধি করেন।[৬৩] সংরক্ষণের সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার ফলে চতুর্থ জাতীয় সংসদে (১৯৮৮) কোনো সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না বিধায় জাতীয় পার্টির মহিলা শাখা সংসদে

---

[৫৮] তারেক শামসুর রেহমান, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[৫৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৮৯।

[৬০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৮৯।

[৬১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৮৯।

[৬২] *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, 1972.

[৬৩] *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, 1979, Article-65, p. 23.

সংরক্ষিত মহিলা আসনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে আসন সংরক্ষণের জন্য জেনারেল এরশাদ ১০ই জুন ১৯৯০ জাতীয় সংসদে সংবিধানের দশম সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন এবং ১২ই জুন ১৯৯০ তা গৃহীত হয়। এটি ১৯৯০ সালের ৩৮নং আইন। যার মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা প্রতিস্থাপন করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের চতুর্থ সংসদের অব্যবহিত পরের সংসদ অর্থাৎ পঞ্চম সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ বছর কাল অতিবাহিত হবার পর সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত সংসদে ৩০টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এই মহিলা সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।[৬৪]

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের ১৮০ দিনের পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধানটি পরিবর্তন করে তারিখ সমাপ্তির পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের বিধান করা হয়। এই একই বিধান রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ ও অপসারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়।[৬৫]

৩. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আইন সভা কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সব পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের সংবিধানে ও জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এখন আমরা চতুর্থ সংসদ কর্তৃক এসব পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করব।

৩.১ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (কার্য-প্রণালী বিধি ৪১-৫৮)

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে থাকে। এ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে পার্লামেন্টের সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম, সাফল্য ও ব্যর্থতা উদ্‌ঘাটন এবং নিজ নিজ এলাকার অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শাসন বিভাগ পার্লামেন্টের নিকট জবাব দিহি করে থাকে।

বাংলাদেশ পার্লামেন্টে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়।[৬৬] জাতীয় সংসদে সাধারণত দু'ধরনের প্রশ্ন: তারকা চিহ্নিত ও তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন করা যায়। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জন্য লিখিত ও মৌখিক উত্তর প্রদান করা হয়। অপরদিকে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জন্য শুধুমাত্র লিখিত উত্তর প্রদান করা হয়। সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।[৬৭]

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ১৫৭১৩টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৬০১৬ টি জনাব স্পিকার কর্তৃক বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয়। ৫১৭০ টি বাতিল

---

[৬৪] *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, 1979, Article-65, p. 23.

[৬৫] আবুল ফজল হক, পৃ. ২০৩।

[৬৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪১, পৃ. ১৭।

[৬৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

করা হয় এবং ৪৯০৪ টি তামাদি হয়ে যায়। গৃহীত ৬০১৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৫৮৩০টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৫৬৬১টি আলোচিত হয়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ৩৪টি মন্ত্রণালয়ের ওপর ৫৬৬১টি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্ন উত্থাপন এবং প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩৪টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ৪টি মন্ত্রণালয়ে খুবই কম প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেমণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে উত্থাপিত ও আলোচিত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৫৬৬১টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মধ্যে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ২৬১০টি এবং বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা ৩০৫১টি উত্থাপন করেন। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ২৬১০টি প্রশ্নের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ১৩৮১টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকার সমস্যা সম্পর্কিত ছিল ১২২৯টি, যেমন হরিপুর তেল ক্ষেত্রে উত্তোলিত তেলের পরিমাণ, দ্রুত শিল্পায়ন, পর্যটন কেন্দ্র আধুনিকীকরণ, রাবার প্রকল্প বাস্তবায়ন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা, কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি।[৬৮]

অপরপক্ষে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত ৩০৫১টি প্রশ্নের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ১৭৪৯টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ১৩০২টি, যেমন বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ, গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উত্তোলন, বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের পরিকল্পনা, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ[৬৯] ইত্যাদি। এভাবে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় বিষয়ের ওপর অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারের দোষ-ত্রুটি উত্থাপনের চেষ্টা করলেও সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রে প্রায় সম-পরিমাণ প্রশ্ন উত্থাপন করে শুধুমাত্র সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

উত্থাপিত ও আলোচিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৩৩৯৭টি প্রশ্নের ওপর যথার্থ উত্তর প্রদান করেন। এবং ১৪২০টি প্রশ্নের ওপর মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ৮৪৪টি প্রশ্নের উত্তর তারা সহসাই এড়িয়ে যান।[৭০]

তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ২৬৮৬টি তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে ৯৮৭টি জনাব স্পিকার কর্তৃক বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয়। ১০১৩টি বাতিল করা হয়। ৭৭১টি তামাদি হয়ে যায়। গৃহীত ৯৮৭টি প্রশ্নের মধ্যে ৯৭৭ টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৯০২টি আলোচিত হয়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে ৩৪টি মন্ত্রণালয়ের ওপর ৯০২টি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩৪টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৬টি মন্ত্রণালয়ে খুবই কম প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেমন বস্ত্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

---

[৬৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

[৬৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

[৭০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

চতুর্থ পার্লামেন্টে উত্থাপিত ও আলোচিত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৯০২টি তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের মধ্যে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ৩৫৯টি এবং বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা ৫৪৩টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ৩৫৯টি প্রশ্নের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ১৭২টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ছিল ১৮৭টি, যেমন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা, চিনি আমদানি, পুরাতন কাপড় আমদানি, মসজিদসমূহের উন্নয়ন ইত্যাদি।[৭১]

অপরপক্ষে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত ও আলোচিত ৫৪৩টি প্রশ্নের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৩৯৪টি এবং আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ১৪৯টি, যেমন ডায়েরিয়ার প্রাদুর্ভাব, খাদ্য আইন লঙ্ঘন, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন, কৃষকদের বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ ইত্যাদি।[৭২] বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা এভাবে জাতীয় বিষয়ের ওপর অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারের দোষ-ত্রুটি উত্থাপনের চেষ্টা করেন। অপর পক্ষে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় বা আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রে সমপরিমাণ প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন মাত্র।

উত্থাপিত ও আলোচিত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৬২২টি প্রশ্নের ক্ষেত্রে যথার্থ ও ১৬০টি প্রশ্নের ক্ষেত্রে মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ১২০টি প্রশ্নের উত্তর তারা সহসাই এড়িয়ে যান।[৭৩]

৩.২ স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন (কার্য-প্রণালী বিধি-৫৯)

সাধারণত প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য অন্যূন পূর্ণ ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয়। তবে জন গুরুত্ব সম্পন্ন কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ১৫ দিন অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশে প্রশ্ন করা যায় এবং স্পিকার যদি মনে করেন যে, প্রশ্নটি জরুরি ধরনের এবং সর্বতোভাবে প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য, তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার উত্তর দিতে পারেন কিনা এবং পারলে কোন তারিখে পারবেন, তা তিনি মন্ত্রীর নিকট হতে জেনে নেবার ব্যবস্থা করবেন।[৭৪] এটাই জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন নামে অভিহিত।

চতুর্থ পার্মামেন্টে মোট ৮৯টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন জমা পড়ে। যার মধ্যে ১৫টি সংসদে আলোচনার জন্য জনাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এবং ৭৪টি বাতিল করা হয়। ৭টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয়। লক্ষণীয় যে, প্রথম অধিবেশনে ১টি, পঞ্চম অধিবেশনে ৫টি এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে ১টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও তা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন হিসেবে উত্তর প্রদান করা হয়।

---

[৭১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

[৭২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

[৭৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৪৪, ৪৫, পৃ. ১৭।

[৭৪] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৫৯, পৃ. ২৩।

৩.৩ মুলতবি প্রস্তাব (কার্য-প্রণালী বিধি ৬১)

সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম মুলতবি প্রস্তাবের মাধ্যমে বন্ধ রেখে অতি সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[৭৫] ফলে সংসদ সদস্যরা উক্ত জরুরি সমস্যা সম্পর্কে সংসদে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

চতুর্থ পার্লামেন্টে ৩৩৭টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫টি সংসদে আলোচনার জন্য জনাব স্পিকার কর্তৃক বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয়। ৩৩২টি বাতিল করা হয়। আলোচনার জন্য গৃহীত ৫টি সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়।

সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের সবগুলোই ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যকর্তৃক আনীত বিল। যা ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেমন মানিকছড়িতে শান্তি বাহিনীর পৃথক দুটো হামলায় ১০ জন লোক নিহত ও ৩০ জন আহত[৭৬], ঘুষ ও দুর্নীতির বিস্তার,[৭৭] বাস ধর্মঘট ও রিকসা হরতালে জনজীবন বিপর্যস্ত,[৭৮] স্বাধীন বঙ্গভূমি ষড়যন্ত্র[৭৯] দেশের কতিপয় স্থানে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি।[৮০]

৩.৪ জরুরি জন-গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (কার্য প্রণালী-বিধি ৭১)

স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে সংসদ সদস্যরা জরুরি জন-গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রস্তাবে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে বিবৃতি দেন।[৮১] এভাবেই সংসদের নিকট সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করানো হয়।

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ১৪৫৯টি জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৫১টি জনাব স্পিকার কর্তৃক বিধিসম্মত বলে গৃহীত হয়। ১৩০৮টি বাতিল করা হয় এবং ৫১টি সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়। ১০১টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৯৬টির ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদে আলোচিত ৯৬টি প্রশ্ন ২৬টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৮২] ৯৬টি আলোচিত মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে ৪০টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের। তন্মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ১৭টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ২৩টি, যেমন—ট্রাফিক আইল্যান্ডে যানজট, ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা, বন্যায় পাকা ধানের জমি প্লাবিত[৮৩] ইত্যাদি।

---

[৭৫] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬১, পৃ. ২৫।

[৭৬] বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা-৬, ৫ মে, ১৯৮৮, পৃ. ২৮৩-৩১৫।

[৭৭] বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা-১৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ১২২-১৪১।

[৭৮] বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা-১৮, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ২১৭-২৪২।

[৭৯] বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা-৩, ২৪মে, ১৯৮৯, পৃ. ৭০-১১৫।

[৮০] বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-১৫, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯০, পৃ. ৬৩-১০৫।

[৮১] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৭১, পৃ. ২৯।

[৮২] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৭১, পৃ. ২৯।

[৮৩] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৭১, পৃ. ২৯।

অপর পক্ষে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবের সংখ্যা ছিল ৫৬টি। যার মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৪৬টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ১০টি, যেমন রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, সার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ, বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধ, ক্যান্সার চিকিৎসায় চরম সংকট ইত্যাদি।[৮৪]

৩.৫ জরুরি জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (কার্য প্রণালী বিধি ৬৮)

জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক এমন কোনো সদস্য আরও ৫ জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত এবং উত্থাপনীয় বিষয়টি সঠিকভাবে এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে আলোচনার অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের নিকট নোটিশ প্রদান করতে পারতেন।[৮৫] তবে এরূপ আলোচনা অধিবেশন সমাপ্তির অনধিক এক ঘণ্টা পূর্বে হত কিংবা এক ঘণ্টার জন্য হতো। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্ক সংসদ সদস্যরা অল্প সময়ের নোটিশ প্রদান করে সংসদে আলোচনা করতে পারতেন।

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ২৩৮টি জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১টি জনাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৭টি বাতিল করা হয়। গৃহীত ৫১টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি সংসদে উত্থাপিত হয় ও ২২টি আলোচিত হয়। ৩১টি প্রস্তাব অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার ফলে তামাদি হয়ে যায়।

সংসদে আলোচিত ১২টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের এবং ৮টি ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের। এবং যা ১১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৮৬] সরকারি দলের ৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ২টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ২টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। অপরপক্ষে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের ৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং বাকি ২টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। সরকার দলীয় ৪টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ মোটামুটি উত্তর প্রদান করেন। এবং বিরোধী দলীয় ৮টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ১টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যথার্থ এবং ৭টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মোটামুটি উত্তর প্রদান করেন।[৮৭]

সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব গুলো ছিল, যেমন– জলাবদ্ধতায় লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল হানি, দেশের উত্তরাঞ্চলে কালা জ্বরের প্রাদুর্ভাব, কৃষি সেচযন্ত্রের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, কয়লা উত্তোলনে গরিমসি[৮৮] ইত্যাদি।

---

[৮৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৭১, পৃ. ২৯।
[৮৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬৮, পৃ. ২৮।
[৮৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬৮, পৃ. ২৮।
[৮৭] গ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬৮, পৃ. ২৮।
[৮৮] ঐ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬৮, পৃ. ২৮।

৩.৬ অর্ধ ঘণ্টা আলোচনা (কার্য-প্রণালী বিধি ৬০)

যে জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সংসদে সম্প্রতি তারকা চিহ্নিত বা তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং যার উত্তরে বর্ণিত কোনো বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য কোনো সদস্য সচিবের নিকট পূর্ণ ৩ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করলে স্পিকার সপ্তাহের মাত্র ২টি বৈঠকে অর্ধ-ঘণ্টাকাল আলোচনার জন্য বরাদ্দ করতে পারবেন।[৮৯]

চতুর্থ পার্লামেন্টে ৫৬টি অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনার নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৯টি আলোচনার জন্য জনাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ৪৭ টি বাতিল করা হয়। ৪টি সংসদে উত্থাপিত হলেও শুধুমাত্র ১টির ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি প্রশ্ন অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার ফলে তামাদি হয়ে যায়।

আলোচিত প্রশ্নটি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক আনীত বিল এবং যা ছিল শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, যেমন বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং তার কতগুলো বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত।[৯০]

৩.৭ সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব (কার্য-প্রণালী বিধি ১৩০)

সরকারের কোনো কাজ বা নীতি অনুমোদন বা অননুমোদন করা অথবা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা কোনো বিষয়ে সংসদের মতামত ঘোষণা বা সুপারিশ করাই সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[৯১] এ প্রস্তাব সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক না হলেও সংসদের ব্যক্ত অভিমত হিসেবে তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

বেসরকারি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

চতুর্থ পার্লামেন্টে ৯৭৫৯ টি বেসরকারি সাংসদদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে জনাব স্পিকার কতৃক ৩৭৭৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয়। ৫৫২৭টি নাকচ করা হয়। ৬২টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হলেও আলোচিত হয় ৫৬টি। এবং আলোচনার পর ৮টি সংসদে গৃহীত হয়।

সংসদে আলোচিত ৫৬টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের এবং যার মধ্যে ৫টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ১৪টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত, যেমন—পহেলা বৈশাখ হতে অর্থ বছর শুরু, সড়ক কার্পেটিং, চিনিকল স্থাপন, বিপদজনক মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, বিদ্যুতায়ন, বিমান বন্দর স্থাপন ইত্যাদি। বাকি ৭টি ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাব। যার মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ২৫টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ১২টি, যেমন—পৌরসভা সম্প্রসারণ, পল্লী বিদ্যুতায়ন

---

[৮৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ৬০, পৃ. ২৪।

[৯০] বিতর্ক, খণ্ড১, সংখ্যা-৪১, ৩ জুলাই, ১৯৮৮, পৃ. ৪০৬৮-৪০৭০।

[৯১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ১৩০, পৃ. ৫৩।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্যাস লাইন চালু, স্টেডিয়াম নির্মাণ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি।[৯২]

প্রশ্নোত্তর কালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৩০টি প্রস্তাবের ওপর যথার্থ এবং ২৬টি প্রস্তাবের ওপর মোটামুটি উত্তর প্রদান করেন। এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৪৬টি প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন জানালে ৩৫টি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হলেও ১১টি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে ১১টি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে বাতিল করা হয়। ৮টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যেমন বিপদজনক মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, আমদানি রপ্তানি—বিক্রয় ও বহন আইন প্রণয়ন, জনসংখ্যা সমস্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, ভেড়ি বাধ নির্মাণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সেতু নির্মাণ, সড়ক পাকাকরণ।[৯৩]

সারণি ৩ : চতুর্থ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা	সংসদে আলোচিত প্রশ্নের সংখ্যা	সংসদে গৃহীত
তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন	১৫৭১৩	৬০১৬	৫৮৩০	৫৬৬১	
তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্ন	২৬৮৬	৯৮৭	৯৭৭	৯০২	
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৮৯	১৫	৭	৭	
মুলতবি প্রস্তাব	৩৩৭	৫	৫	৫	
জরুরি জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ	১৪৫৯	১৫১	১০১	৯৬	
জরুরি জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৩৮	৫১	২০	১২	
অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা	৫৬	৯	৪	১	
বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৯৭৫৯	৩৭৭৫	৬২	৫৬	৮

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (২৫ এপ্রিল, ১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১-৪৭ (২৫.৪.৮৮-১১.৭.৮৮); বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা- ১-৪ (১৬.১০.৮৮-১৯.১০.৮৮); বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা- ১-২০ (১.২.৮৯-২.৩.৮৯); বিতর্ক, খণ্ড-৪, সংখ্যা- ১-৩৫ (২২.৫.৮৯-১০.৭.৮৯); বিতর্ক, খণ্ড-৫, সংখ্যা- ১.২৬ (৪.১.৯০-৮.২.৯০); বিতর্ক, খণ্ড-৬, সংখ্যা- ১-৩৫ (৩.৬.৯০-১.৮.৯০); বিতর্ক, খণ্ড-৭, সংখ্যা- ১(২৫.৮.৯০)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চতুর্থ পার্লামেন্টে প্রদত্ত ১৫৭১৩টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশের মধ্যে ৬০১৬টি জনাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হলেও ৫৬৬১টির ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সংসদে সর্বমোট ২৬৮৬টি তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৯৮৭টি প্রশ্ন গৃহীত হলেও আলোচিত হয় ৯০২টি। স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্নের জন্য

[৯২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ১৩০, পৃ. ৫৩।

[৯৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি, ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ১৩০, পৃ. ৫৩।

প্রদত্ত ৮৯টি নোটিশের মধ্যে স্পিকার কর্তৃক ১৫টি গৃহীত হয়। তবে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। চতুর্থ পার্লামেন্টে মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশের সংখ্যা ছিল ৩৩৭টি। এর মধ্যে ৫টি জনাব স্পিকার কর্তৃক বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয় এবং ঐ ৫টির ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মনোযোগ আকর্ষণের ওপর প্রদত্ত ১৪৫৯টি নোটিশের ১৫১টি গৃহীত হলেও ৯৬টির ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য প্রদত্ত ২৩৮টি নোটিশের ৫১টি গৃহীত হলেও শুধুমাত্র ১২টির ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্টে অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনার জন্য প্রদত্ত ৫৬টি নোটিশের মধ্যে শুধুমাত্র ৯টি গৃহীত হয় এবং ১টির ওপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ৯৭৫৯টির মধ্যে ৩৭৭৫টি গৃহীত হয়। ৫৬টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এবং ৮টি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সুতরাং সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করে। এই ব্যর্থতার জন্য সংসদীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অভাব, সংসদ ও সংসদ সদস্যদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও অধিকারের অপ্রতুলতা, সংসদকে ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে শাসনকারী এলিটদের অনিহাকে চিহ্নিত করা যায়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৫শ সংখ্যা ১৪১৪

মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

Abstract: The Laws of Civil and Criminal Procedure as well as Law of Evidence prevalent in Bangladesh govern Trial of Civil and Criminal cases. Examination of witness is necessary to prove a suit or case either by the Judge or Magistrate in court or on commission out side court under some specific grounds. Recording of evidance by the Judge or Magistrate as aforesaid is one of the causes of case backlog. To avoid such type of situation step should be taken to provide provissions for recording of evidances on commission by Advocate Commissioner out side court.

১. ভূমিকা

সাক্ষ্য গ্রহণ মামলার দীর্ঘপর্ব। সাধারণত এ সময় সাক্ষীর বক্তব্য আদালতের বিচারক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়। একটা মামলার নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষ যত জন সাক্ষী পরীক্ষা করতে চায় এ সময় ততজন সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা ও পুনঃপরীক্ষা চলে।

বাংলাদেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য প্রধান দুটি কার্যবিধি সংক্রান্ত আইন হচ্ছে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (The Code of Civil Procedure, 1908) এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি (The Code of Criminal Procedure, 1898)। দেওয়ানি মামলার বিচারে সাক্ষী পরীক্ষায় ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন (The Evidence Act, 1872) এবং ফৌজদারি মামলার বিচারে শেষোক্ত আইনের সাথে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, এবং প্রয়োজনে অন্য কোন বিশেষ আইন ব্যবহৃত হয়।

মামলা প্রমাণ হওয়া প্রয়োজন থাকায় সকল ক্ষেত্রে মামলা প্রমাণ বিষয়ক প্রধান আইন ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন কেন্দ্রীয়ভাবে পুরো পরীক্ষার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন The Army Act,1952, The Naval Discipline Ordinance,1961এবং The Air Force Act,1953 দ্বারা গঠিত মার্শাল ল কোর্ট (Courts-Martial) ব্যতীত মার্শাল ল কোর্টসহ অন্য সকল আদালতে কার্যকর।[১]

মামলা বিচারে সাক্ষী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনে বলা হয়েছে সাক্ষী উপস্থাপনক্রম এবং সাক্ষী পরীক্ষা বাংলাদেশে কার্যকর দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন ও কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে এ ধরনের

---

* ড. খবির উদ্দীন আহম্মদ, প্রফেসর, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *The Evidence Act, 1872* (Act 1 of 1872), section 1.

আইনের অনুপস্থিতি থাকলে আদালতের ইচ্ছাধীন (Discretion) ক্ষমতায় প্রযুক্ত হবে।[২] আদালতে মামলা প্রমাণের প্রধান এবং প্রাথমিক দায়িত্ব বাদী পক্ষের। তবে কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব কখনো বিবাদী পক্ষের উপর বর্তায়।[৩]

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ *গোলজার আলী প্রামাণিক* বনাম *সবুরজান বেওয়া*[৪] মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে বিবাদী পক্ষের হাজারো ত্রুটি সত্ত্বেও বাদীকে তার মামলা প্রমাণ করতে হবে। তবে মামলা প্রমানে বাদীর এরূপ দায়িত্ব থাকলেও বিশেষ সময় কোনো ঘটনা বিবাদীকেও প্রমাণ করতে হয়; এবং এ কাজটি ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের নিয়ম নীতি নির্ভর।[৫] সাক্ষ্য আইনে বলা হয়েছে আদালত যে ঘটনাবলী বিচারিক অবগতিতে (Judicial Notice) গ্রহণ করেন তা প্রমাণের দরকার নাই। আবার স্বীকৃত ঘটনা প্রমাণের প্রয়োজন নাই।[৬] অর্থাৎ স্বীকারের মাধ্যমে ঘটনা প্রমানিত হচ্ছে।

ঘটনা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন (১) মৌখিক সাক্ষ্য, (২) দলিল এবং (৩) বস্তুগত বিষয় (Material Things) আদালতে উপস্থাপন। দলিল এবং বস্তুগত বিষয় সাক্ষীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে মামলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাক্ষী পরীক্ষা। বাদী বা বিবাদী/আসামি/অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই সাক্ষী হিসেবে সাধারণত আদালতে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। তার সমর্থনে অন্য সাক্ষী বক্তব্য প্রদান বা দলিল বা বস্তুগত বিষয় উপস্থাপন করে।

দলিলের বিষয় বা বস্তুগত বিষয় বাদে সব কিছুই (ঘটনা/ঘটনাবলি) সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য (Oral Evidence) দ্বারা প্রমাণ করতে হয়। এ জন্য যে মামলায় দলিল বা বস্তুগত বিষয় যুক্ত নাই তাতে কেবল সাক্ষী পরীক্ষা দ্বারা মামলার প্রমাণের কাজ সম্পন্ন হয়। যখন দলিল বা বস্তুগত বিষয় থাকে তখন ঐ সকল বিষয় সাক্ষীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

আদালতে উপস্থাপিত দলিল বা বস্তুগত বিষয় বিচারে গৃহীত হওয়ার নিদর্শনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। এ কাজগুলো সাক্ষীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ সময় সাক্ষীর সাথে আইনজীবী এবং বা আদালতের কথপোকথন হয় যা বিচারক নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করেন। এ কাজটি সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ (Recording of evidence)। একাজে আদালতের প্রচুর সময় ব্যয় হয়। তাতে একাধিক দিনও অতিবাহিত হতে পারে। সাক্ষী পরীক্ষার এ কার্যক্রম প্রকাশ্য আদালতে সম্পন্ন হওয়াসহ গোপনে অর্থাৎ বিচারকের খাস কামরায়ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আদালতকে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে ব্যস্ত থাকতে হয়। এটি ধীর গতিসম্পন্ন কাজ। সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণের একাজে বিচারকের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা থাকলেও বিচারকের তাতে সরাসরি জড়িত থাকায় বিশেষ ফল হয় না। কেননা এসময় সাক্ষীর বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা ভাবভঙ্গি বা অভিব্যক্তি আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী কোনো এক সময় এ বিচারক নিজে অথবা অন্য কোনো বিচারক গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি উভয় পক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচার বিশ্লেষণপূর্বক আদেশ ও রায় প্রদান করেন।

---

[২] তদেব, ধারা ১৩৫।

[৩] তদেব, ধারা ১০১-১০৪।

[৪] Golzar Ali Pramanik v. Saburjan Bewa 6 *BLC* (AD)(2001)41.

[৫] দেখুন Amirun Nessa v. Golam Kashem 42 *DLR* (1990)499; Anwar Hossain v. Abul Hossain 44 *DLR* (1992)79.

[৬] The Evidence Act, 1872 sec.58.

বিভিন্ন কারণে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটার জন্য বিভিন্ন সময় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন সংস্কার হয়েছে। কিন্তু বিলম্ব একদম বিদূরিত হয়নি। বাংলাদেশে সর্বশেষ মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালতের প্রশাসনে সংস্কারের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তা মোকদ্দমা জট কমাবে আশা করা যায়। তবে এ ব্যবস্থা দ্বারা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণের বিষয়ে কোনো সংস্কার আনা হয়নি।

বিচারকের প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার দায়বদ্ধতা তথা বাধ্যবাধকতা আছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক বিচারক মামলা নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট থাকেন। সাক্ষী পরীক্ষা বেশি পরিমাণে বিচারক কর্তৃক প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব না হওয়ায় মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি সম্ভব নয়। মামলা নিষ্পত্তিতে এটি একটি বিলম্বের অন্যতম কারণ। বিশেষ কিছু কারণে আদালতে সাক্ষী উপস্থিত হতে না পারলে আদালতের বাইরে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা হয়। দেওয়ানি মামলায় এডভোকেট কর্তৃক এবং ফৌজদারি মামলায় অন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষা হয়। এ সময় বিচারকারী আদালতের বিচারককে সাক্ষীর বক্তব্য সরাসরি লিপিবদ্ধকরণে জড়িত থাকতে হয় না। আদালতের সময় বাঁচে।

এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে মামলার বিচার পদ্ধতি, মামলা নিষ্পত্তিতে বিচারকের দায়বদ্ধতা, বিচারক ও কমিশন কর্তৃক সাক্ষী পরীক্ষা ও মামলা নিষ্পত্তিতে তার প্রভাব আলোচনাসহ মোকদ্দমা জট দূরীকরণে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার গুরুত্ব বর্ণনার পাশাপাশি মোকদ্দমা জট নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে।

২. দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের গঠন, ক্ষমতা, এখতিয়ার ও বিচার পদ্ধতি

বিচারকারী আদালতে মূল মামলাসহ উচ্চ আদালতে আপিল, রিভিসন নিষ্পত্তি বিলম্বিত হওয়ায় আদালত অঙ্গনে মোকদ্দমা জট সৃষ্টি হয়েছে। বিচার প্রশাসনে এটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর তা দূরীকরণে পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে আসছে। বর্তমান প্রবন্ধটি বিচারকারী দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের মূল মামলার চূড়ান্ত শুনানি বা বিচার পর্বের একটি পদ্ধতিগত বিষয় হওয়ায় নিম্নে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের বিচার পদ্ধতিসহ উক্ত আদালতের গঠন, ক্ষমতা ও এখতিয়ার আলোচিত হলো:

২.১. দেওয়ানি আদালত

বিচারকারী দেওয়ানি আদালতের আর্থিক ও ভৌগোলিক এখতিয়ার আছে। মামলার বিষয়বস্তুর আর্থিক মূল্য দ্বারা আদালতের আর্থিক এখতিয়ার নির্ণীত এবং মামলার কারণ উদ্ভব বা মামলার বিষয়বস্তুর অবস্থানের ভিত্তিতে ভৌগোলিক এখতিয়ার নির্ধারিত হয়। ভৌগোলিক এখতিয়ার সাপেক্ষে সাধারণত নিম্নতম আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে আর্থিক এখতিয়ারে বিচারকারী আদালত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) সহকারী জজ আদালত, এবং (২) যুগ্ম জেলা জজ আদালত।

ভৌগোলিক এখতিয়ারের কারণে প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে সহকারী জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার সর্বোচ্চ টাকা ২,০০,০০০ এবং সিনিয়র সহকারী জজের সর্বোচ্চ টাকা ৪,০০,০০০ টাকা। মামলার বিষয়বস্তুর বা বিরোধের বিষয়ের আর্থিক মূল্য ৪,০০,০০০ টাকার অধিক হলে মামলা যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়ের করতে হয়। এরূপ ভৌগোলিক ও আর্থিক এখতিয়ারের কারণে মামলার

বিষয়বস্তুর আর্থিক মূল্য ও অবস্থানের ভিত্তিতে সহকারী জজ আদালত/সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বা যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রত্যেক উপজেলাতে একটা সহকারী জজ আদালত এবং প্রত্যেক জেলাতে এক বা একাধিক যুগ্ম জেলা জজ আদালত বিচারকার্য পরিচালনা করছেন। মিশ্রিতভাবে উভয় এখতিয়ারের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়। সহকারী জজ আদালতের বিচারক সহকারী জজ এবং যুগ্ম জেলা জজ আদালতের বিচারক যুগ্ম জেলা জজ হিসেবে পরিচিত।

দেওয়ানি বিচার বিভাগে সহকারী জজ হিসেবে বিচারক নিয়োগ হয়ে থাকে। সহকারী জজ পদোন্নতিতে যুগ্ম জেলা জজ হন। পূর্বে সহকারী জজকে মুন্সেফ ও যুগ্ম জেলা জজকে সাব জজ বলা হতো। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে দেওয়ানি আদালতে সরাসরি সহকারী জজ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ পদে নিয়োগের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা আইনে স্নাতক ডিগ্রি। বর্তমানে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

সহকারী জজ ও যুগ্ম জেলা জজ আদালতে সাক্ষী পরীক্ষার মাধ্যমে মূল মামলার বিচার কার্য পরিচালিত হয়।

সহকারী বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে কেবল দেওয়ানি মামলার বিচারকার্য পরিচালিত হলেও যুগ্ম জেলা জজ আদালতের বিচারক সহকারী দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হওয়ায় এ আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচারকার্যও পরিচালিত হয়।

২.১.১. দেওয়ানি আদালতের বিচার পদ্ধতি

দেওয়ানি আদালতের বিচারের প্রধান ও সাধারণ আইন হচ্ছে The Code of Civil Procedure,1908 । দেওয়ানি আদালতে বিচার পরিচালনায় অন্য আইনের সহায়তারও প্রয়োজন হয়। মামলা দায়ের থেকে রায়/ডিক্রি পর্যন্ত এ আইনের বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। তবে বিচারক কর্তৃক সাক্ষী পরীক্ষায় The Code of Civil Procedure,1908-এর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি অনুসৃত হয়।

বিচারের জন্য অর্থাৎ চূড়ান্ত শুনানির জন্য মামলা রেডি হয়ে গেলে বিচারের দিন ধার্য করার জন্য মামলাকে 'চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্যকরণ' তথা এসডিতে (SD-Settling Date) রাখা হয়। সাধারণত আদালতের বিচার ক্ষমতার উপর মামলার বিচার নির্ভরশীল হওয়ায় এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আদালত চূড়ান্ত শুনানির মামলার সংখ্যা বিবেচনায় এসডি থেকে মামলাকে চূড়ান্ত শুনানিতে (PH-Peremptory Hearing) নিয়ে আসেন। আদালতের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় মামলা তালিকাভুক্তি বিষয়ে আদালতকে দেওয়ানি কার্যবিধির নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। সে অনুযায়ী একদিনের কার্য তালিকায় দুটি আংশিক শুনানির মামলাসহ ৫টির অধিক মামলা চূড়ান্ত শুনানির জন্য এবং ১০০টির অধিক মামলা চূড়ান্ত শুনানির তালিকায় রাখা যায় না। চূড়ান্ত শুনানির মামলার সংখ্যা ৭০টির নীচে নেমে গেলে আদালত তালিকায় আরো মামলা আনতে পারবেন।[৭]

---

[৭] *The Code of Civil Procedure,1908*, Order XVIII, rule 20, *The Code of Civil Procedure (Third Amendment) Act, 2003* (২০০৩ সালের ৪০ নং আইন)এর ধারা ৮ দ্বারা সংযোজিত।

দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য বিচারক বিচারকার্যে পেশকার, সেরেস্তাদার, সাঁটলিপিকার, প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করেন।

২.২. ফৌজদারি আদালত

বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য বাংলাদেশে কতকগুলো সাধারণ ও বিশেষ ফৌজদারি আদালত কার্যকর আছে। সাধারণ বা বিশেষ আইন দ্বারা এসব আদালতে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। অপরাধের ধরন ও শাস্তির পরিমাণের ভিত্তিতে এ আদালতগুলো গঠিত। বাংলাদেশের সাধারণ ফৌজদারি আদালত হচ্ছে: (১) দায়রা জজ আদালত ও (২) ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। বাংলাদেশে বিশেষ কিছু ফৌজদারি আদালত আছে। এগুলো হচ্ছে: (১) বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত (২) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, (৩) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি। শাস্তি প্রদানের ক্ষমতায় দায়রা আদালত (১) দায়রা জজ আদালত, (২) অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, এবং (৩) সহকারী দায়রা জজ আদালত এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (১) ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, (২) ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং (৩) ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হিসেবে বিভক্ত।

বাংলাদেশের প্রত্যেক দায়রা বিভাগের জন্য একটি দায়রা আদালত, মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য মেট্রোপলিটান দায়রা আদালত এবং মেট্রোপলিটান এলাকার বাহিরের প্রত্যেক জেলার জন্য ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠিত আছে। সাধারণভাবে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (The Penal Code, 1860) অধীনের অপরাধ যেমন: খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরি, ইত্যাদি মামলার বিচার দায়রা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনুষ্ঠিত হয়। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ মৃত্যুদণ্ডসহ আইন অর্পিত যে কোন দণ্ড প্রদান করতে পারেন। সহকারী দায়রা জজ দশ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত আইন অর্পিত যে কোন দণ্ড প্রদান করতে পারেন।

মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ও অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ প্রদান করতে পারেন। ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ প্রদান করতে পারেন। ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড ও অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ প্রদান করতে পারেন।

বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিশেষ ধরণের ফৌজদারি মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনের মামলার বিচার দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে, দুর্নীতি মামলার বিচার দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ জজ আদালতে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনের অপরাধ দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হয়।

২.২.১. ফৌজদারি আদালতের বিচার পদ্ধতি

ফৌজদারি আদালতের বিচারের প্রধান ও সাধারণ আইন হচ্ছে The Code of Criminal Procedure,1898; বিশেষ আইনে বিচার্য ফৌজদারি মামলার বিচারও ঐ বিশেষ আইনের সাথে এ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। The Code of Criminal Procedure,1898 দ্বারা তিন পদ্ধতিতে ফৌজদারি মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। যথা: (১) ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলা বিচার (Trial of Cases by Magistrates-ss.241-249), (২) সংক্ষিপ্ত বিচার (Summary Trial -

ss.260-265) এবং (৩) দায়রা আদালতে বিচার (Trials before Courts of Sessions-ss.265A-265L)। সাধারণত দুই বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচার (Trial of Cases by Magistrates) পদ্ধতি অনুসৃত হয়।[৮]

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমে Discharge করতে পারেন। যদি না করেন আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবেন এবং তা সে স্বীকার করে কিনা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলে তার ভিত্তিতে তাকে দণ্ড প্রদান করবেন। এরূপে তাকে দণ্ডিত করা না গেলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীকে (যদি থাকে) শুনবেন, এরপর অভিযোগের সমর্থনের উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনবেন ও তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হলে তা গ্রহণ করবেন। এরূপে গৃহীত সাক্ষ্য বিবেচনায় ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নয় তাকে খালাস (Acquittal) দিবেন। যদি মনে করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী তাকে দণ্ড (Sentence) প্রদান করবেন।[৯]

দায়রা আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর কর্তৃক অভিযোগ বিষয়ে যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হলে পাবলিক প্রসিকিউটর মামলার বিষয় উত্থাপন করবেন এবং তার সমর্থনে কি সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করবেন জানাবেন। এ পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন মনে না করলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে Discharge করবেন। তা না করলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলে আদালত তাকে দণ্ডিত করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করলে আদালত সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন নির্ধারণ করবেন। নির্ধারিত দিনে আদালতে অভিযোগকারী পক্ষে সাক্ষী পরীক্ষা হবে। এ সাক্ষ্য, অভিযুক্ত ব্যক্তি পরীক্ষা এবং অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শোনার পর যদি আদালত মনে করেন অভিযুক্তর অপরাধ সংঘটনের বিষয় প্রমাণিত হয়নি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস (Acquittal) দিবেন। যদি তাকে এভাবে খালাস দেওয়া না যায় তাকে তার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বলা হবে। এর পর যুক্তিতর্ক তথা Argument দ্বারা অভিযোগকারী পক্ষ তার বক্তব্য উপস্থাপন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার জবাবে তার বক্তব্য প্রদান করবে। এর পর আদালত মামলায় রায় প্রদান করবেন।[১০]

সাধারণত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। তবে হাজির পাওয়া না গেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তার অনুপস্থিতিতে (In absentia) বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারে। দেওয়ানি আদালতের মত এ আদালতেও পেশকার, সেরেস্তাদার, সাঁটলিপিকার, প্রভৃতি বিচারে আদালতকে সহায়তা করে থাকে।

২.৩. প্রচলিত ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তির অবস্থা

প্রচলিত এ ব্যবস্থায় রাজশাহী জেলা জজশিপের অধীন যুগ্ম জেলা জজ ও সহকারী দায়রা জজ আদালত ১ এর দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

---

[৮] *The Code of Criminal Procedure, 1898*, ss.260-262.

[৯] তদেব, ধারা ২৪১-২৪৫.

[১০] তদেব, ধারা ২৬৫A-২৬৫K.

২.৩.১. দেওয়ানি

রাজশাহীর যুগ্মজেলা জজ ১ম আদালতের ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসের
(কার্যদিবস: দেওয়ানী ০৮দিন ফৌজদারি ১৩ দিন = মোট ২১ দিন) বিবরণী

Class of Suits and Cases	Number of cases for disposal	Total disposal	Number of Witness examined		Cases fixed for peremptory hearing				
					Number fixed	After full trial		Total disposal	Adjournment on prayer of party
			দোতরফা	একতরফা		Disposed of	Number heared in part/ ADR		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭০	৮	৯	১০
ছোট	০৭	০২	---	---	০৩	---	---	০২	০১
অর্থঋণ	১৪	০৪	০৫	---	০৪	০২	---	০২	---
টাকা	২৯	০১	---	---	০৮	---	---	০১	০৭
স্বত্ব ও অন্যান্য	২০৬	১০	২৩	১১	১৮	০২	০১ (ADR)	০৭	০৮
বিবিধ	২০২	২৭	০৪	১৭	৩০	০৩	---	২৪	০৩
নির্বাচন	০২	০১	---	---	০১	---	---	০১	---
জারি	৪৩		---	---	---	---	---	---	---
অর্থঋণ জারি	২০২	৫৭	---	---	---	---	---	---	---
পারিবারিক আপিল	০৪	০১	---	---	০৪	০১	---	০১	০২
স্বত্ব আপিল	৪৫	০৫	---	---	১৫	০৪	---	০১	১০
বিবিধ আপিল	০৭		---	---	০৫	---	---	---	০৫
মোট	৭৬১	১১০	৩২	২৮	৮৮	১২	০১	৩৯	৩৬

উপরের মাসিক বিবরণী অনুযায়ী এ সময়ে মামলা, আপিল, ইত্যাদির সংখ্যা ছিল ৭৬১টি; এগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত ছিল ৮৮টি; প্রকৃতপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫২টি। এ সময়ে মোট ৩২+২৮=৬০ জন সাক্ষী পরীক্ষিত হয়েছে ।

২.৩.২. ফৌজদারি

রাজশাহীর সহকারী দায়রা জজ আদালত ১ এর ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসের বিবরণী

মামলার শ্রেণী	গত মাস থেকে টেনে আনা বিচারাধীন মামলা	চলতি মাসে দায়ের হওয়া মামলা	মোট মামলার সংখ্যা ৮	বিচারের জন্য নির্ধারিত মামলার সংখ্যা	দোতরফা বিচারে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		নিষ্পত্তিকৃত মামলার মোট সংখ্যা	মুলতবি মামলার মোট সংখ্যা	মাস শেষে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	সাক্ষী পরীক্ষা
					শাস্তি	খালাস				
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০
দায়রা মামলা	১৫৫	২০	১৭৫	২৯	০২	---	০২	২৭	১৭৩	১৩
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১৩৫	১২	১৪৭	০৮	---	০১	০১	০৭	১৪৬	২২
সর্বমোট	২৯০	৩২	৩২২	৩৭	০২	০১	০৩	৩৪	৩১৯	৩৫

উপরের মাসিক বিবরণী অনুযায়ী এ সময়ে দায়রা মামলা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন মামলার মোট সংখ্যা ছিল ৩২২টি ; এগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত ছিল ৩৭টি; প্রকৃতপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে ০৩টি। এসময়ে মোট ১৩+২২=৩৫ জন সাক্ষী পরীক্ষিত হয়েছে ।

আলোচিত সময়ে এ আদালতের উভয় মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৯+৩=৪২। সাক্ষী পরীক্ষা হয়েছে ৩২+২৮+৩৫= ৯৫জন। এ নিষ্পত্তি পর্যাপ্ত।

৩. বিচার ব্যবস্থাপনা ও মামলা নিষ্পত্তিতে পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য ৩ জেলা বাদে বাকি ৬১টি জেলার পাঁচ জেলা যথা: ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর জেলা জজশিপে মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালতের প্রশাসনে সংস্কারের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলো পর্যায়ক্রমে পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

৩.১. পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা

দেওয়ানি ও ফৌজদারির উভয় ক্ষেত্রের ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে প্রণীত বা সংশোধনকৃত Adjective/Procedural বা Substantive আইন ব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রদানের লক্ষ্যে মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালতের প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় লিগ্যাল অ্যান্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের অধীনে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলক্ষ্যে আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৩ নং আইন) প্রণীত হয়েছে। এ আইন দ্বারা সংস্কার কর্মসূচি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে শিথিল বা স্থগিতকরণে সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে অনুরূপ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতিকে প্রচলিত আদেশ, বিধি, প্রবিধি শিথিল বা স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[১১] মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হ্রাসকরণসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বিচারকার্যে আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং বিচারিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ হচ্ছে এ সংস্কারের লক্ষ্য। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এ সংস্কারের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

Case Management & Court Administration (CMCA) সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুর মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পাশাপাশি পুরাতন মোকদ্দমা অধিক হারে নিষ্পত্তি করা। এ প্রকল্প অনুযায়ী এর আওতায় বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা যথা: ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, রংপুর ও খুলনা জেলা জজ আদালতকে প্রকল্প জেলা গণ্য করা হয়েছে। মোকদ্দমা জট (Case Backlog) নিরসনে প্রকল্প অনুযায়ী এ পাঁচ পাইলট জেলায় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিচালিত এ ব্যবস্থার ফলাফলকে সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচনাও করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প জেলাগুলোতে Alternative Dispute Resolution (ADR) পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করার ফলে মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা গেছে।

পাঁচটি প্রকল্প জেলা জজশীপের ৩১.১০.২০০৬ তারিখ পর্যন্ত নিষ্পত্তি নিম্নরূপ

জেলা জজ আদালতের নাম	সাল				সর্বমোট
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬ (৩১অক্টোবর পর্যন্ত)	
গাজীপুর	২৫	১৬২	১৮৯	৮৪	৪৬০
খুলনা	৪৬	৩৯৫	২২২	৩১২	৯৭৫
কুমিল্লা	১৩৮	২৫৩	২১৩	১৯০	৭৯৪
রংপুর	১২৩	১৯৯	১৩৪	১৪১	৫৯৭
ঢাকা	২৬৩	৩৫৪	৫৬৩	৫০৫	১৬৮৫

এ প্রকল্পের আওতায় কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যতম সংস্কার হচ্ছে মামলা দায়ের ব্যবস্থায়। সে অনুযায়ী উপরোক্ত পাঁচটি প্রকল্প জেলায় Central Filing System (CFS) প্রবর্তিত হয়েছে। সে অনুযায় সকল প্রকার দেওয়ানি মোকদ্দমা একই স্থানে দায়ের হচ্ছে। এ জন্য Judicial Administrative Officer (JAO) নামে একজন কর্মকর্তার পদও সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ ও যুগ্ম জেলা জজ আদালতের এলাকাগত এখতিয়ার বিলুপ্ত করে সারা জেলাব্যাপী এখতিয়ার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Central Filing System (CFS) এর আওতায় দায়েরকৃত মোকদ্দমাসমূহ

[১১] *আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন, ২০০৪*, ধারা ৪ ও ৫।

পরবর্তীতে বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে আর্থিক এখতিয়ার অনুযায়ী ঐ আদালতসমূহে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে।[১২]

৩.১.১. পাইলট প্রকল্প কুমিল্লা জেলা জজশীপ

বিদ্যমান বিচার সংস্কার বিষয়ে কুমিল্লা জেলা জজশীপ একটি পাইলট জেলা। সংস্কারের আওতায় এ জজশীপে মামলা, আপিল, রিভিসন, ইত্যাদি নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিচারকের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিচার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ দ্বারা এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক হয়। মামলার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। এ ব্যবস্থায় বিচারকগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রচুর মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। বিচারকগণ রেডি মামলাকে শুনানি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার ফলে প্রতি বছরের দায়েরকৃত মামলার পাশাপাশি পূর্ববর্তী বছরের বিচারাধীন মামলাও নিষ্পত্তি হচ্ছে। ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার সেখানে অনেক ভালো। এখানে শুনানির জন্য ধার্য মামলা সাধারণত মুলতবি না করে শুনানি করা হয়। যেসব বিষয় কেবল শুনানিতে নিষ্পত্তি হতে পারে যেমন আপিল, রিভিসন, ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে শুনানি করার কারণে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে। সাক্ষী গ্রহণ দ্বারা বিচারের মামলাগুলো সাধারণভাবে মুলতবি না করে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

২০০১ থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত সকল দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যাচিত্রসহ ২০০৭ সনের মার্চ মাসের সংখ্যাচিত্র নিম্নরূপ:

২০০১ থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত সকল দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যাচিত্র

সন	১লা জানুয়ারিতে বিচারাধীন মোকর্দ্দমার সংখ্যা	বছরে দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা	পুনরুজ্জীবিত ও অন্যভাবে মোকদ্দমার সংখ্যা	বিচারাধীন মোকদ্দমার মোট সংখ্যা	একতরফা/ দোতরফা/ ADR ও অন্যভাবে নিষ্পত্তি	৩১ডিসেম্বর বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০১	৮০৪৪	৩৬০৯	৯৫	১১৭৪৮	২৬৭৬	৯০৭২
২০০২	৯০৭২	৪১৬২	৩১৪	১৩৫৪৮	৩৪৫৭	১০০৯১
২০০৩	১০০৯১	৪০৭১	২৮৪	১৪৪৪৬	৪৪৯০	৯৯৫৬
২০০৪	৯৯৫৬	৩৮১২	১৪৩	১৩৯১১	৪২০৪	৯৭০৭
২০০৫	৯৭০৭	৪৪২৩	২৬১	১৪৩৯১	৫৭০৯	৮৬৮২
২০০৬	৮৬৮২	৪৭০০	৩৬৯	১৩৭৫১	৫৮৪৭	৭৯০৪

[১২]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, লিগ্যাল এণ্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট, *লিগ্যাল এণ্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের অধীনে "মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালত প্রশাসন" সম্পর্কিত সংস্কার কার্যক্রমের সাফল্য ও অগ্রগতির বিবরণ*, পৃ. ১-৮; *প্রকল্প জেলা আদালতে কেন্দ্রীয় মোকদ্দমা দায়ের পদ্ধতি (Central Filing Section) প্রবর্তন আদেশ, ২০০৭* দেখুন, *বাংলাদেশ গেজেট* অতিরিক্ত সংখ্যা মে ৩, ২০০৭।

মন্তব্য: মোকদ্দমা নিষ্পত্তির হার বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সার্বিক নিষ্পত্তিতে তার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত নয়।

২০০৭ সনের মার্চ মাসের সংখ্যাচিত্র

গন	১লা জানুয়ারীতে বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা	বছরে দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা	পুনরুজ্জীবিত ও অন্যভাবে মোকর্দ্দমার সংখ্যা	বিচারাধীন মোকদ্দমার মোট সংখ্যা	একতরফা/ দোতরফা/ ADR ও অন্যভাবে নিষ্পত্তি	৩১ডিসেম্বর বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মার্চ২০০৭	৮০২৮	৪৮৭	২২৭	৮৭৪২	৫৪০	৮২০২

মন্তব্য: সংস্কার পদ্ধতির ফলাফলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বিচারাধীন মোট মোকদ্দমার সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারেনি।

৪. বিচারক নিয়োগ

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে আইনানুগ পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ হয়ে থাকে।

৪.১. দেওয়ানি আদালত

সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে Bangladesh Civil Service (Judicial) cadre এ নিযুক্ত ব্যক্তিগণ দেওয়ানি আদালতে সহকারী জজ হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করে আসছেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপিল প্রদত্ত রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগ পৃথক্করণ সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় বিচারক নিয়োগ হবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাপন আকারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে কমিশন) বিধিমালা ২০০৭, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৭ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৭ জারি করা হয়েছে।

দেওয়ানি আদালতে নিযুক্ত সহকারী জজ পদোন্নতিতে যুগ্ম-জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ এবং জেলা জজ হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। জেলা জজশীপের অধীনে পদোন্নতিতে এ বিচারকগণ ফৌজদারি বিচারকের দায়িত্ব পান। এ অবস্থায় যুগ্ম জেলা জজকে সহকারী দায়রা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজকে অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং জেলা জজকে দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৪.২. ফৌজদারি আদালত

সাধারণত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করে আসার কারণে বরাবর সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারক নিয়োগ হয়ে এসেছে। বিচার বিভাগ পৃথক্করণ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ হবে।

৪.৩. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদসমূহ

সুপ্রিম কোর্ট যে তারিখ থেকে কার্যকর করার পরামর্শ দিবেন সে তারিখ থেকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস গঠন হবে। সে অনুযায়ী বিচার বিভাগ পৃথক্করণ সম্পন্ন হলে জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদসমূহ নিম্নরূপ হবে:

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল পদসমূহ

প্রথম অংশ

(ক) জেলা বিচারক/ জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ
(খ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ
(গ) যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ
(ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ
(ঙ) সহকারী জজ

দ্বিতীয় অংশ

(ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
(খ) অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
(গ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট(প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট)
(ঘ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়/৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট)।

৫. মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিচারকের দায়বদ্ধতা

মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের বিচারকের দায়বদ্ধতা আছে। এ দায়বদ্ধতা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৫.১. জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত

সে অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিচার বিভাগীয় অফিসারগণের মামলা/মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর্যাপ্ততা ও অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে মান ও নীতি নির্ধারণী বিধি[১৩] বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ মেনে চলার চেষ্টা করেন। এসব বিধি অনুযায়ী বিচারকগণকে আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে হয়। এ বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত হিসেবে গণ্য হয়। বিচারকগণ পর্যাপ্ত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে তৎপর থাকেন। তাতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা নির্দিষ্ট গতিতে হ্রাস পায়। সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ ও মামলার রায় প্রদানে একজন বিচারকের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক শক্তি এ নীতিতে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

---

[১৩] বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা, *সার্কুলার লেটার নম্বর - ১ (সাধারণ) ১৯৮৮* ইং এবং *বিজ্ঞপ্তি নং ৬ তারিখ ৩১/০৫/২০০০, স্মারক নং ৫৯(ক)জি তারিখ ২৩/০৬/০৩* ও *স্মারক নং ৫৯(খ) তারিখ ২৩/০৬/০৩* ।

একজন বিচারকের প্রতিমাসে মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ে পর্যাপ্ততা ও অপর্যাপ্ততা বিধি নিম্নরূপ:

মামলার রকম	নিষ্পত্তির রকম	নিষ্পত্তির সংখ্যা (প্রতিমাসে)	পর্যাপ্ত/অপর্যাপ্ত
দেওয়ানি মামলা বা সমশ্রেণীর মামলা	দোতরফাসূত্রে	৬-৮টি	পর্যাপ্ত
দায়রা/বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ মামলা বা সমশ্রেণীর মামলা	দোতরফাসূত্রে/ বিচারসূত্রে	৪-৬টি	পর্যাপ্ত

মন্তব্য: দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি গণনার ক্ষেত্রে ৩-৪ টি প্রিয়েমশন মামলা, ৩/৪টি টাকার মামলা, বা ৩/৪টি দেওয়ানি স্বত্বের আপিল বা ৬/৭টি দেওয়ানি বিবিধ আপিল দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি একটি মূল স্বত্বের মামলার সমান গণনা করা যেতে পারে।

ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির গণনার ক্ষেত্রে ৩/৪টি ফৌজদারি আপিল, ৮-১০টি ফৌজদারি রিভিসনের দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি একটি মূল দায়রা মামলার সমান গণ্য করা যেতে পারে।[১৪]

দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের অধীন মধ্যস্থতার বিকল্প পদ্ধতিতে একটি মোকদ্দমা সফলভাবে নিষ্পত্তির জন্য ২টি দেওয়ানি মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি এবং ২টি বিফলভাবে মধ্যস্থতা কার্যক্রমের জন্য ১টি দেওয়ানি মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি গণ্য হবে।[১৫] অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ২টি দেওয়ানি মামলা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তির সমান, ৬টি মামলা সরাসরি বা একতরফাসূত্রে নিষ্পত্তির জন্য ১টি দেওয়ানি মামলা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তির সমান এবং একটি জারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য ১টি দেওয়ানি মামলা দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তির সমান গণ্য হবে।[১৬] পারিবারিক আদালতের মধ্যস্থতা বা সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য ২টি দেওয়ানি মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি এবং ২টি অকৃতকার্যতার ক্ষেত্রে ১টি দেওয়ানি মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি গণ্য হবে।[১৭]

৫.২. জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ম্যাজিস্ট্রেটগণের মামলা নিষ্পত্তিসহ কার্য সম্পাদন মূল্যায়নের নিয়ম আছে।[১৮] তাঁদের ন্যূনতম মামলা নিষ্পত্তির জন্যদৈনিক সাক্ষী পরীক্ষার সংখ্যা ও তৎবিষয়ে পয়েন্ট সংক্রান্ত নিয়ম নিম্নরূপ:

---

[১৪] বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা, *সারকুলার লেটার নম্বর - ১ (সাধারণ)* ১৯৮৮ইং।

[১৫] তদেব, *স্মারক নং ৫৯(ক) তারিখ ২৩/০৬/২০০৩।*

[১৬] তদেব, *স্মারক নং ৫৯(খ) তারিখ ২৩/০৬/২০০৩।*

[১৭] তদেব, *বিজ্ঞপ্তি নং ৬ তাং ৩১/৫/২০০০।*

[১৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নং মপবি/সিজে-৩-ফৌঃবিঃ/৩৬/৯০,৬১(৫০০) তারিখ: ১মার্চ ১৯৯৩।

মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য গ্রহণের ন্যূনতম সংখ্যা	মন্তব্য
২০০ এর উপরে	দৈনিক ৮ জন	
১৫০ থেকে ১৯৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৬ জন	
১০০ থেকে ১৪৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৪ জন	
৫০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৩ জন	
১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত	দৈনিক ২ জন	

ম্যাজিস্ট্রেটগণের মামলা নিষ্পত্তিতে পয়েন্ট অর্জিত হয়। একজন সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ন্যূনতম ২৫ এবং একজন খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেটকে ৭ পয়েন্ট অর্জন করতে হয়। পয়েন্ট বিষয়ক নিয়ম নিম্নরূপ:

১. বিচার ফাইল

নিষ্পত্তির ধরন	পয়েন্ট (প্রতি মামলা)
ফৌজদারি কার্যবিধি ও অন্যান্য আইনের আওতায় পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি	১
আসামি ডিসচার্জ, অব্যাহতি, মামলা প্রত্যাহার ও মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	১
দণ্ডবিধির আওতায় পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি	৩

২. জেনারেল ফাইল

নিষ্পত্তির সংখ্যা	পয়েন্ট
১০০টি মামলার জন্য	১
১০১ থেকে ১৫০টি মামলার জন্য অতিরিক্ত	১
১৫১ থেকে ২০০টি মামলার জন্য অতিরিক্ত	১
২০০এর অধিক মামলার জন্য অতিরিক্ত	১

বিচারকারী আদালত সর্বদা তাঁর বিচারের দায়বদ্ধতা অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট থাকেন। তাতে মামলা দায়ের অপেক্ষা নিষ্পত্তির হার খুব একটা বেশি না হওয়ায় আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাধে মোকদ্দমা জট। এ জন্য বিচারক দায়ী থাকেন না। এর জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা।

৬. এডভোকেট তালিকাভুক্তি

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্তি ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো আদালতে আইন ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়।[১৯] এজন্য অন্যান্য কিছু শর্তপূরণসহ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন আইনে ডিগ্রি বা স্নাতক ডিগ্রি। অন্য যে কোনো বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণ বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আইন কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে আইনে এ ডিগ্রি লাভ করতে পারেন। বিভিন্ন সরকারি ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আইনে অনুরূপ বা স্নাতক (সন্মান) ডিগ্রি গ্রহণ করতে পারেন।[২০]

---

[১৯] *The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Orders, 1972*, Article 19(1).

[২০] বিস্তারিত দেখুন তদেব, অনুচ্ছেদ ২৭।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত এরূপ এডভোকেটকে কোনো অনুমোদিত বার এসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে আদালতে আইন ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। সাধারণত এরূপ এডভোকেটগণকেই আদালত দেওয়ানি মামলার অন্যান্য কাজসহ সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশনার নিয়োগ দান করে থাকেন।

এডভোকেট হিসেবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তির সহকারী জজ হিসেবে নিযুক্তিতে একটা অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির সুবিধা আছে।[২১] এছাড়া সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এডভোকেট থাকা ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন।[২২]

৭. বিচারে কমিশন

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় বিচারকারী আদালতের নির্দেশে অন্য কারো মাধ্যমে সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশন একটি সাধারণ ঘটনা। দেওয়ানি আদালতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কমিশনের ব্যবস্থা আছে। কমিশন (Commissioin) পদটি বিভিন্নভাবে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর সাধারণ ও বিশেষ অর্থ আছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারে কমিশন পদটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এ উভয় মামলার বিচারে বিচারকারী আদালতের নির্দেশে অপর কারো দ্বারা সাক্ষী পরীক্ষাকে কমিশনের আওতাধীন করা আছে। এর বাইরে দেওয়ানি মামলায় কমিশনের মাধ্যমে আরো অনেক কাজ করার অর্থ করা হয়। যেমন: হিসাব পরীক্ষা, বাঁটোয়ারা, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় কমিশনের মাধ্যমে সাক্ষী পরীক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা নিম্নে আলোচিত হলো:

৭.১. দেওয়ানি আদালতে কমিশন

দেওয়ানি বিচারকারী আদালতে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষাসহ স্থানীয় তদন্ত, হিসাব পরীক্ষা, জমিজমা বন্টন, বৈজ্ঞানিক তদন্ত, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, অফিসের কর্ম সম্পাদন, ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৭.১.১. সাক্ষী পরীক্ষা

সুনির্দিষ্ট কতগুলো কারণে মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে আদালতে সাক্ষী উপস্থিত হতে না পারলে ঐ সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধিতে এ কমিশন নিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় বসবাসরত কোনো ব্যক্তি আদালতে হাজির হওয়া হতে অব্যাহতি পেয়ে থাকলে, বা অসুস্থতা বা অচল বা বৈকল্যতার জন্য আদালতে হাজির হতে অপারগ বা অসমর্থ হলে প্রশ্নাবলির মাধ্যমে বা অন্যভাবে উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে কোনো আদালত যে কোনো মোকদ্দমায় কমিশন প্রেরণ করতে পারেন।[২৩] আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকার বাহিরে বসবাসরত ব্যক্তি পরীক্ষার জন্য অন্য আদালতে কমিশন প্রেরিত হতে পারে।

---

[২১] *চাকরি (বেতন ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫*, অনুচ্ছেদ ৯(১)(গ)।

[২২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৯৫(১)।

[২৩] *The Code of Civil Procedure, 1908*, order 26, rule 1.

অনুপস্থিত সাক্ষী আদালতের বাইরে পরীক্ষার জন্য সাধারণত এডভোকেট কমিশনারের প্রতি রিট ইসু করা হয়। আদালত সে রিটে অনেক সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীকে সেখানে উপস্থিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। সাক্ষীকে তার বাড়ীতে বা স্থানীয় এলাকার সুবিধাজনক কোনো স্থানে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে কমিশনার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হলে আদালতে বা আদালতের কোন স্থানে সাক্ষী পরীক্ষা হতে পারে।[২৪]

৭.১.২. ফিস

আদালতে অনুপস্থিত সাক্ষী আদালতের বাইরে পরীক্ষার জন্য একজন এডভোকেট কমিশনারের ফি সাধারণত যে পক্ষ কর্তৃক সাক্ষী পরীক্ষা করানো হয় সে পক্ষকেই বহন করতে হয়। আদালত কর্তৃক এ ফিস নির্ধারণ করা হয়। আদালতে ফিসের এ টাকা জমা দেওয়া হলে আদালত একজন এডভোকেট কমিশনার নিয়োগ দান করে থাকেন। কমিশন সমাপ্তির পর কমিশনের ফিসের টাকা সংশ্লিষ্ট এডভোকেট আদালত থেকে উত্তোলন করেন।

৭.২. ফৌজদারি আদালতে কমিশন

ফৌজদারি বিচারকারী আদালতেও সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশন পরিচালিত হয়ে থাকে।

৭.২.১. সাক্ষী পরীক্ষা

অপরাধের শাস্তির ধরনের ভিত্তিতে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে এবং অপরাধের প্রকৃতির ভিত্তিতে বিশেষ ফৌজদারি আদালতে অপরাধের বিচার পরিচালিত হচ্ছে। সব ফৌজদারি অপরাধের বিচারের প্রধান আইন ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি। বিশেষ আইন দ্বারা বিশেষ আদালত গঠিত হলেও ঐ বিশেষ আইন দ্বারাই আবার ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির অনেক বিধান বিশেষ আদালতে কার্যকর রাখা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার শুরু থেকেই ফৌজদারি মামলার সকল ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি তথা আসামির সন্মুখে সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়। সাক্ষীর সাক্ষ্য বিষয়ে আসামির আপত্তির বিষয়গুলো তাৎক্ষণিকভাবে জেরার মাধ্যমে আদালতে উত্থাপিত হয়। এছাড়া প্রয়োজনে আসামি আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্যও দিতে পারে।

আসামি পলাতক থাকার মাধ্যমে অনির্দিষ্ট কাল বিচার কার্য বন্ধ করে রাখতে থাকলে আসামির উপস্থিতিতে বিচারের এ ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন প্রয়োজন হয় এবং সে অনুযায়ী আসামির অনুপস্থিতে বিচার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করা হয়। ফলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বর্তমানে আসামির অনুপস্থিতিতে (In absentia) ফৌজদারি মামলা নিস্পত্তি হচ্ছে।

এছাড়া ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৫ ধারার বিধানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি প্রদানের নিয়ম আছে। এরূপে হাজির হওয়ার অব্যাহতিপ্রাপ্ত অভিযুক্তর অনুপস্থিতিতেও আদালত মামলার সাক্ষী পরীক্ষা করতে পারেন।

বিদ্যমান এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসামির অনুপস্থিতিতে ফৌজদারি বিচার পরিচালিত হওয়া সম্ভব থাকায় বিচারকারী আদালতে আসামি উপস্থিত না থাকলেও মামলা চলছে। এছাড়া বিদ্যমান আইনেই প্রয়োজনে বিচারকারী আদালতের বাহিরে কমিশনের মাধ্যমে সাক্ষী পরীক্ষা করা যায়। ফলে কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে

---

[২৪] *The Civil Rules and Orders*, rule 255.

ফৌজদারি কার্যবিধিতে বলা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী কোনো বিচার, তদন্ত বা কার্যধারায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, বা দায়রা আদালত, বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি বিচারের স্বার্থে কোনো সাক্ষী পরীক্ষা প্রয়োজন মনে হয়, এবং ঐ সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হওয়া আদালতের বিবেচনায় অবস্থানুযায়ী বিপুল পরিমাণ বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধাজনক মনে হয়, আদালতে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট, বা কোর্ট সাক্ষীর উপস্থিতি পরিহার করতে পারেন, এবং ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে এলাকায় ঐ সাক্ষী বসবাস করে সে এলাকার কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর কমিশন ইসু করতে পারেন।[২৫]

উক্তরূপ সাক্ষী যখন যুক্তরাজ্য, বা বাংলাদেশ ব্যতীত কমনওয়েলথভুক্ত অন্য কোনো দেশ, বা বার্মা ইউনিয়ন বা এমন কোনো দেশে বসবাস করে যে দেশের সাথে বাংলাদেশের এ সম্পর্কে পারস্পরিক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, তখন সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট বিজ্ঞাপনে নির্দেশিত এরূপ কর্তৃত্ব থাকা ঐদেশের কোনো আদালত বা বিচারক বরাবর কমিশন ইসু করতে হয়।

ফৌজদারি কার্যবিধিতে কমিশন পরিচালনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সে অনুযায়ী যিনি কমিশন পরিচালনা করবেন, তিনি যেখানে সাক্ষী আছে, বা যেখানে তাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হয়েছে সেখানে যাবেন, এবং এ কার্যবিধির অধীন মামলার বিচারের পদ্ধতিতে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং এজন্য ঐ একইরূপ ক্ষমতা ভোগ করবেন।[২৬]

৮. মামলার বিচার বা চূড়ান্ত শুনানিতে কমিশন পদ্ধতির কার্যকরতা আলোচনা ও সুপারিশ

বেশ দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের পদ্ধতিগত দিকে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এজন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংশোধন আনা হয়েছে। তাতে সুনির্দিষ্ট একটি মামলার বিচার ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু একটি আদালতে বিচারাধীন সকল মামলার বিচার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে মোকদ্দমা জট। তাতে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা বিলম্বের অন্যান্য ক্ষেত্র দূরীভূত করলেও মামলা নিষ্পত্তিতে বিচারকের দায়বদ্ধতা বিষয়ক সীমাবদ্ধতা দূরীভূত করছে না। সাক্ষী পরীক্ষায় আদালতের যে সময় ব্যয় হয় তা দূর বা হ্রাস করছে না। পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা পূর্বের নিয়মে নিষ্পত্তির সংখ্যা অপেক্ষা অধিক করা গেলেও তা দ্বারা মোকদ্দমা জট একেবারে দূর করা সক্ষম হবে না।

বাংলাদেশে বিচারকারী আদালত কর্তৃক রেডী মামলার সাক্ষী পরীক্ষা করতে পারার তুলনায় মামলা দায়ের ও বিচারের জন্য প্রস্তুত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়া একটা সাধারণ ঘটনা। অন্যান্য কারণ অপেক্ষা এর জন্য আদালতের তথা বিচারকের সাক্ষী পরীক্ষার সময়ের অভাব অন্যতম কারণ। দেওয়ানি আদালতের এটি বিচার পদ্ধতির একটি স্বীকৃত অংশ।

সাধারণত চূড়ান্ত শুনানির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিচারের দিন ধার্য করার জন্য মামলাকে 'চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্যকরণ' তথা এসডিতে (SD-Settling Date) রাখা হয়। আদালতের বিচার ক্ষমতার উপর মামলার বিচার নির্ভরশীল হওয়ায় আদালত প্রতিদিন বেশি সংখ্যক মামলা

---

[২৫] *The Code of Criminal Procedure, 1898*, section 503.

[২৬] তদেব, ধারা ৫০৩(৩); বিস্তারিত দেখুন এ আইনের ধারা ৫০৩-৫০৬ক পর্যন্ত।

চূড়ান্ত শুনানির জন্য রাখতে পারেন না। একদিনের কার্য তালিকায় দুটি আংশিক শুনানির মামলাসহ ৫টির অধিক মামলা চূড়ান্ত শুনানির জন্য এবং ১০০টির অধিক মামলা চূড়ান্ত শুনানির তালিকায় রাখা যায় না। আবার চূড়ান্ত শুনানির মামলার সংখ্যা ৭০টির নীচে নেমে না গেলে আদালত তালিকায় নতুন কোন মামলা আনতে পারেন না। কেননা পদ্ধতিগতভাবে এসময় মামলার সাক্ষী পরীক্ষা করা আদালতের প্রধান কাজ। অনেক সময় শুনানির জন্য নির্ধারিত মামলা মুলতবি হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত মামলার সংখ্যা পাঁচ এর অধীক হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন প্রয়োজন।

ফৌজদারি মামলায় চার্জ গঠনের পর সাক্ষী পরীক্ষার জন্য মামলা বিচার ফাইলে জমা হয়। দেওয়ানি আদালতের মতো এখানেও বিচারককে নিজ হাতে সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা লিপিবদ্ধ করতে হয়। আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সাক্ষীর দরকার থাকে। চার্জশীটে সাক্ষীর নাম উল্লিখিত হলে প্রয়োজনীয় সাক্ষী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। আদালতে একজন বিচারকের পক্ষে একদিনে প্রচুর সাক্ষী পরীক্ষা সম্ভব হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিচার পর্যায়ে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে।

বেশি দেওয়ানি ও ফৌজদারি ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তিতে সময় বেশি ব্যয় হওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু এটিকে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ এ কারণ দূর করা গেলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থায় রাজশাহী জেলা জজশীপের অধীন যুগ্ম জেলা জজ ও সহকারী দায়রা জজ আদালত ১ এর ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা মোট নিষ্পত্তির একটি উদাহরণ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এসময় এখানে মামলা মোট নিষ্পত্তি হয়েছে ৪২টি; সাক্ষী পরীক্ষা হয়েছে ৯৫ জন। এ সংখ্যা এ আদালতের মামলা নিষ্পত্তির দায়বদ্ধতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত । অথচ এসময় এ আদালতে বিচারাধীন প্রস্তুত মামলা অনিষ্পত্তি অবস্থায় থাকছে (দেওয়ানি ৮৮- ৫২ = ৩৬ এবং ফৌজদারি ৩৭ - ৩ = ৩৪) ৭০টি। এ আদালতের বিচারক তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করছেন। প্রতি মাসে মামলা নিষ্পত্তির জন্য তাঁকে যে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া আছে তিনি সে কোটা পূরণ করছেন। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বাড়লেও সব মামলা শেষ হয়নি। প্রতি মাসে মামলা নিষ্পত্তির বিচারকের দায়বদ্ধতা একজন বিচারককে এক মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করলেও আদালতের বিচারাধীন মামলা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তিতে সহায়ক নয়। কারণ একজন বিচারকের একার পক্ষে যত পরিমাণ মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী তিনি তার চেয়েও বেশি করলেও মামলা দায়েরের হার তার চেয়ে কম না হওয়া পর্যন্ত আদালতে মোকদ্দমা জট থাকবে।

বেশি দওয়ানি আদালতের মত সাক্ষী পরীক্ষায় ফৌজদারি আদালতে এডভোকেট কমিশনারের কোনো স্বীকৃতি নাই। এখানে সাক্ষী পরীক্ষার কমিশন হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান।

উভয় মামলার বিচারেই কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার নিয়ম থাকলেও বর্তমানে তার জন্য যে কারণ আছে তা সময়ের অভাবে সাক্ষী পরীক্ষা করতে না পারার বিষয়টি কভার করে না। ফলে আদালত এরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের মাধ্যমে সাক্ষী পরীক্ষায় অগ্রসর হতে পারেন না। আদালতকেই সাক্ষী পরীক্ষার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করতে হয়। আদালত বা বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলেও এডভোকেটের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এমন অনেক এডভোকেট আছেন যাঁদের হাতে কাজের চাপ কম। এছাড়া একটা নির্দিষ্ট আদালতে একজন মাত্র বিচারক থাকলেও

ঐ আদালতে প্র্যাক্টিসরত এডভোকেট সংখ্যা বিপুল। এই বিপুল সংখ্যক এডভোকেটের একটা বড় অংশ যদি রেডি মামলার সাক্ষী পরীক্ষার কাজে লাগে একসাথে অন্তত দুটো সুবিধা সৃষ্টি হবে। যথা: (১) মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি দ্বারা মোকদ্দমা জট দূর হবে; এবং (২) বিশেষ সংখ্যক এডভোকেটের একটা অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে।

বেশি দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বিষয়ক কার্যবিধিতে সুস্পষ্টভাবে এ বিধান অনুপস্থিত থাকায় এ ব্যাপারে তেমন কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্ত যে কোনো সময়ে মামলা বিচারের কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনে সংশোধন দ্বারা এ কাজটি অতি সহজেই করা যায়। এজন্য দেওয়ানি কার্যবিধির কমিশন বিষয়ক ধারা ও আদেশে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির কমিশন সংক্রান্ত বিধানে নতুন নিয়ম সংযোজন প্রয়োজন। এরূপ বিধান সংযোজন দ্বারা চূড়ান্ত শুনানি ও বিচারে সাক্ষী পরীক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে মোকদ্দমা জট দূর করা সম্ভব। একটা আদালতে রেডি মামলা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণের জন্য ১০ জন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হলে একটা আদালত ১০+১=১১টা আদালতের ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। কারণ একই সময়ে ১০টা মামলার সাক্ষ্য ১০ জন কমিশনার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবে। আদালতের নিজেরটাসহ মোট ১০+১=১১টা আদালতের ক্ষমতা একটা আদালতে আসবে।

পাইলট প্রকল্প পাঁচ জেলা জজশিপে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত Alternative Dispute Resolution (ADR) এর মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক বলা হয়েছে। কিন্তু Alternative Dispute Resolution এর বিধান দেওয়ানি কার্যবিধিতে সংযোজনের সময়ে কোনো মামলার এরূপ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিসন চলবে না (No appeal or revision shall lie against any order or decree passed by the Court in pursuance of settlement between the parties under this section.)[২৭] বলা হয়েছে তাতে মামলার বিষয়বস্তুতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের এতে প্রকাশ্যভাবে আপিল ও রিভিসনের অধিকার না থাকা প্রতীয়মান হওয়ায় মামলায় পক্ষ না থাকা ব্যক্তিগণ অপ্রয়োজনীয় বাধার সম্মুখীন।

মোকদ্দমা জট দূরীকরণে পাইলট প্রকল্প দ্বারা সংস্কারের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে একজন বিচারককে তাঁর সর্বোচ্চ পরিমাণে মামলা নিষ্পত্তির দায়বদ্ধতা পরিপূরণে সক্রিয় করলেও তা আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমা একশ ভাগ নিষ্পত্তিতে সতায়তা করবে না। বিচারকারী আদালতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত মামলা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে অটোমেটিক মোকদ্দমা জট সৃষ্টি করবে। পাইলট প্রকল্প কুমিল্লা জেলা জজশিপে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে বিচারাধীন মোট মামলার সংখ্যা ছিল ৮৭৪২; এ সময় নিষ্পত্তি মামলার সংখ্যা ৫৪০। অবশিষ্ট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৮২০২। গড় নিষ্পত্তির হার ভাল। পর্যাপ্ত। কিন্তু বিচারকের একক প্রচেষ্টায় সকল মামলা শেষ হচ্ছে না। বিচারকগণ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী পর্যাপ্ত মামলা নিষ্পত্তি করলেও মামলা শেষ হয়নি।

একারণে চূড়ান্ত শুনানি বা বিচারে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ে বিচারককে সহায়তা করার জন্য অবশ্যই-সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। প্রচলিত কমিশন পদ্ধতি এখানে কার্যকর। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেওয়ানি আদালতের ভৌগোলিক এখতিয়ার বিলুপ্ত করে Central Filing System এ এক জায়গায় মামলা দায়েরের পর সেগুলো রেডি হলে আর্থিক এখতিয়ার অনুযায়ী

---

[২৭] *The Code of Civil Procedure, 1908*, s. 89A(12).

জেলার সব আদালতে সমহারে তথা সুষম বণ্টন করা হলে এ আদালত নিজ অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সব মামলা শেষ হবে না। এস ডি এবং চূড়ান্ত শুনানি সংক্রান্ত বিধান অনুসরণসহ মামলা নিষ্পত্তিতে আদালতকে অগ্রসর হতে হবে। তখন হয়তো দেখা যাবে আদালত কর্তৃক পর্যাপ্ত নিষ্পত্তি সত্ত্বেও মামলা জমা থাকছে। অন্তত এজন্য হলেও সাক্ষী পরীক্ষার কাজে আদালতের সহায়ক শক্তি দরকার। প্রচলিত কমিশন পদ্ধতি এখানে কার্যকর। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে এজন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার। এজন্য সরকার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন, ২০০৪ এর ক্ষমতাবলে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বার দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতে প্রস্তুত তথা রেডী মামলায় কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৯. উপসংহার

আদালতে কেবল মামলা দায়ের হলেই হয় না মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। এ পর্যন্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের যেসব কারণ চিহ্নিত করা গেছে প্রায় তার সবটাই দূর করা হয়েছে। কিন্তু মোকদ্দমা জট দূর হয়নি। সর্বশেষ পাইলট প্রকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা মোকদ্দমা জট বিদূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় বিচারকের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির দায়বদ্ধতার কারণে যে মোকদ্দমা জট সৃষ্টি হবে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ফলত এ সংস্কার মোকদ্দমা জট নিরসনে ১০০ ভাগ সফলতা দিবে না।

মামলার বিচার বা চূড়ান্ত শুনানিতে আদালতের বিচারক নিজ হাতে সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। তাতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। প্রাকৃতিকভাবে একজন বিচারকের একার পক্ষে এর চেয়ে কম সময় ব্যয় দ্বারা প্রচুর সাক্ষী পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলত একজন বিচারকের পক্ষে তার চেয়ে বেশি মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না। এটা বিচারের বর্তমানের একটা পদ্ধতিগত ব্যাপার। তাঁকে মামলা নিষ্পত্তির যে দায়বদ্ধতা দেওয়া হয়েছে তা তিনি পরিপূরণ করলেও তা দ্বারা আদালতের প্রচুর মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় মোকদ্দমা জট সৃষ্টি হবে। বিচারক মামলার বিভিন্ন স্তরে পেশকার, সেরেস্তাদার, সাঁট লিপিকার, ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন। পেশকার ও সেরেস্তাদারকে মামলার পক্ষদের বিভিন্ন বিষয় মামলার নথির অর্ডারশিটে এন্ট্রি দিতে নিজ হাতে লিখতে হয়। সাঁট লিপিকারও প্রয়োজনে অনুরূপ কাজের পাশাপাশি আদেশ ও রায় ডিকটেশন নিয়ে টাইপ করে বিচারককে বিচারে সহায়তা করে। মামলা নিষ্পত্তিতে বিচারককে এভাবে বিচারিক আদেশ/সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। সে রকম মূল মামলার বিচার বা চূড়ান্ত শুনানি পর্যায়ে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে আদালতের সহায়ক শক্তি গ্রহণ প্রয়োজন। সাধারণত আদালতে হাজির হতে না পারা সাক্ষীর সাক্ষ্য বর্তমানে এরূপ সহায়ক শক্তি দ্বারা দেওয়ানি মামলায় কমিশনে এডভোকেট এবং ফৌজদারি মামলায় অন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক আদালতের বাইরে গ্রহণ হয়ে থাকে।

কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার বর্তমানের প্রচলিত কারণগুলো দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে অন্যভাবে সহায়ক হলেও বিচারকের তথা বিচারকারী আদালতের সময়ের অভাবে সাক্ষী পরীক্ষা করতে না পারা মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে সহায়ক নয়। ফলে দেওয়ানি আদালতে এস ডি ও চূড়ান্ত শুনানির এবং ফৌজদারি আদালতে বিচার পর্যায়ে মামলার স্তূপ হচ্ছে। এডভোকেট কমিশনারের মাধ্যমে

ও সাহায্যে উভয় শ্রেণীর মামলার সাক্ষী পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে একই সাথে একটা আদালতের প্রচুর মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ হবে। কমিশনে গৃহীত এ সাক্ষ্য বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক (Argument) শেষে আদালতের বিচারক কর্তৃক রায় প্রদত্ত হলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে। তা না হলে বিচার বিভাগ পৃথক্করণ সম্পন্ন হলে পৃথক এজলাসসহ অনেক আদালত দরকার হবে।

আদালতের মামলার সংখ্যা গণনা না করে প্রয়োজনীয় মামলায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে কমিশনের সহায়তা গ্রহণ করা হলে নিষ্পত্তির হার বাড়বে। ফলে এসর আদালতের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ খুব একটা দরকার হবে না। মোকদ্দমা জট দূর হওয়াসহ সরকারি অর্থ ব্যয় হ্রাস পাবে। এজন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি পদ্ধতিগত আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রয়োজন। সংশ্লিষ্টর জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪১২-১৩

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার : ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার : ৬), আমানুলাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার : ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার : ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I-XXIX (1976-2006)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S.A.Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905-1911) by M.K.U.Molla (1981)

Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi : Its Past and Present (Seminar Volume 4), edited by S.A.Akanda (1984)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A.Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal : Mughal Period, Vols. 1 & 2 by Abdul Karim (1991, 1995)

The Institute of Bangladesh Studies : An Introduction (2004)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up-to-date Index by M. Shahjahan Rarhi (1993)

Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

১৪শ সংখ্যার সূচিপত্র

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম	॥	কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ : গঠনশৈলী ও স্থাপত্য উৎস	০৭
মো. ফজলুল হক	॥	উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) ও বাংলাদেশের অর্থনীতি	১৭
মোহাম্মদ নাজিমুল হক	॥	বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার স্বরূপ	২৯
অশোক বিশ্বাস	॥	বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব	৩৯
সুরাইয়া ইয়াসমীন হীরা অসীম কুমার সাহা	॥	ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০)	৬১
মোঃ আজিজুল হক	॥	বাংলাদেশের আদিবাসী-উপজাতি বিতর্ক	৭৭
সুরঞ্জন রায়	॥	কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন	৯১
আবুল হাসান চৌধুরী	॥	চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভূতভাগানো গান : পরিচয় ও প্রকৃতি	১১১